চিত্রসমালোচনা



বাণীশিল্প

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৬০

প্রকাশক

অবনীন্দ্রনাথ বেরা

বাণীশিল্প

১৪-এ টেমার লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর

রাধাবল্লভ মণ্ডল

ডি. বি. প্রিন্টার্স

৪ কৈলাস মুখার্জি লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ

প্রণবেশ মাইতি

সূচীপত্র

চিত্রসমালোচনা ৪০

সম্পাদকের কথা

'চিত্রসমালোচনা ৪০' : এই সঙ্কলন গ্রন্থে আছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত চল্লিশ বছর সময়ের মধ্য থেকে বিশেষ ভাবে বাছাই করা ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ ছবির উল্লেখযোগ্য আলোচনা। আলোচনাগুলির মধ্যে ২০টি দেশি ছবি নিয়ে ও ২০টি বিদেশি ছবি নিয়ে। দেশি ও বিদেশি উভয় ক্ষেত্রে একটি ছবি নিয়ে দুটি করে আলোচনা আছে—সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ও গ্রিগরি কোজিনৎসেভের 'হ্যামলেট'।

আলোচিত ছবিগুলির নাম, নির্মাণকাল ও পরিচালকের নাম নিচে দেওয়া হল :

মুক্তি	প্রমথেশ বড়ুয়া
রজত জয়ন্তী	প্রমথেশ বড়ুয়া
ছিন্নমূল	নিমাই ঘোষ
পথের পাঁচালী	সত্যজিৎ রায়
মেঘে ঢাকা তারা	ঋত্বিক ঘটক
আকাশ কুসুম	মৃণাল সেন
সুবর্ণরেখা	ঋত্বিক ঘটক
উসকি রোটি	মণি কাউল
কলকাতা '৭১	মৃণাল সেন
অশনি সঙ্কেত	সত্যজিৎ রায়
যুক্তি তক্কো ও গপ্পো	ঋত্বিক ঘটক
কাঞ্চন সীতা	জি. অরবিন্দন
শতরঞ্জ কে খিলাড়ি	সত্যজিৎ রায়
ওকা উরি কথা	মৃণাল সেন
নিম অন্নপূর্ণা	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
সদ্‌গতি	সত্যজিৎ রায়
চোখ	উৎপলেন্দু চক্রবর্তী
ভসবির আপনি আপনি	মৃণাল সেন
জেনেসিস	মৃণাল সেন

দি বার্থ অব এ নেশন	ডেভিড ডবলিউ গ্রিফিথ
ব্যাটলশিপ পোটেমকিন	সের্গেই আইজেনস্টাইন
মঁসিয় ভের্দু	চার্লস চ্যাপলিন
বাইসাইকেল থীভ্স্	ভিট্টোরিয়ো ডে সিকা
ইকিরু	আকিরা কুরোসোয়া
উগেৎসু মোনোগাতারি	কেনজি মিজোগুচি
ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ	ইঙ্গমার বার্গম্যান
নাজারিন	লুই বুনুয়েল
দি ট্রায়াল অফ্ যোয়ান অফ্ আর্ক	রোবের ব্রেসোঁ
হ্যামলেট	গ্রিগরি কোজিন্ৎসেভ
ইডিপাস রেক্স	পাওলো পাসোলিনী
ডেথ্ বাই হ্যাংগিং	নাগিসা ওশিমা
দি স্ট্রাকচার অফ ক্রিস্টাল	ক্রিস্তফ জানুসি
ইলেক্ট্রা	মিকলোশ ইয়ানচো
দি প্যাসেঞ্জার	মিকেলেঞ্জেলো আন্তনিওনি
দি এনিমি	ইলমাজ গুনে
বুড্ডিষ্ট ফ্রম চায়না	কে. কুমাই
মেফিসটো	ইস্তভান স্যাবো
অ্যালসিনো অ্যাণ্ড দ্য কন্ডোর	মিগুয়েল লিটিন

দেশি ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ ও মৃণালের ছবির ৫টি করে আলোচনা, ঋত্বিকের ৩টি ও প্রমথেশ বড়ুয়ার ২টি ছবির আলোচনা এবং অন্যদের ১টি করে ছবির আলোচনা রয়েছে। আলোচনা আছে মণি কাউল ও অরবিন্দনের ছবির কিন্তু বেনেগল ও আদুরের ছবির নয়, বা, বুদ্ধদেব ও উৎপলেন্দুর ছবির কিন্তু গৌতম বা অপর্ণার ছবির নয়—এর অর্থ পরিচালকবিশেষকে ছোট বা বড় করা নয়, কেননা এ-বইতে বিবেচ্য শুধুই ছবি বা পরিচালক নয়, বরং বিশেষ করে ছবি সংক্রান্ত আলোচনাগুলিই।

সেই কারণেই বিদেশি পরিচালকদের ক্ষেত্রেও হয়তো কেউ কেউ অনুপস্থিত। যেমন, রেনোয়া ও হিচকক, বা, গদার ও ফেলিনি। বইটি ৪০টা সমালোচনার বদলে হয়তো ৫০টা সমালোচনার সঙ্কলন হলে আরো ১০ জন পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করা যেত। কিন্তু বাঙালি পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার কথা মনে রেখে বইটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

বইটির প্রধান বিবেচ্য আলোচনাগুলি। আগেই বলেছি, এ-বই ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ ছবির উল্লেখযোগ্য আলোচনার সঙ্কলন। একদিকে আলোচনাগুলিকে কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হতে হয়েছে, অন্যদিকে আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে বোঝাতে হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কীভাবে আমাদের চলচ্চিত্র সমালোচনার মান ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। আলোচকদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশ জন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক, কবি-লেখক ও বিশেষত চিত্রসমালোচক (বাংলার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত চিত্রসমালোচক, প্রবীণ ও নবীন, জীবিত বা মৃত)। সূচিপত্রের ওপর দিয়ে চোখ বোলালে বোঝা যাবে, এ-ক্ষেত্রেও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য চিত্রসমালোচক অনুপস্থিত যেমন, মন্মথেন্দ্র ভঞ্জ বা কল্পতরু সেনগুপ্ত। অজয় বসু বা প্রবোধকুমার মৈত্র। গৌতম ভদ্র বা মিহির ভট্টাচার্য। সেই একই কারণ : স্থানাভাব। যেমন মনোমতো লেখা না পাওয়ায় জ্যোতির্ময় বসু রায় ও মূলত ইংরেজিতে লিখেছেন বলে অমলেন্দু দাশগুপ্ত বাদ রইলেন। দ্বিতীয়োক্ত কারণে বাদ রইলেন কবিতা সরকার, স্বপন মল্লিক বা মিহির সেনগুপ্তও। আমরা শুধু গাস্ত রোবের্জের ক্ষেত্রে ইংরেজি লেখা থেকে অনুবাদ করেছি। তার কারণ, তাঁর রচনা নিয়মিত বঙ্গানুবাদ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে ও এখন তিনি বাংলা চলচ্চিত্র সমালোচনার এক অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়েছেন। এছাড়া, সত্যজিতের লেখাটিও ঘটনাচক্রে ইংরেজিতে লেখা বলে অনুবাদ করে নিতে হয়েছে।

লেখকদের সম্পর্কে, চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—এমন কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল।

সত্যজিৎ রায় : তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক বইয়ের মধ্যে আছে 'বিষয় চলচ্চিত্র', 'আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস', 'একেই কি বলে শুটিং', 'নায়ক' (চিত্রনাট্য), 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (চিত্রনাট্য)। তাঁর সম্পর্কে বাংলায় রচিত বইয়ের মধ্যে আছে দিলীপ-কুমার ভট্টাচার্যের 'জীবনশিল্পী সত্যজিৎ রায়', অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'সমাজ, চলচ্চিত্র ও সত্যজিৎ রায়', দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যজিৎ'।

ঋত্বিক ঘটক : তাঁর চলচ্চিত্র-বিষয়ক বইয়ের মধ্যে আছে 'চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু' ও 'সিনেমা অ্যাণ্ড আই'। তাঁর সম্পর্কে বাংলায় রচিত বইয়ের মধ্যে আছে রজত রায় সম্পাদিত 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি', সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'সেই ঋত্বিক' ও অতনু পাল সম্পাদিত 'ঋত্বিক (যন্ত্রস্থ)।

মৃণাল সেন : তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক বইয়ের মধ্যে আছে 'চার্লি চ্যাপলিন', 'আমি এবং চলচ্চিত্র', 'চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ' ও 'ভিউজ অন সিনেমা'। তাঁর সম্পর্কে বাংলায় রচিত বই : প্রলয় শূর সম্পাদিত 'মৃণাল সেন'।

বিষ্ণু দে : ঋত্বিক ঘটক ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কেও তাঁর উল্লেখযোগ্য মতামত আছে।

বুদ্ধদেব বসু : চিত্রসমালোচকের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

গুরুদাস ভট্টাচার্য : বাস্তব, অধ্যাস ও চলচ্চিত্র—এই বিষয়ে তাঁর মননশীল রচনা বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটি নতুন পথের প্রদর্শক।

পঙ্কজ দত্ত : 'দেশ' পত্রিকায় দীর্ঘকাল স্বনামে ও ছদ্মনামে চিত্রসমালোচনা করেছেন।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত : রচিত গ্রন্থ—'টকিং অ্যাবাউট ফিল্মস' ও 'দি সিনেমা অব সত্যজিত রে'। তিনি একাধিক তথ্যচিত্র ও একটি কাহিনীচিত্র ('বিলেত ফেরত') পরিচালনাও করেছেন।

উৎপল দত্ত : আইজেনস্টাইন ও কুরোশাওয়া বা রাজনৈতিক সিনেমা ও ওয়্যার ফিল্ম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ মৌলিক। নাটকের তুলনায় তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনাদি সংখ্যায় অল্প হলেও, সেগুলি অবিলম্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। পরিচালিত চিত্র 'ঘুম ভাঙার গান', 'ঢেউয়ের পর ঢেউ', 'ঝড়', 'বৈশাখী মেঘ', 'মা'।

কিরণময় রাহা : বাংলা নাটক নিয়ে তাঁর বই আছে, তিনি বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে বই লিখলেও আমরা উপকৃত হব। তার প্রমাণ 'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর মতো ছবি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা।

দেবীপদ ভট্টাচার্য : চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে এক সময় নিয়মিত বিদগ্ধ লেখা লিখেছেন। তাঁর করা চিত্রসমালোচনা শিক্ষিত, পরিশীলিত সুরের জন্য স্মরণীয়।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস ও বাঙালি চলচ্চিত্র কর্মীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তাঁর নখদর্পণে।

সেবাব্রত গুপ্ত : 'আনন্দলোক' পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় চিত্রসমালোচনা করেছেন। রচিত গ্রন্থ—'সিনেমার নিজের ভাষায়'।

ধীরেশ ঘোষ : পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউট. ফিল্ম সেন্সার বোর্ড, এন. এফ. ডি. সি. প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। রচিত গ্রন্থ—'চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা'। একাধিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রেরও পরিচালক।

গাস্ত রোবের্জ : রচিত গ্রন্থ—'চিত্রবাণী' ও 'সিনেমার কথা', 'অ্যানাদার সিনেমা ফর অ্যানাদার সোসাইটি' ও 'নতুন সিনেমার সন্ধানে', 'মিডিয়েশন', 'আইজেনস্টাইন'স ইভান দি টেরিবল—অ্যান অ্যানালিসিস', 'ফিল্মস ফর অ্যান ইকোলজি অব মাইণ্ড',

'ফিল্ম থিয়োরি টুডে' (যন্ত্রস্থ) প্রভৃতি। কলকাতায় অবস্থিত চিত্রবাণী নামক প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় : প্রকাশিত গ্রন্থ—'সত্যজিৎ' ও 'আইজেনস্টাইন' (সম্পাদিত), 'গদার' নামক গ্রন্থেরও অন্যতম রচয়িতা। বাংলায় চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে প্রধান পথিকৃৎ।

মৃগাঙ্কশেখর রায় : 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র চিত্রসমালোচক। 'চলচ্চিত্র কথা', 'বিশ্বকোষ', 'চলচ্চিত্রের অভিধান', 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাহিনীচিত্রের চিত্রনাট্য লেখা ও তথ্যচিত্র পরিচালনার কাজও তিনি করেছেন।

পূর্ণেন্দু পত্রী : বহুমুখী সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী : কবি ও লেখক, চিত্রকর ও চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক ও চিত্রসমালোচক। চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ—'সিনেমা সিনেমা'।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : চলচ্চিত্রের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। চলচ্চিত্র বিষয়ক বহু সঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, চলচ্চিত্র বিষয়ক বহু বইয়ের তিনি ভূমিকাও লিখেছেন। তাঁর চলচ্চিত্র সংক্রান্ত রচনার একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সঙ্কলন অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

প্রদীপ্তশঙ্কর সেন : নানান ব্যস্ততার দরুন চলচ্চিত্র নিয়ে বেশি লিখতে পারেন নি, যা লিখেছেন তার মধ্যে রেনোয়া, সত্যজিৎ, মৃণাল ও বাংলা ছবি নিয়ে একাধিক আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুনীত সেনগুপ্ত : বাংলা চলচ্চিত্র সমালোচনায় সাধারণত চলচ্চিত্রের টেকনিক্যাল দিকটি উপেক্ষিত থাকে। সুনীত সেনগুপ্তের লেখা তার বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা' ও 'চলচ্চিত্র কথা'য়।

প্রলয় শূর : তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বার্গম্যান' ও 'মৃণাল সেন' (সম্পাদিত), 'গদার' নামক গ্রন্থেরও তিনি অন্যতম রচয়িতা। চলচ্চিত্র বিষয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোত্তম পত্রিকা 'মুভি মনতাজ', তিনি দীর্ঘকাল ধরে তার সম্পাদক।

সৈকত ভট্টাচার্য : বলিভিয়ার পরিচালক সেনজিনেসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বা নিজের ছবি 'অবতার' নিয়ে তাঁর সরস আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একসময় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নিয়ে তিনি জার্মান ভাষাতেও লিখেছেন।

ধীমান দাশগুপ্ত : তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে আছে 'কম্পোজিশন' (যন্ত্রস্থ), 'দুলিয়া : গল্প ও চিত্রনাট্য', 'চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ', 'নতুন বাংলা সিনেমা' ও 'চলচ্চিত্রের অভিধান' (সম্পাদিত)। তাঁর লেখা গল্প চিত্রায়িত হয়েছে এবং কয়েকটি তথ্যচিত্র ও কাহিনী চিত্রের চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি।

ইরাবান বসুরায় : স্বনামে (সব্যসাচী দেব) কবিতা ও ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা,' 'সমাজ ও চলচ্চিত্র' প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থে।

সোমেন ঘোষ : রচিত গ্রন্থ—'সিনেমার ঘর ও বাহির'। এছাড়া তাঁর রচনা বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন—'চলচ্চিত্রের অভিধান', 'নতুন বাংলা সিনেমা' প্রভৃতি।

রজত রায় : প্রকাশিত গ্রন্থ—'চলচ্চিত্রের সন্ধানে', 'চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা', 'ফিফটি ইণ্ডিয়ান ডিরেকটরস,' 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি' (সম্পাদিত), 'সমাজ ও চলচ্চিত্র' (সম্পাদিত) প্রভৃতি। চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী রচনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তিনি প্রধান পথিকৃৎ।

প্রদীপ বিশ্বাস : মূলত ইংরেজিতে (স্ক্রীন, দি টেলিগ্রাফ. অমৃতবাজার পত্রিকা) লিখে থাকেন। তাঁর বাংলা রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'চলচ্চিত্রের অভিধান'. 'নতুন বাংলা সিনেমা' প্রভৃতি গ্রন্থে।

অমিয় বসু : চলচ্চিত্রের কলাকৌশলের আলোচনার সঙ্গে রসানুভূতির বিশ্লেষণের মিলন ঘটেছে যে-সমস্ত বাঙালি চিত্রসমালোচকের লেখায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা আছে 'চলচ্চিত্রের অভিধান' গ্রন্থে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : রচিত গ্রন্থ—'সমাজ, চলচ্চিত্র ও সত্যজিৎ রায়' এবং 'চলচ্চিত্র ভাবনা', প্রথম গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির রজত কমল পুরস্কার পান। চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রসারের কাজে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ : তাঁর খ্যাতি মূলত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার জন্য। তবু চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক দিক বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার কথা সুবিদিত।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : শুধু চলচ্চিত্র নয়, সাহিত্য নিয়েও লিখে থাকেন। তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মৃণাল সেন', 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি', 'সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সানন্দা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। সত্যজিৎ ও মৃণালকে নিয়ে ধারাবাহিক লেখা লিখেছেন। একসময়ে ছিলেন 'দেশ' ও 'আজকাল' পত্রিকার নিয়মিত চিত্রসমালোচক।

দীপেন্দু চক্রবর্তী : মূলত অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত হলেও, তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা পাঠকসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য ও সেই কারণে সহায়ক। তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মৃণাল সেন', 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি', 'সমাজ ও চলচ্চিত্র'

প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে।

ধ্রুব গুপ্ত : 'ঋত্বিক ও তাঁর ছবি', 'আইজেনস্টাইন' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নবারুণ ভট্টাচার্য : মূলত কবি ও নাট্যকর্মী হিসেবে পরিচিত। চলচ্চিত্র নিয়ে খুব কমই লিখেছেন কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র সমালোচনা আজ তাঁর চর্চা চায়। তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চলচ্চিত্রের অভিধান' গ্রন্থে।

বীতশোক ভট্টাচার্য : তাঁর খ্যাতি মূলত কবি ও প্রাবন্ধিক রূপে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁর চলচ্চিত্র সংক্রান্ত রচনাও গভীর মননশীলতায় চিহ্নিত। রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চলচ্চিত্রের অভিধান', 'সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল' প্রভৃতি গ্রন্থে।

ঈশ্বর চক্রবর্তী : বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র ও 'গিলিগিলিগে' কাহিনীচিত্রের পরিচালক। তাঁর সমালোচনামূলক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চলচ্চিত্রের অভিধান', 'সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল', '১৬টি সাক্ষাৎকার' প্রভৃতি গ্রন্থে।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় : প্রকাশিত গ্রন্থ—'ক্ষানাক্ষ নির্ণয়', 'ম্যাসকুলাঁ ফেমিনাঁ' (অনূদিত চিত্রনাট্য)। তাঁর চিত্রসমালোচনা, ভাষারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

সোমেশ্বর ভৌমিক : প্রকাশিত গ্রন্থ—'সিনেমার ভালোমন্দ', 'সমাজ ও চলচ্চিত্র' (সম্পাদিত)। চলচ্চিত্র শিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণে তাঁর রচনা বাংলা চিত্রসমালোচনার জন্য একটা নতুন ভূভাগ এনে দিয়েছে।

পূর্বোক্ত সূচিপত্র ও আলোচকদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের এই সাধারণ পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা বইয়ের আলোচনাগুলি নিয়ে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করবো। খুব সাদামাটা ভাবে সূচিপত্রের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেও পাঠকের নজরে পড়বে যে, নিয়মিত চিত্রসমালোচক ছাড়াও আরো কত কেউ বাংলায় চলচ্চিত্র সমালোচনা করেছেন এবং খুব সাধারণ ভাবে পড়ে গেলেও বোঝা যাবে যে, কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের রচনাই না এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: সাধারণ ও বিশেষিকৃত, বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক, সাহিত্যগুণসম্পন্ন ও সমাজতত্ত্বমূলক, টেকনিক্যাল ও ইস্থেটিক। চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারা ও ধরন সম্পর্কে গাস্ত রোবের্জ তাঁর 'সিনেমার কথা' বইয়ে বলেছেন, 'ছবিবিশেষের রিভিউ, ছবি উপভোগ ও চলচ্চিত্র সমালোচনা—এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক চলচ্চিত্র সমালোচনা বিষয়ক যে-কোনো আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। ফিল্‌ম্ বিশেষের রিভিউ আসলে ছবির প্রচারের একটি বাহন, ছবিটি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন। ছবির রিভিউ-তে পাওয়া যায় ছবিটির বিষয়, এবং

ছবিটি ভালো না খারাপ। ছবি উপভোগ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ছবি দেখার প্রতিক্রিয়া। চলচ্চিত্র সমালোচনা চলচ্চিত্র দেখে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ। ছবির রিভিউ আয়তনে যেমন ছোট হয়, তেমনি লেখাও হয় তাড়াহুড়োর মধ্যে। এগুলি প্রায়ই বড় অগভীর। কোনো কোনো অভিজ্ঞ, পেশাদার সমালোচক রিভিউ লিখতে বসে কোনো ছবির বিষয়ে যুক্তিসমৃদ্ধ ও জ্ঞানদীপ্ত মতামত ব্যক্ত করলেও স্থানাভাবে তিনি বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পান না। অন্যদিকে চলচ্চিত্র সমালোচনা একটি পেশাদার কর্ম, সমালোচকের দায়িত্ব, ছবি বিচার করা। সেই বিচারে তিনি ঔদ্ধত্যের বশবর্তী হবেন না, বরং একজন রসাভিজ্ঞের স্বাভাবিক দক্ষতা নিয়েই তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন। বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার জন্য চাই প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতি। কোনো ছবি সম্বন্ধে নিজের মনোভাব বিন্যস্ত করার সময় কয়েকটি প্রশ্ন মাথায় রাখা যেতে পারে : ক) ছবিটি কী নিয়ে অর্থাৎ ছবিটির তাৎপর্য বিষয়ে। খ) ফিল্‌ম্-এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি—ছবির বিভিন্ন অংশগুলি কিভাবে সমগ্র ছবিটির সঙ্গে সমন্বিত? গ) অন্যান্য সমধর্মী—একই বক্তব্যবাহী বা একই রীতিতে তৈরি—ছবির সঙ্গে তুলনায় এই ছবিটির স্থান কোথায়? সমালোচনার দৃষ্টিকোণ ও সমালোচকের দায়িত্ববোধের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো। দৃষ্টিকোণগত নানা পদ্ধতি চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে : নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, রূপরীতিগত এবং পুরাণ-নির্ভর। চলচ্চিত্র সমালোচনায় নানা পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটায় অনেকের ধারণা হয়েছে যে এই সমালোচনা এতই বিষয়ীগত বা সাবজেকটিভ যে একে বিশেষ মর্যাদা দেবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা তেমন শোচনীয় নয়।'

অনেকটা একই ধরনের কথা আছে ধীমান দাশগুপ্তের 'চলচ্চিত্রের অভিধান'য়েও : 'প্রথম শ্রেণীর একজন ক্রিটিক আগে রসিক, পরে বিচারক। যখন তিনি বিচারক তখন তাঁর ক্রিটিসিজমে নির্দিষ্ট প্রতিন্যাস ও নিজস্ব রীতি থাকবে। তিনি যেমন সমগ্র ছবিকে বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করে দেখবেন, তেমনি বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলিকে সংশ্লেষণ করে ছবিটিকে রিডিফাইন-ও করবেন। রিডিফাইন করা এক ধরনের রিক্রিয়েট করাই। চলচ্চিত্র সমালোচনার ইতিহাসে, চলচ্চিত্রকে একটি নান্দনিক ভিত্তিভূমি দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বালাজ। চলচ্চিত্রের আলোচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গকে মেলাতে চেয়েছিলেন বার্জাঁ। আবেগ নয়, মনন ; নাটকীয়তা নয়, সচেতনতা ; বলেছিলেন ব্রেখ্‌ট্। বার্জাঁর ভাবধারাকে প্রসারিত করে কাইয়ে দ্যু সিনেমা পত্রিকার চিত্রসমালোচক গোষ্ঠী নিজেদের অট্যর থিয়োরিকে রূপ দিয়েছিলেন, যা ছবির বিবিধ উপাদানের ও মাধ্যমটির উপর সম্পূর্ণ দখল থাকা চিত্রনির্মাতাদের জাত স্রষ্টা আখ্যা দিয়েছিল। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সঙ্গে আসছিল তার শিল্পরূপের কথা, শিল্পরূপের

সঙ্গে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রস্তাবের উপস্থাপন। সিনেমা নিয়ে সাধারণ ও সরল রচনার পরিবর্তে আলোচনা ক্রমেই হয়ে উঠলো ব্যক্তিগত, জটিল ও পরীক্ষামূলক। আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বাড়লো, কাইয়ে গোষ্ঠী ভাববাদী নন্দন থেকে মার্কসবাদী বিচার পদ্ধতিতে চলে আসার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে এই প্রবণতার ব্যাপক সূচনা। এখন সিনেমার স্ট্রাকচারালিজম নিয়ে লেখা হচ্ছে, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন প্রতীতির বিশ্লেষণে ভাষাতাত্ত্বিক মডেলকে কাজে লাগানো হচ্ছে, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে গণিত ও জ্যামিতি দিয়ে। এসব কিছুর প্রভাব পড়েছে চলচ্চিত্র সমালোচনার ওপর।'

আমরা পাঠকের বিচার বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমাদের বইয়ের আলোচনাগুলির মধ্যে এটি রিভিউ ওটি ক্রিটিসিজম, এটি সাধারণ নিবন্ধ ওটি বিশেষিকৃত প্রবন্ধ, এটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ওটি নান্দনিক মনোভাব প্রসূত : এরকম আলাদা-ভাবে বলে দিচ্ছি না। একটি সযত্ন অনুসন্ধান পাঠকের কাছে প্রত্যাশিত। আমরা এখানে শুধু আলোচনাগুলির মধ্য থেকে চিত্রসমালোচনা বিষয়ে যে-সমস্ত বিশেষ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেগুলির উল্লেখ করছি।

সত্যজিৎ ঋত্বিক ও মৃণাল, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র লেখা সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য। প্রতিটি লেখাই নিজ নিজ গুণে ও রুচিতে উজ্জ্বল। যেমন উৎপল দত্তের লেখাটি—গভীর পঠনপাঠনের সঙ্গে নিজস্ব মৌলিকতা মিললে এমন লেখা সম্ভব। গুরুদাস ভট্টাচার্যের লেখাটিতে আবার গভীর পঠনপাঠনের সঙ্গে বিদগ্ধ চিন্তা মিলেছে। একই ছবি নিয়ে পঙ্কজ দত্ত ও চিদানন্দ দাশগুপ্তের লেখা এবং আর একটি ছবি নিয়ে নবারুণ ও বীতশোক ভট্টাচার্যের লেখা পাশাপাশি রেখে পড়লে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ধরা পড়বে, বোঝা যাবে উঁচুদরের শিল্পসৃষ্টিকে কী করে বিভিন্ন ভাবে আস্বাদন করেও প্রকৃত উপভোগ করা যায়। রোবের্জের রচনাটিকে প্রকৃত অনুধাবন করতে গেলে তেমনি দরকার তিনি যে নতুন সমাজ ও নতুন সিনেমার কথা বলছেন তার তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত ছবিটিকে ও ছবির আলোচনাটিকে বিচার করা। সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, কবিতা, জ্যামিতি : বিভিন্ন অনুষঙ্গে সমালোচকেরা তাঁদের আলোচনাগুলিকে ব্যাপ্ত করেছেন।

বৈচিত্র্যই এ-বইয়ের মূল কথা। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ রচনায় ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বিধৃত, বীতশোক ভট্টাচার্যের ছোট্ট লেখায় ছবির প্রাণবস্তুটি উদ্‌ঘাটিত। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যমূলকতা আর ধীমান দাশগুপ্তের তত্ত্বমূলকতা। সোমেশ্বর ভৌমিকের কেতাবী আলোচনা, প্রলয় শূরের পাঠককে সঙ্গী করে ভাসতে, ভাসতে এগিয়ে চলা। কারো লেখায় পরিচালকের অবিমিশ্র প্রশংসা, কারো লেখায় পরিচালকের প্রতি সুতীব্র অভিযোগ। আবার সমালোচক নিজে পরিচালক হলে কত

ভেতর থেকে ছবিকে ধরতে পারেন সৈকত ভট্টাচার্য ও ঈশ্বর চক্রবর্তীর লেখা তার প্রমাণ। ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, সমালোচকদের মধ্যে ধ্রুব গুপ্ত তাঁর যে রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটির নির্বাচনে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তাঁর মতে ওটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি ব্যক্তিগত আপত্তি সত্বেও রচনাটির অন্তর্ভুক্তিতে মত দেন।

কোন্ ছবি, কে পরিচালক, সমালোচক কে এবং কেমন আলোচনা: এতগুলি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চূড়ান্ত সূচিপত্র তৈরি করতে হয়েছে। সুতরাং কোন-না-কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কোথাও-না-কোথাও কিছু-না-কিছু ছাড় দিতেই হয়েছে। স্কুলের রুটিন তৈরির মতো ক্ষুরধার কাজ এটি। 'ভূগোল অমনিবাস' বা '১৬টি সাক্ষাৎকার'-এর তুলনায় এই বইয়ের সম্পাদনাকর্ম অনেক বেশি জটিল ও দায়িত্বশীল কাজ এবং এখানে বিতর্ক সৃষ্টির সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

এই ভূমিকা রচনায়, বস্তুত এ-বইয়ের সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রতিটি পর্বেই, শ্রদ্ধেয় দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও ধীমান দাশগুপ্তের কাছ থেকে যে সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি তা লৌকিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উর্ধ্বে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চিদানন্দ দাশগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য ও মৃগাঙ্কশেখর রায়ের লেখার জন্যও কৃতজ্ঞ। প্রদীপ বিশ্বাসের কাছে গুরুদাস ভট্টাচার্যের ও রবি দত্তের কাছে ধীরেশ ঘোষের লেখার ব্যাপারে কৃতজ্ঞ রইলাম। যেমন মৃণাল সেনের লেখার জন্য তাঁর স্ত্রীকে ও ঋত্বিক ঘটকের লেখার জন্য তাঁর ছেলেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যখনই দরকার হয়েছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুবর অতনু পাল।

সমালোচকদের নিয়ে হাসিঠাট্টা ব্যঙ্গবিদ্রূপ হয়েছে কম নয়। কেউ এঁদের তুলনা করেছেন খেজুর গাছের সঙ্গে। মেসোপটেমিয়ার খেজুর গাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুর গাছ। তলায় বসে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। কেউ এঁদের উল্লেখ করেছেন মিচ্‌কে পাগল বলে, যে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, ফলের বাগানে এসে গাছে চমৎকার ফল ধরেছে দেখে যার বক্তব্য—হুঁ, ভালোই ফল ধরেছে দেখছি, বেশ বড় বড় আর ভেতরে রসও আছে খুব, তবে সংখ্যায় বড্ড বেশি হয়েছে যেন, এত ফল ধরা বাপু ভালো না। রোবের্জের মতে এ হল খাটো মাপের সমালোচকের লক্ষণ। আমাদের বইয়ের সমালোচকেরা এর চেয়ে সুস্থ ও সবেস।

ফলে কোন উন্নাসিক পাঠক আমাদের এই বইকে আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের অনুকরণে বড়জোর 'চলচ্চিত্র ও চল্লিশ সমালোচক' এই বলে ঠাট্টা করতে পারেন—এর বেশি কিছু নয়।

উত্তম চৌধুরী

বাইসাইকেল থীভ্‌স্

সত্যজিৎ রায়

ঘটনাবশত প্রথম যে ইটালিয়ান ছবিটি আমি দেখি তা ছিল ভিট্টোরিও ডে সিকার বাইসাইকেল থীভ্‌স্। রেণে ক্লেয়রের মতে ছবিটি হল 'বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি'। এই ছবি এমন একটা আদর্শ মান স্থাপন করেছিল খুব কম ছবিই যা করার কথা ভাবতে পারে, অর্জন করার কথা দূরে থাক।

ডে সিকার অভিনেতাদের চমৎকার ভাবে কাজে লাগানো, ভাবব্যঞ্জক ডিটেলের প্রতি অভ্রান্ত দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতির প্রমাণ আগেও পাওয়া গেছিল, কিন্তু বাইসাইকেল থীভ্‌স্ ছবিতে এই গুণগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ডে সিকা বাইসাইকেল থীভ্‌স্ বানান ১৯৪৮ সনে সিজারে জাভাত্তিনির চিত্রনাট্য থেকে। জাভাত্তিনির গল্প বা চিত্রনাট্য থেকে আরো যে সমস্ত ছবি হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে তিনি হলেন আধুনিক সিনেমার একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ হল মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি রয়েছে ও সিনেমাহলে চালাবার জন্য নব্বই মিনিটের মতো দৈর্ঘ্যের ছবির পক্ষে আদর্শ যে 'chain' টাইপের গল্প তার উদ্ভাবনে তিনি খুবই সুদক্ষ। তাঁর প্লটের সারল্য প্রয়োগে প্রখরতা এনে দিতে পারে

এবং চিত্তাকর্ষক ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনামালা ও চরিত্ররাজি দর্শকের আগ্রহ আগাগোড়া বজায় রাখে। এই ধরনের একটি গল্প, সকলের পক্ষে বোধগম্য ভাবে, পর্দায় কীভাবে সার্থক উপস্থাপনা পেতে পারে, বাইসাইকেল থীভ্‌স্ আজ পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এর আবেদন এতই আন্তর্জাতিক যে একদিকে লাইফ পত্রিকা ও অন্যদিকে সোভিয়েত লিটারেচর পত্রিকায় গ্রিগরি আলেকজান্দ্রভ একই সঙ্গে এই ছবিকে মাস্টারপীস বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এর ব্যবসায়িক সাফল্য একে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলির অন্যতম করেও তুলেছে।

মূলত, অনুসরণের, পশ্চাদ্ধাবনের অতি প্রাচীন বা ধ্রুপদী থীম হল এই ছবির থীম। এই ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান একটা চুরি-যাওয়া সাইকেলের জন্য, যেটা খুঁজে না পাওয়া গেলে তার মালিককে অনাহারে দিন কাটাতে হবে। পরিচালকের মনোবৃত্তি অনুসারে ফিল্মের যে-কোন মৌল থীমের মতো এই থীমেরও অসংখ্য প্রকার চিত্ররূপ হওয়া সম্ভব। জাভাত্তিনি যে-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন তার ফলে চবিতে হাসি-কান্না-উত্তেজনা সমস্তই আছে, আর আছে পুলিশি ব্যবস্থা, গির্জা, বেশ্যাবৃত্তি এবং ভাগ্যগণনার জালিয়াতি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। শ্রমজীবী পরিবারের যে-ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা তীব্র ও তীক্ষ্ণ, কটু ও নিষ্করুণ। পিতাপুত্রের যে-সম্পর্ক এ-ছবিতে পাই তা সূক্ষ্মতা ও গভীরতায় সিনেমা জগতে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি সাইকেল-চোরের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি জাগ্রত করতেও এই ছবি সক্ষম হয়। এবং ছবির চূড়ান্ত পর্যায়ে, ট্র্যাজিক বিষাদের অন্তিম স্বরে, এই ছবি যেন ভেদ্যুর মতো, ব্যর্থতা ও নিরাশার এক সমগ্র যুগকে তুলে ধরে।

বাইসাইকেল থীভ্‌স্ ছবিতে চলচ্চিত্রের মৌল উপাদান ও উপকরণগুলোর অতি সফল পুনরাবিষ্কার ঘটেছে, আর এ-ব্যাপারে ডে সিকা চ্যাপলিনের প্রতি তাঁর ঋণ উন্মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। থীমের সহজ সার্বজনীনতা, প্রয়োগের কুশল কার্যকারিতা, এবং নির্মাণে স্বল্প ব্যয়ের দরুন ভারতীয় চিত্রনির্মাতাদের পক্ষে এই ছবি, অনুশীলনের জন্য, আদর্শ ছবি হওয়া উচিত। কলাকৌশলের প্রতি যে অন্ধ বিশ্বাস সম্প্রতি দেখা গিয়েছে পরিচালকদের মধ্যে বিশুদ্ধ অনুপ্রেরণার অভাবই তার কারণ। সিনেমার মতো একটা জনপ্রিয় মাধ্যমের ক্ষেত্রে, প্রকৃত অনুপ্রেরণা জীবন থেকে খুঁজে নিতে হবে, জীবনের মধ্যেই তার শিকড় থাকতে হবে। যতই কলাকৌশলগত চাকচিক্য থাকুক না কেন, থীমের অস্বাভাবিকতা ও প্রয়োগের কাপট্য তাতে দূর হওয়ার নয়। ভারতীয় পরিচালকদের জীবনের দিকে ফিরতে হবে, বাস্তবের দিকে ফিরতে হবে। তাদের আদর্শ হওয়া উচিত ডে সিকা, ডে মিলে নয়।

মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত। অনুবাদ : সুস্মিতা ভট্টাচার্য

নাজারিন ও লুই বুনুয়েল

ঋত্বিক ঘটক

বুনুয়েলের সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়া ছিলো, কিন্তু এক Los Olvidados ছাড়া আর-কোন ছবি দেখার সৌভাগ্য এদেশে আমাদের হয় নি। সেও দেখানো হয়েছিল বহুকাল পূর্বে, এবং অত্যন্ত কাটাছেঁড়া একটা সংস্করণে।

অবিশ্যি, তাঁর জীবন সম্বন্ধে যা খোঁজখবর আমরা পেয়েছি তাতে অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। বুনুয়েল হচ্ছেন ছবির জগতে এক stormy petrel, ১৯২৮ সালে সালভাদোর দালির সংগে মিলে স্যুররিয়েলিজম সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করার অভিযানে তাঁর ছবির জগতে প্রবেশ। কক্তো এবং তিনি—সালভাদোর দালির সংগে মিলে—দুজনে দুটি ছবি একই ব্যবসাদারের পয়সাতে একই সংগে করেন।

স্যুররিয়েলিজমকে আমরা যতোই উড়িয়ে দিই না কেন এখন, ঐ সময়টিতে তার একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো এবং ছবিটি আমরা দেখতে না পেলেও সেই বিখ্যাত ইমেজটি আমাকে অত্যন্ত haunt করেছে—সেই বিগ্ ক্লোজ-আপে ক্ষুর দিয়ে চোখের মণি কেটে-দেওয়া-শট্‌টি, বারেবারে আসে একটা leit motif-এর মতো।

তারপর বহু-বছর বুনুয়েলের যে আশ্চর্য সংগ্রাম, কারো কাছে মাথা না নুইয়ে স্বেচ্ছাকৃত যে নির্বাসন, চিরকাল তা একটি শিল্পীর নৈতিকবলের উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে। বহু বছর তিনি মাদ্রিদে বসে বস্তাপচা কমার্শিয়াল ছবিগুলিকে কেটেছেঁটে একটা ভদ্র চেহারা দিয়ে বাজারে ছাড়ার জন্য এডিট করে পেট চালিয়েছেন। তবু, নিজে কোন ছবি পরের হুকুমে করেন নি।

'নাজারিন' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুনুয়েলের অতীত সম্বন্ধে দুটো কথা বললাম এই জন্যে যে, তাতে-করে মানুষটিকে কতোখানি সিরিয়াসলি বিবেচনা করবো তার একটা হদিশ পাওয়া যাবে।

'নাজারিন' দেখে দুটো কথা আমার মনে হয়েছে, সেইটাকে গোড়াতেই সেরে রাখি। দুটোই 'নাজারিনে'র বাইরের কথা।

প্রথমে মনে হলো, ইংরেজিভাষায় যে নাকউঁচু কতকগুলো কাগজ বেরোয় তাতে যেসব সমালোচকরা লিখে থাকেন, তাঁরা কতবড় গণ্ডমূর্খ। কথাটা আগেও মনে হয়েছিল 'দোলচে ভিতা' দেখার পর। এই সমালোচকরা এতোই অশিক্ষিত এবং ছবির সম্বন্ধে এঁদের ধারণা এতোই ওপর-ওপর যে, এঁরা সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত করে দেন। তার একটা কারণ বোধহয় যে, ওঁরা অন্যান্য শিল্প, ওঁদের নিজেদের দেশের এবং সভ্যতার ইতিহাস এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। এঁরা বোধহয় ছবি ছাড়া অন্য

কিছুতে কোন উৎসাহ খুঁজে পান না। ফলে, ছবি-করিয়েদের মহা ফ্যাসাদে পড়তে হয়, কারণ তাঁরা ঠিক ওই বিষয়গুলোর থেকেই তাঁদের শিল্পকর্মের জীবনীরস আহরণ করে থাকেন। 'নাজারিনে'র সম্বন্ধে আলোচনায় বসলে এবং তারপরে তাঁদের লেখাগুলো পড়লে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আর, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, এ দেশে দেখলাম ছবিটিকে দেখাবার আগে একটা ইনট্রোডাকশন hand-out ধরিয়ে দেওয়া হলো। সেটা নাকি কোন বিখ্যাত মেক্সিকান কবি, বুনুয়েলের বন্ধু, এবং এদেশে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূতের লেখা। তাতে সালভাদোর দালিকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং সার্ভেন্তেসের ডন কুইকজোট পর্যন্ত এসে পড়েছে। জানি না হয়তো স্থানাভাবের জন্যেই এরকম একপেশে লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখাটি অত্যন্ত misleading, বিশেষ করে, দালির নাম ঐভাবে জড়ানোতে বুনুয়েলের সমস্ত ডেভেলপমেণ্টটা এবং তাঁর বর্তমান অবস্থিতিটা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে গুলিয়ে যাবার আশংকা প্রচুর।

এর থেকে বরং ভালো ছিলো সোজাসুজি ছবিটা দেখিয়ে দেওয়া।

'নাজারিন' নামটা আমাদের সামনে সংগে সংগে দ্যোতনা এনে দেয়, অথচ বিলিতি কাগজে পড়লাম 'নাজারিন' ছবিটা ভালো, কিন্তু তার নামটা পর্যন্ত কতো সংকেতময় একথা কারোরই লেখায় পড়েছি বলে মনে পড়ে না। ঐ নামকরণের সংগে একটানে বুনুয়েল সাহেব সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটা এনে ফেলেছেন—কারণ আমাদের সংগে সংগে মনে পড়ে যায় Jesus of Nazareth এর কথা, সংগে সংগে ছবিটার থিম আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

Persecution of the fool—এই থিমটা একটা সুপ্রাচীন এবং আর্কেটাইপাল থিম। সমস্ত দেশের সমস্ত সভ্যতার বিভিন্ন গাথার মধ্যে আমরা এই থিমটিকে বারে বারে খুঁজে পাই। সেদিক থেকে যীশু এবং ডন কুইকজোট আত্মীয় বৈকি। দুজনেই archetypes of fool আমাদের যাজকটিও তাই। এই দেখার ভংগির মধ্যে যে-প্রচণ্ড ঘৃণা এবং বিদ্রূপ লুকিয়ে রয়েছে তাকে এমন সহজ গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা, একমাত্র বুনুয়েলের পক্ষেই সম্ভবপর। তার সংগে ছবিময় একটা tension লক্ষ্য করা যায়, যেটা রিলিজ হয় একেবারে শেষে Hallelujahর অনুভূতিতে। সেটাও কিন্তু বিদ্রূপ।

এই ছবি দেখতে-দেখতে আমার খালি মনে হচ্ছিলো যে, বুনুয়েল সাহেব অত্যন্ত ভাগ্যবান। কারণ, সাধারণের যতোই বিশ্বাস হোক না কেন যে, আমরা ধর্মান্ধ জাতি, আমাদের কুসংস্কার অনেক বেশি ইত্যাদি-ইত্যাদি, রোমান-ক্যাথলিক Culture Complexটি অনেক বেশি শক্ত। আজো তাতে ধাক্কা মারায় সুবিধে হয়। কারণ,

Organized Church একটা ইন্সটিটিউশন হিসেবে, বিশেষ করে, মধ্যযুগের বিস্তৃতির মধ্যে দিয়ে, চমৎকার একটি target, আমরা ও-পুণ্যে বঞ্চিত। আমাদের লড়াই করতে হয় হাজারো Cross Current এর সংগে, যা কখনোই tangible object হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না। হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে অনেক ফিচেল এবং বদ। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। নাগার্জুনের শূন্যবাদ (বোধহয় তদানীন্তন কাল পর্যন্ত মানবচিন্তার উচ্চতম শিখর, কারণ, নাগার্জুন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম) যেহেতু, বৌদ্ধদর্শনের (মহাযানবাদী) যুক্তিযুক্তভাবে পরম-সিদ্ধান্ত, তাই, যতোদিন ভদ্দরলোক বেঁচে ছিলেন—হিন্দুরা চুটিয়ে গাল দিয়েছে তাঁকে। যখন তিনি নিরাপদভাবে একেবারেই মৃত এবং কিছু-শতাব্দী কেটে গেছে, তখন arch-reactionary শংকর, সেটিকে আত্মসাৎ করে ও কুক্ষিগত করে, বেড়ে অদ্বৈতবাদ বলে চালিয়ে দিলেন। এবং হিন্দুধর্মের একটা cornerstone হয়ে রইলো অদ্বৈতবাদ।

যতোদিন বুদ্ধ বেঁচে, (দৈহিকভাবে না হোক, মানুষের মনে এবং সামাজিকশক্তি হিসেবে) ততোদিন, তাঁর সংগে প্রচুর কুস্তি চললো। তারপর যখন তিনি আর নেই, তখন তাঁকে বিষ্ণুর অবতার করে ছেড়ে দেওয়া হলো। স্তোত্র লিখলেন জয়দেব।

এ-রকম ভুরিভুরি নমুনা দেখানো যাবে, যাতে করে ভারতীয় আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ফিচলেমি পরিষ্কার হয়ে আসে।

সেদিক থেকে Roman Catholicism অনেক বেশি বোকা। Heresy কথাটাকে যত্রতত্র প্রয়োগ করে এবং Pope the Pontifex ব্যাপারটিকে খাড়া করে, তারপর চুটিয়ে Inquisition চালিয়ে একটা অত্যন্ত tangible Goliath খাড়া হয়ে উঠেছে, যাকে যেকোন শিল্পী-David গুলতি মারতে পারে।

এবং আশ্চর্যজনকভাবে আজো ঐ সভ্যতার মানুষের মনে এই ধর্ম ব্যাপারটা বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। অতি-অধুনা রোমান-ক্যাথলিক John Kennedyর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তাই বলছিলাম, বুনুয়েল সাহেব অত্যন্ত ভাগ্যবান।

এবং তিনি সেই সৌভাগ্যকে চুটিয়ে ইস্তেমাল করেছেন। অবিশ্যি Virdiana ছবিটা এদেশে দেখানো হয় নি। কিন্তু সেই মারাত্মক Stillটি আমি দেখেছি, যাতে সেই rogueরা খেতে বসেছে ; আর, Camera তাদের ধরেছে Da Vinciর সেই Last Supper-এর ভংগিতে। কী তীব্র ঘৃণা ছবিটি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই একই ঘৃণা Nazarin এর প্রেরণার উৎস।

অনেককে এখানে বলতে শুনেছি যে, Bunuel অত্যন্ত Violent. এই Violenceকে আমি ভালোবাসি। কারণ, চিত্তের বিশুদ্ধতা এবং ঘৃণার পবিত্রতা না থাকলে এ-

Violence আনে কারো সাধ্য নেই। বুনুয়েল পুতুপুতুভাবে জীবনকে দেখেন নি; প্রবিষ্ট হয়েছেন গভীরে। একটা গোটা-সভ্যতার সম্পূর্ণ যোগফলের ওপরে তিনি অমোঘ রায় দিচ্ছেন। একটি মূর্খ, যার পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা যীশু এবং ডন কুইকজোটের মতোই মূর্খতাময়, সে লড়ে চলেছে। এবং একটি বৃদ্ধা ফলওয়ালীর সাংকেতিকভাবে আনারস দেওয়ার মধ্যেই সে সার্থকতা খুঁজে পায়। বুনুয়েলের এ-ছবি একটি সভ্যতার মিথ্যাচরণের চরম-দলিল।

একটি বিষয়ের কথা এখানে আমার মনে পড়ছে। সেটা অবিশ্যি সম্পূর্ণ কারিগরী দিক।

সমস্ত ছবিটিতে কোথাও আবহসংগীত নেই। সব সময়েই আবহশব্দ ভরে রেখে দিয়েছে ছবির পারিপার্শ্বিক। শুধু শেষের সেই আশ্চর্য-উজ্জ্বল দৃশ্যটিতে কাড়ানাকাড়া বেজে ওঠে, religious ecstasyর চূড়ান্ত প্রতীকরূপে।

আরো মনে পড়ে বামনটির ব্যবহার। বেশ্যা মেয়েটির সঙ্গে বামনের যে-অপূর্ব সম্পর্ক তিনি তৈরী করেছেন তার শেষ হয় গিয়ে বামনের দৌড়ে-দৌড়ে সেই বন্দী মেয়েটির পেছনে ছুটে তারপর সেই কাঁদোকাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে থাকাতে।

সেই যে, চাষী-মেয়েটি—যাকে তার প্রেমিক ছেড়ে গেলো, fade out এর আগে সেই-গুঁড়িখানায় তার যে-Sexual orgasm—কী মুন্সীয়ানা ঐ দৃশ্যটিতে!

বিয়েত্রিচের মা তাকে বলে, তুমি পাদ্রীটার প্রেমে পড়েছ। কথাটা সত্যি, তাই বিয়েত্রিচের যে-হিস্টিরিয়া, মনস্তত্ত্বের এমন সূক্ষ্ম উপস্থাপন খুব কম ছবিতেই দেখা যায়।

সেই-যে-গাঁটিতে মড়ক লেগেছিল, সেখানে এরা তিনজন গিয়ে পৌঁছলো এক ঘরে, যেখানে মুমূর্ষু মেয়েটি last prayer শুনতে চায় না, শুধু ডাকতে চায় তার দয়িতকে। কী গভীর মানবতাপূর্ণ দৃশ্য।

সেই গভীর রাত্রের দৃশ্যটির কথা মনে করুন, সেখানে পাদ্রীর কাঁধে মাথা রেখে বিয়েত্রিচ ঘুমিয়ে পড়লো; পাদ্রী সেই ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে একটা toadকে তুলে নিয়ে হাতের ওপর রাখলো—আদর করলো; তারপরে সেই বেশ্যা মেয়েটি এসে কাঁদতে আরম্ভ করলো: 'তুমি ওকে বেশি ভালোবাসো, আমাকে না,' এর সঙ্গে বেশ্যাটির শেষ দৃশ্য মেলাই, যেখানে সে একটা বন্দীকে কৃতজ্ঞতা জানালো এবং অন্য বন্দীদের গায়ে থুতু ছেটালো, তখনি জানি ঐ মেয়েটিই জিতেছে; যে, ছবির একমাত্র positive character.

এবং বুনুয়েল মানুষকে যতোখানি ভালোবাসেন তাতে, positive বক্তব্য না রেখে তাঁর পক্ষে চলে যাওয়া মুশকিল।

কী গভীর, কী subdued এবং প্রাণবন্ত positive বক্তব্য—যা বেরিয়ে আসছে

একাগ্র খুনী, আইনের হাত থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়ানো, একটি অতিসাধারণ বেশ্যার মাধ্যমে। যে কয়েকটা fancy বোতাম চুরির জন্যে খুনও করতে পারে।

বুনুয়েল সত্যিকারের একজন মহত্তম শিল্পী।

বাংলা সিনেমার দর্শক ও ছিন্নমূল

মৃণাল সেন

বাংলা সিনেমা আজ এক চরম দুর্গতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তা ভরা পচা গল্পে, নায়ক নায়িকার ন্যাকামি-ঠাসা সংলাপে, দেশপ্রেমের উৎকট বুকনিতে আর হলিউডি ঢং-এ নারীদেহের কুৎসিত কসরতে সিনেমার আবহাওয়া আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিছুদিন ধরে সিনেমার আসরে ভূতের আমদানি হতেও দেখা যাচ্ছে—অদ্ভুত অলৌকিক আজগুবি সব কাণ্ডকারখানা। সিনেমার কর্তারা চোলাই করা সংস্কৃতি আজ দর্শক-সমাজে বিলোচ্ছেন আর দিব্যি মুনাফার পাহাড় লুটছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কর্তারা সমানে সাফাই গেয়ে চলেছেন, 'আমরা ব্যবসাদার, দর্শকদের চাহিদা মেনেই আমাদের চলতে হবে।' অর্থাৎ দর্শকের রুচিই ঐরকম ; পয়সা দিয়ে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতেই তাঁরা চান।

বাস্তব ঘটনা যাচাই করে দর্শক সম্বন্ধে ঐ ধরনের ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নতুন ছবি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এক অবিশ্বাস্য রকমের ভিড় যে প্রেক্ষাগৃহের সামনে ফেটে পড়ে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। টিকিট কাটার উত্তেজনায় প্রতীক্ষমান দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতেও প্রায় দেখা যায় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে পুলিশও প্রায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ সমস্ত বিচার করলে স্বভাবতই মনে হতে পারে, সিনেমার কর্তাদের উক্তি হয়তো ফেলে দেবার মতো নয়।

কিন্তু দর্শকের রুচির এই কি প্রকৃত রূপ ? তা নয়, এবং তা আজ আমাদের চোখের সামনে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সাধারণ দর্শকের উপর আস্থা হারানোর কোন কারণই যে ঘটেনি, রসগ্রহণের ক্ষমতা যে দর্শকের পুরোপুরি রয়েছে তার প্রমাণ বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলন। আজ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ভিত আজ যেভাবে নড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে সাধারণ দর্শকের রসগ্রাহিতা। কয়েক বছর আগে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' গোটা ভারতবর্ষের নাটকের ট্র্যাডিশনের শিকড় ধরে

যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তা আজ নয়া-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। গণ-সংস্কৃতির এই অসীম সার্থকতা উঁচকপালে ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের কেতাবি বিচারের ওপর নির্ভরশীল থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই সংস্কৃতির (যা হচ্ছে দুনিয়ার এক-মাত্র সংস্কৃতি) উৎস ও মূল্য বিচার চিরকাল যাঁরা করে এসেছেন ভবিষ্যতে তাঁরাই করবেন অর্থাৎ সাধারণ দর্শক,—এবং এই দর্শকদেরই রুচিবিকৃতি ঘটেছে বলে সমাজের ওপরওয়ালা অর্থাৎ আর্টের মনোপলিস্টরা আজ জঘন্য প্রচার চালাচ্ছেন।

আসলে দর্শকদের রুচিবিকৃতি ঘটে নি ; ঘটানোর চেষ্টা চলছে। কুৎসিত সংস্কৃতিতে বাজার ছেয়ে ফেলে সমাজের ওপরওয়ালারা আজ দর্শকের মনে ব্যাধি আর নোংরামির সাইকোলজি তৈরি করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

'ছিন্নমূল'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই এই সমস্ত কথার অবতারণা করার বিশেষ কারণ আছে। 'ছিন্নমূল' বাজারে বেরোবার আগে ঘরোয়াভাবে কয়েকজন সিনেমা বিশেষজ্ঞকে ছবিটি দেখানো হয়। তাঁদের মধ্যে পৃথিবীবিখ্যাত পরিচালক পুডোভকিন ও অভিনেতা চেরকাশভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে পুডোভকিন। ছবির গুণাগুণ খুঁটিয়ে বিচার করেছেন তিনি। পরিচালককে তাঁর বাস্তবানুগ ভাবধারার চিত্র রূপায়ণের জন্যে পুডোভকিন তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'ভারতবর্ষে আমি যত ছবি দেখেছি সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছিন্নমূল !' ভারতবর্ষের এক তরুণ পরিচালকের উদ্দেশে পুডো-ভকিনের এই প্রশংসাবাণী আজ নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারাকে সম্মানিত করেছে। শুধু ছিন্নমূলের পরিচালকই নন,—এ দেশের সিনেমাশিল্পী ও সিনেমারসিক সবাই এজন্যে গর্ব অনুভব করবেন। তাছাড়া ছোট-বড় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় 'ছিন্নমূল' সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে ছবির ইতিহাসে এ ধরনের সম্পাদকীয় মন্তব্য আর কখনও করা হয়নি। (একমাত্র ৪২ নামক ছবির সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিছু লেখা হয়েছিল, কিন্তু তা ছবির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে নয়। অন্যায়ভাবে ছবিটিকে সেন্সর বোর্ডের কর্তারা আটকে রাখায় সেখানে তারই তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এদিক থেকেও 'ছিন্নমূল' এক বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।)

স্বভাবতই 'ছিন্নমূল' সম্পর্কে সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন। এবং বাস্তবিকই আমাদের দেশের সিনেমায় 'ছিন্নমূল' এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই ছবিতে হলিউড ছাঁচে কুৎসিত রস বিতরণের কোন চেষ্টা নেই, চেষ্টা নেই কৌতুক রসের নামে ভাঁড়ামির আশ্রয় নেওয়া, চটকদারি ফাঁকা বুলি বা জটিল সমাজ সমস্যার ঠুনকো সমাধানের ঔদ্ধত্যও এই ছবিতে প্রকাশ পায়নি। কোন কোন সিনিক নায়কের অসহ্য ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম

অথবা ধনীর দুলালীর মনধাঁধানো শ্রমিক দরদ এই ছবিতে নেই। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের এক দুর্যোগের ইতিহাস এই ছবির বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বেদনাময় অধ্যায় এই ছবির কাহিনী। কেমন করে একটা বিরাট ঝড় পূর্ববঙ্গের জীবনকে তছনছ করে দিয়ে দেশের শিরদাঁড়া দিয়েছিল ভেঙে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি চিরকালের মত ছেড়ে নিরাশ্রয় বাস্তুহারার দল কলকাতার ইটপাথরের রাস্তায় কিভাবে মাথা খুঁড়ে মরেছে, কিভাবে শিয়ালদা'র প্লাটফর্মের নোংরা পরিবেশে তারা রাতের পর রাত কাটিয়েছে, ক্ষিধের তাড়নায় তারা রাস্তায়-রাস্তায় ছুটে বেড়িয়েছে কাজের আশায়—'ছিন্নমূল' সেই সব বুকভাঙা ঘটনারই জীবন্ত দলিল। সুতরাং 'ছিন্নমূল' যে এদেশের সিনেমায় এক বিরাট ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে তা বলা যেতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, 'ছিন্নমূল' বাজারে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। দর্শক বলতে যাঁদের বুঝি, যাঁদের পয়সায় সিনেমা একটা বড়গোছের ব্যবসার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে, তাঁদের কাছে ছবিটি যথেষ্ট সমাদর পেল না।

প্রশ্ন ওঠে, কেন? যেখানে কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, সুস্থ সবল আর্ট গড়ে ওঠার সমস্ত উপকরণই যেখানে বিদ্যমান সে ছবিটির এ অবস্থা কেন? তাছাড়া ব্যবসা হিসেবেও এই ছবি বাজারে আট-দশটা ছবির সঙ্গে নিশ্চয়ই এঁটে উঠতে পারছে না। সুতরাং, যে ভদ্রলোক এই ছবির পেছনে টাকা খাটিয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে যাঁরা এই ধরনের ছবির জন্যে টাকা খাটাতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছেই বা আমরা কি জবাবদিহি করব?

কোন কোন শিল্পীবন্ধুকে বলতে শুনেছি, বাংলা সিনেমার দর্শক এই ধরনের বিষয়-বস্তু গ্রহণ করতে অক্ষম। তাঁদের মতে কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখতে দেখতে দর্শকদের রুচিই গেছে বিগড়ে; শিল্পের আসরে স্বাস্থ্য ও সরলতা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছেন না।

এখানে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন ১৯৪১ সাল। যুদ্ধের প্রচণ্ড রিয়ালিটি হলিউডের স্বপ্নচূড়ায় আঘাত হানছে বার বার। বিশুদ্ধ আর্টের কল্পনায় মশগুল হয়ে যাঁরা নিতান্তই চিত্তবিনোদনের জন্যে ছবি তুলেছিলেন তাদের কোণঠাসা করে দিয়ে মাথা তুলে উঠছে রিয়ালিষ্টিক আর্ট। নতুন বলিষ্ঠ ভাবধারা নিয়ে দেখা দিলেন শিল্পীর দল,—নিছক চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, সিনেমার আর্টকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে। সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া, ব্যথা-বেদনা, নিপীড়িত, নির্যাতিত জনসাধারণের ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা—এরই মধ্যে রয়েছে আর্টের সার্থকতা, এই হচ্ছে শিল্পীর দায়িত্ব। হলিউডের চিন্তাস্রোত তখন এই দিকে বইছিল।

হলিউডের এই সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তে প্রেস্টন স্টার্জেস নামে এক চিত্র-পরিচালক এক ছবি তুললেন—সুলাইভান্স ট্রাভেলস। ছবির নায়ক হচ্ছেন হলিউডের এক পরিচালক।

তিনি সিনেমার আর্টকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। মজুর এলাকায় গিয়ে মজুরের অভাব অভিযোগের কথা, তার শোষণের ইতিহাস ছবিতে রূপায়িত করলেন। কিন্তু দেখা গেল সমস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটার পর নিজেদের জীবনের দুঃখের প্যানপ্যানানি শুনতে বা দেখতে মজুরদের ভালো লাগে না। তার চাইতে ঢের ভালো লাগে ভাটিখানায় বসে হৈ-হুল্লোড় করতে। নায়ক পরিচালক তখন নতুন ছবি তুললেন—মজুরদেরই জন্যে। কুৎসিত নাচগান, সস্তা হৈ-হুল্লোড়ে ভরা ছবি। অদ্ভুত ভালো লাগল মজুরদের। মদের নেশায় আর ছবির কুশ্রীতায় মজুরদের সান্ধ্য বৈঠকগুলো সরগরম হয়ে উঠল। নায়ক তখন হলিউডে ফিরে এসে এই কথাই প্রচার করলেন যে বাস্তবধর্মী শিল্প নেহাৎ বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। মজুরদের শিরদাঁড়া-ভাঙা, পোড়-খাওয়া জীবনে যে শিল্পী এতটুকু আনন্দের খোরাক জোটাবে সে ধন্য,—ধন্য তার শিল্প। অতএব মজুরের কল্যাণে, মজুরের বিষিয়ে ওঠা জীবনে সামান্যতম আনন্দ বিতরণের জন্যেও কাজে লাগাও, কুৎসিত নাচ-গানে, অশ্লীল ভাবধারায় সিনেমার বাজার মাতিয়ে রাখো।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, 'ছিন্নমূল' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি বলে যাঁরা দর্শকের বিচার-বুদ্ধির ওপর আঘাত করেছেন, জেনেশুনে অথবা অজান্তে তাঁরা কিন্তু সিনেমার কর্তাদেরই পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তার ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন ধুরন্ধর সিনেমা-বণিক হয়তো একদিন প্রেস্টন স্টার্জেসের মতোই এক জঘন্য ছবি তুলতে এগিয়ে আসবেন।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, 'ছিন্নমূল'-এর দোষ কোথায়? বিষয়বস্তু যদি সত্যিই জীবনধর্মী হয়ে থাকে, রাজনৈতিক দাবাবড়ের চালে[১] পর্যুদস্ত বাস্তুহারাদের জীবন কাহিনীতে যদি যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েই থাকে, তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অঘটন কেন?

'ছিন্নমূল' নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবন—কামার, কুমোর, চাষী, ছুতোর—যা কিছুই একান্ত গ্রামীণ ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত তাই ফুটে উঠেছে ছবির কাহিনীতে। দারিদ্র্য রয়েছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন রয়েছে, কিন্তু সাধারণ বাংলা ছবির মতো দারিদ্র্যের রোমান্স নেই। এক-আধটা দুর্বল সংলাপ[২] ও

১. 'রাজনৈতিক দাবাবড়ের চালে' কথাটা ব্যবহার করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ছিন্নমূল' ছবিতে এর কোন ইঙ্গিত নেই। অবশ্য ছবিতে দেশবিভাগের রাজনীতির যথাযথ রূপদানও সম্ভব হত না, কারণ কুখ্যাত সেন্সরবোর্ড এখনও বর্তমান। সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। কিন্তু 'ছিন্নমূলে' এড়িয়ে না গিয়ে দেশবিভাগ সম্পর্কে প্রশ্নটার মীমাংসা যেভাবে করা হয়েছে তা থেকে ভুল বোঝার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। পরিচালক ও কাহিনীকার এ বিষয়ে একটু যত্নবান হলে ভাল হত।

২. শ্রীকান্ত পূর্ববঙ্গের এক চাষী, তার মুখে—'ঝড় হয়, তাই বইলা কি পাখী বাসা বান্ধে না?' অত্যন্ত কৃত্রিম সিনেমা ঘেঁষা সংলাপ এইটি।

ছোটখাট দু-একটা ঘটনা ছাড়া ন্যাকামির প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি কোথাও। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ছবি (image) জুড়ে বক্তব্যকে অদ্ভুত সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং বাংলা ছবিতে এই ধরনের ইমেজ সংযোজন এই প্রথম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ষাকালের কথা বলতে গিয়ে পরিচালক দেখালেন একটা ব্যাঙ জলে লাফিয়ে পড়ল। সোজাসুজি পুলিশকে না দেখিয়ে দেখানো হল পুলিশের বুট দরজায় লাথি মারছে এবং একটু পরেই আবার দেখানো হল হাতকড়া নেমে আসছে। এমনি আরো টুকরো-টুকরো ইমেজ বাস্তবিকই পরিচালকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য কতকগুলো ইমেজ, যেমন গর্ভবতী চাষী-বউটির পাখির বাসার দিকে তাকিয়ে থাকা, দেশের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়া, স্বপ্নের মধ্যে প্রদীপটিকে ঝড় থেকে আড়াল করে রাখা, পাখির বাসা হাওয়ায় নড়া—এ সব বেশ খানিকটা স্থূল হয়ে পড়েছে ; বড় বেশি লিটারাল (literal) হয়ে পড়ায় এ সব মোটেই শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া পাখির বাসার অতি-প্রয়োগের ফলে মাঝে মাঝে সহজ সরল গ্রাম্য পরিবেশটিকে অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হয়েছে, বক্তব্যের ডিগ্‌নিটি (dignity) যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে গর্ভবতী চাষী-বউর আম-কাসুন্দি খাওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট অ্যাকশনে এবং সর্বশেষে সমস্ত হতাশার শেষে চাষী-বউর মৃত্যুর পরেই নবজীবনের জানানি হিসেবে নবজাতকের বলিষ্ঠ কান্না বক্তব্যকে অভাবনীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। শিয়ালদা স্টেশনের বাস্তুহারাদের ডকুমেণ্টারি ছবি দর্শকের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। বাস্তুহারা বুড়ির ভূমিকায় বাস্তুহারা ক্যাম্পের সত্যিকারের এক বৃদ্ধার এবং গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মোড়লের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া চাষী-বউর ভূমিকায় শোভা সেন ও পার্শ্বচরিত্রে জলদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অধিকাংশ বাংলা ছবির অভিনয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, ছবির কাহিনী থেকে শুরু করে ছোটখাট ইঙ্গিতপূর্ণ অ্যাকশন সবকিছু করা হয়েছে এদেশের সিনেমার ট্র্যাডিশনকে ডিঙিয়ে ; এবং তা করতে গিয়ে পরিচালক যে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

তা সত্ত্বেও 'ছিন্নমূল' দর্শকদের ভালো না লাগার কারণ আছে। এখানেই আসছে আঙ্গিকের প্রশ্ন,—কিভাবে, কেমন করে শিল্পী তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলবেন। ছোট-খাটো টুকরো বক্তব্য নয়, সামগ্রিকভাবে গল্পটিকে কেমন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে দর্শকের ভালোলাগা আর না লাগা। টুকরো-টুকরো ইঁট যেমন-তেমন জড়ো করে বাড়ি তোলা যায় না। বাড়ি তুলতে হলে ইঁটগুলো সাজানোর একটা পদ্ধতি আছে। পাথরের পর পাথর যেমন-তেমন বসিয়ে তাজমহল তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে সুদক্ষ শিল্পীর সুনিপুণ প্রয়োগ-কৌশলে। ঠিক তেমনি ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে ঘটনার মালা গেঁথে অথবা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সুন্দর ইমেজ বা অর্থপূর্ণ অ্যাকশন

জুড়ে কাহিনী বা ছবিকে রসগ্রাহী করে তোলা সম্ভব নয়। তা করতে হলে চাই শিল্পীর প্রয়োগ-চাতুর্য। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে নতুন ঘটনার উৎপত্তি. তার সঙ্গে ব্যক্তি-চরিত্রের সংঘর্ষ, ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি—এমনি করেই চিত্রনাট্য তৈরি হয়। তারপর সিনেমার ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে চাই টুকরো টুকরো অজস্র ছবির সুনিপুণ সংযোজন। পুডোভকিন বলেছেন, 'A film is not shot, it is built'—সিনেমার আর্টের গোড়ার কথাই হচ্ছে ঐ।

কিন্তু 'ছিন্নমূল' সেদিক থেকে দর্শকদের হতাশ করেছে, এবং তার জন্যে দায়ী মূলত চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যের গল্প প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছি, নাটকীয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে পদে পদে। গতি অত্যন্ত মন্থর, ঘটনাও বেশ অসংলগ্ন, কোন দৃশ্যে এক অদ্ভুত চমৎকারিত্ব বা নাটকীয়তার সৃষ্টি হতে চলেছে ঠিক এমনি সময়ে মাঝপথে হঠাৎ দর্শকের মনের প্রস্তুতিকে ভেঙে দিয়ে নতুন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ফলে দর্শকের ভালো লাগতে গিয়েও ভালো লাগল না, ছবির বক্তব্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জড়ানো হল না, দর্শক ছিটকে দূরে সরে এলেন। বারবার এরকম ঘটেছে। ঘটনাগুলো যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী, যথেষ্ট বাস্তবানুগ হওয়া সত্ত্বেও চিত্রনাট্যে তার চিত্ররূপায়ণের এই দুর্বলতার সঙ্গে ছবিটি সামগ্রিকভাবে জমে উঠতে পারল না।

প্রসঙ্গত একটা দৃষ্টান্ত ধরা যেতে পারে। ছবির প্রথমেই দেখানো হচ্ছে পদ্মার পারে জলভাঙা গ্রামের এক চাষী শ্রীকান্তকে, আর তারই সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের—কামার, কুমোর, চাষী, ছুতোর, হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই। পর পর কতকগুলো ছবি এবং সংলাপ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটিই সুন্দর—গ্রামীণ চরিত্র, তার সহজ সরল প্রকৃতি, গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণমাতানো সম্প্রীতি—সব কিছুই ফুটে উঠছে আলাদা করে প্রতিটি ছবিতে বা শট-এ। কিন্তু চরিত্রগুলোর দুর্বল গাঁথুনির ফলে সমস্ত সিকোয়েন্সটাকেই মনে হল কেমন যেন আড়ষ্ট, কেমন যেন অসংলগ্ন, কৃত্রিম। রস একেবারেই জমল না। এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে।

এদিক থেকে বাংলা দেশের অনেক ছবি সস্তা বিষয়বস্তু থাকা সত্ত্বেও শুধু ঘটনার নাটকীয় সংস্থাপনে দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে থাকে। 'ছিন্নমূল'-এ যেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ Characterisation of locale and period—সস্তা সিনেমার কর্তারা সে সব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। মোটা মোটা ঘটনার নাটকীয় সমাবেশ করেই এঁরা খালাস , এবং তা এঁরা করতেও পারেন। কিন্তু আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ফুটিয়ে তোলা বাস্তবিকই দুরূহ ব্যাপার, এবং তার সার্থক রূপ দিতে গেলে আঙ্গিকের ওপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। 'ছিন্নমূল'-এর পরিচালক দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি।

ফলে অধিকাংশেই 'ছিন্নমূল' দর্শকের মন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ যে আঙ্গিকের দুর্বল প্রয়োগে তা আরও খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়ে। আগেই বলেছি শ্রীকান্তর বাড়ির দরজায় পুলিশের বুটের লাথি ও হাতকড়া নেমে আসা—এ দু-টুকরো ছবির মধ্যে জুলুমবাজ পুলিশের চরিত্র রূপায়ণের বিরাট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে এই দু-টুকরো ছবি পুলিশের চরিত্র চিত্রণের দুটো মূল্যবান উপকরণমাত্র, তার বেশি নয়। অর্থাৎ শুধু এই দুটো ছবি দিয়ে পুলিশ সম্পর্কে বক্তব্যটিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তা যথাযথ প্রকাশ করতে হলে চাই এই দুটো ছবির সঙ্গে আরো কিছু ছবির সুনিপুণ প্রয়োগ। অর্থাৎ পুডোভকিনের কথা—A film is not shot, it is built। আলোচ্য দৃশ্যটিতে আরও কয়েকটি ছবি অবশ্য ছিল, কিন্তু সেগুলোর সুষ্ঠু সংযোজনের অর্থাৎ building-এর অভাবে বক্তব্যটি দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। সস্তা সিনেমাওয়ালারা কিন্তু পুলিশের চরিত্রের রূপ দিতে গিয়ে এসবের ধার একেবারেই ধারতেন না। সেখানে হয়তো দেখানো হত মোটা জঘন্য চেহারার পুলিশ ঘরের ভেতর ঢুকে কাছে-পিঠে যা আছে লাথি মেরে ভেঙে ফেলেছে, (ঠাকুরের আসনটাও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া বিচিত্র নয়),—তারপর শ্রীকান্তকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে, সঙ্গে অকথ্য গালি-গালাজ, আর শ্রীকান্তর বউ আছড়ে পড়ে কাঁদছে। এই ধরনের দৃশ্য দর্শকের হৃদয়কে নিশ্চয়ই স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু 'ছিন্নমূল'-এ যে স্টাইলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা সার্থক করে তুলতে পারলে নিঃসন্দেহে তা উন্নততর আর্ট হিসেবে গণ্য হত, এবং সেই স্বীকৃতি দর্শকের কাছ থেকে অবশ্যই পাওয়া যেত।

সবাই যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে তখন ঘরের খুঁটি আঁকড়ে ধরে গ্রামের বৃদ্ধার সেই আকুলিবিকুলি সত্যিই মর্মস্পর্শী। বুড়িকে সবাই কত কিই না বোঝাচ্ছে, কেউ দেখাচ্ছে ভয়, কেউ গঙ্গাস্নানের লোভ দেখাচ্ছে, আরো কত কি। কিন্তু বুড়ির সেই এক কথা, 'তরা যা, আমি যামু না।' কথাগুলো দর্শকের মনকে নাড়া দেয় প্রচণ্ড ভাবে। অথচ তার পরেই যখন বুড়িকে এবং সবাইকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হল শহরের উদ্দেশ্যে সেখানে সব যেন কেমন মিইয়ে গেল। যেতে না-চাওয়া আর যেতে বাধ্য হওয়া—এর ভেতরকার সেই যে বিরাট ট্র্যাজিডি তা যেন কোথায় উবে গেল। বড় হাল্কা হয়ে গেল পরিবেশটি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সেই কথা—হায়, 'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।' বিশ্বপ্রকৃতির কেউ কাউকে যেতে দিতে চায় না, আত্মীয়তা পাতানোর, জড়িয়ে থাকার সে কি ব্যাকুল আগ্রহ :

—ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।'

বিশ্বচরাচরের সব কিছুই যেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছে 'যেতে নাহি দিব'। হায়, 'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।' যেন টুকরো টুকরো অনেক ছবির পরে দিগন্ত-জোড়া এক বুকভাঙা ছবি। কবির সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত ইমোশন উপচে উঠছে কবির ভাষায়, ছন্দে। ঠিক এমনি এক বিরাট অনুভূতি প্রস্তুত হচ্ছিল বুড়ির সেই নিষ্ফল কান্নার মধ্যে, বারবার সেই একই কথার ভেতরে 'আমি যামু না।' কিন্তু পরক্ষণেই আঙ্গিকের দুর্বল প্রয়োগের ফলে সেই অনুভূতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পর্দার ওপর দর্শক দেখল শুধুমাত্র গুটিকয়েক বাস্তুহারা চলেছে শহরের উদ্দেশ্যে।

এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, বক্তব্যকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে হলে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের প্রয়োজন। এবং 'ছিন্নমূল'-এ সেই আঙ্গিকেরই অভাব ঘটেছে।

আঙ্গিকের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। তা হচ্ছে সম্পাদনার কাজ নিয়ে নিতান্তই ছেলেমানুষি করা। সম্পাদনা চলনসই হলে ছবিটি নিশ্চয়ই এতখানি প্রাণ-হীন হত না।

কোন কোন মহল থেকে এমনও শুনতে পেয়েছি যে 'ছিন্নমূল'-এর গল্পাংশ বড় কথা নয়, কারণ ছবিটি প্রধানত ডকুমেন্টারি ধর্মী। সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যে যে ধরনের নাটকীয়তার প্রয়োজন হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডকুমেন্টারি ছবিতে দৃশ্যবক্তব্যকে সাজিয়ে বলার দরকার নেই। ঠিক যেমনটি রয়েছে, ক্যামেরায় তেমনি তুলে নেওয়াই পরিচালকের কাজ। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। রিয়ালিটির হুবহু কপি ডকু-মেন্টারি ছবির ধর্ম মোটেই নয়। এই শ্রেণীর ছবিতে চিত্রপরিচালকের হাতে পড়ে রিয়ালিটি এক নতুন রূপ পেয়ে থাকে—নতুন এক রিয়ালিটির সৃষ্টি হয়, এবং তাকে filmic reality এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। Actuality-র কার্বন কপি করা নয়, তার নাট্যরূপ অর্থাৎ Dramatisation of actuality—ডকুমেন্টারি ছবির সংজ্ঞাই হচ্ছে এই। ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসনের ছবি দেখে ডকুমেন্টারি ছবির বিচার করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ একথা মনে রাখা দরকার যে ছবিকে প্রথমেই হতে হবে ছবি—তা সে ডকুমেন্টারিই হোক বা অন্য যে কোন শ্রেণীর ছবিই হোক না কেন। অর্থাৎ আর্ট হিসাবে উতরিয়ে তুলতে পারলে তবেই তাকে বলব ছবি, তার আগে

নয়। ফ্লাহার্টি, গ্রিয়ারসন, রোথা, রাইট, ভ্‌জিগা প্রমুখ শিল্পনায়করা আজ দুনিয়াজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন শুধু সেলুলয়েডে actuality-কে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে নয়, তার নিখুঁত dramatisation হয়েছে বলেই ছবিগুলো আজ আর্টের সম্মান পেয়েছে। 'ছিন্নমূল' বলিষ্ঠ বক্তব্যে বলীয়ান হয়েও সাজিয়ে না বলার দরুন ছবিটি শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি বলেই তা দর্শক সমাজে সমাদর পাচ্ছে না।

১৩৫৭

বাংলা ফিল্মের পরিণত রূপ, আমাদের জীবন ও মেঘে ঢাকা তারা

বিষ্ণু দে

বোধহয় যন্ত্রের স্রষ্টা নয় বলে এবং তাই কর্তৃত্বে এখনও আনাড়ি বলেই আমাদের ফিল্ম শিল্প অন্যান্য শিল্প ব্যাপারের তুলনায় তেমন পরিণত তৃপ্তি দেয় না। অথচ জীবনের তাগিদ এবং আনুষঙ্গিক শিল্পগত চাপের হাওয়ায় আমাদের ফিল্মের উপরে বেশ কিছু কাল ধরে একটা বয়স্ক বুদ্ধি ও রুচিজ্ঞানের দাবি প্রভাব বিস্তার করেছে। সত্যাজিৎ রায় প্রমুখ সচেষ্ট শিল্পীর পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় তার শুভফল আমরা এরই মধ্যে পেয়েছি, 'অপরাজিত' বা 'পরশপাথর'-এর মত ফিল্ম দশ বছর আগে ভাবাই যেত না। এই শুভফলের অভ্যাস-বশেই আমাদের প্রত্যাশাও বাড়ছে, আমরা এমন ফিল্ম চাই যাতে জীবন-বেদনা ও শিল্পোৎকর্ষ একতা পাবে একটি মননে এবং দর্শক শ্রোতার পরিতৃপ্তি হবে সম্পূর্ণতার বোধে সমৃদ্ধ।

ঋত্বিক ঘটকের নতুন ফিল্ম 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে সেই রকম তৃপ্তি পেলুম যাতে মন আমাদের জীবনের করুণরূপে অভিভূত হয়ে যায়, এবং শিল্পের সংবেদন থেকে উৎসারিত একযোগে পরিগ্রহণ ও প্রতিবাদে তীব্র শুদ্ধি লাভ করে। পণ্ডিতেরা একেই বোধহয় ট্র্যাজেডির স্বরূপ বলেন। এই শুদ্ধিই বোধহয় সবচেয়ে উচ্চস্তরের শিল্পরচনার মাহাত্ম্য, যখন শিল্পরূপায়ণের মধ্য দিয়ে একাত্ম হয়ে যায় শিল্পীর এবং দর্শক-শ্রোতার জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের পুরুষার্থ। শিল্পরূপের জাত হিসেবে নানা টেকনিকগত কারণেই ফিল্মেই বোধহয় মনের এ অবগাহন সবচেয়ে দুর্লভ। তাই 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে আমাদের তৃপ্তি বিস্মিত গভীরতা লাভ করে। অবশ্য বাংলা ফিল্মে কিছুকাল ধরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মননের ও শিল্পীর ধ্যানধারণার সততা ও সচেষ্টতা।

'অযান্ত্রিক' নামক ফিল্মেই দেখা গিয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের জীবন-দর্শনের তীব্রতা, যে তীব্র শিল্প-মানসের প্রকাশে মোটা এবং সূক্ষ্ম ব্যাপার শিল্পকার্যে বিচ্ছিন্ন থাকে না, যেমন

থাকে না বাস্তব জীবনে। তাই জীবনের শ্রমনির্ভর দারিদ্র্য, নিসর্গ, প্রেম—যন্ত্রের বিষয়ে মানবিক প্রেম সব একাকার হয়ে রূপ পায় ছবির স্রোতে। 'অযান্ত্রিক'-এ যা ছিল খণ্ড-কাব্যের আবশ্যিক আকস্মিকতায় হোঁচট খেয়ে অসম্পূর্ণ, সেই কাব্যশক্তিই দেখলুম ঋত্বিক-কুমার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন এই নতুন ফিল্মে।

অনেকেই যা বলেছেন গল্পটি কিছু অসাধারণ নয়, অর্থাৎ কাহিনীটিতে কিছু চমকপ্রদ নেই; প্রায় চেনা জীবনযাত্রার চেনা মার্গের রূপায়ণ মাত্র। পরিচালক যে আমাদের সমাজের অত্যন্ত চেনা দুঃখের-সুখের জীবনকাহিনী বাছাই করেছেন, তায় স্পষ্ট হয় যে এই পরিচালক ও তাঁর সহকর্মীরা শিল্পতত্ত্বের ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত মামুলিপনা একেবারে ত্যাগ করেছেন। শিল্পসংবেদনের একমাত্র উচ্চস্তরের সমগ্রতায় আর চিত্ত-শুদ্ধিতেই সম্ভব শিল্পরচনার এই অকৃপণ দরাজ সাহসিকতা। মহৎ শিল্পরচনাতেই মেলে তথাকথিত ইসথেটিক বা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক বিচারকে শুচিবায়ুগ্রস্ত নীরক্ততায় পর্যবসিত না করে ব্যাপ্ত সমবেদনায় এবং প্রখর মননের বিস্তৃত বাহুবন্ধনে সচল-সবাক জীবনেরই মতো রূপায়ণে ধরার স্বাভাবিক সাহস। বাংলাদেশের জীবনে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিক-ভাবে যে ঘটনা সবচেয়ে বড় নির্মম সত্য, সেই গভীর ও ব্যাপ্ত সত্যটি 'মেঘে ঢাকা তারা'র আকাশভূমি। দেশবিভাগ এবং বহু লক্ষ জীবনের উন্মূলতার ভয়াবহ যন্ত্রণা তীক্ষ্ণতায় যেমন বিস্তৃত তেমনি তার প্রভাবও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মর্মে মর্মে গভীর। এই উন্মূল উদ্বাস্তু জীবন আরো ব্যথাময় বীভৎস হয়ে উঠেছে অর্থসংকটে, যার জন্য সুখী-স্বচ্ছল অনেকেই দিল্লী অঞ্চলের পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের কথা বলে তুলনায় ঢের বেশি অসহায় বাঙালীদের প্রায় গঞ্জনা দিয়ে থাকেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'র জগৎ হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত গৃহবিচ্যুত দেশবিতাড়িত পরিবারের অর্থাভাবের দৈনন্দিন জগৎ। যে কোনো পরিচালকের পক্ষে এই কাহিনী গ্রহণ করতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক হত, কারণ এ জগৎ এক হিসাবে নির্বিশেষ, অর্থাৎ সামাজিক সুখ-দুঃখের জগৎ; যে জগতে আবার ব্যক্তিদের, নায়ক-নায়িকাদের সুখ দুঃখ প্রতিফলিত হয় প্রত্যহের ক্লান্তিকর বিন্যাসে। কিন্তু মহৎ শিল্পীর কাছে এই জীবনের বাস্তবতা অর্থাৎ সত্য—হয়ে ওঠে শিল্পের মানবিক প্রকাশের বিকাশেরই আকুল আহ্বান এবং তার জাগ্রত সুকুমার সংবেদনে ঐ তথাকথিত একঘেয়ে বিন্যাসই স্পষ্ট তীক্ষ্ণ সুরে ফুটে ওঠে মানবিক বৈচিত্র্য, মানুষে মানুষে সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার রূপে রূপে। প্রকৃত বিদ্রোহী বা বিপ্লবী মেজাজ তার ভিত্তি পায় এরকম ক্লাসিক মানসে, একটা ধ্রুপদী দৃঢ়তায়, যে দৃঢ়তা আবেগকে দূরে ভাসায় না আবেগ প্রবণতায় অভিযুক্ত হবার ভয়ে, সামান্যকে বর্জন করে না অসামান্যের মরীচিকায়। তাই তার শিল্পরূপের মধ্যে যে অখণ্ডতা আসে তা বাস্তব জীবনেরই অখণ্ডতা, সজাগ সমর্থ শিল্পীর মননে আধৃত। জীবনের চেনাকে

শিল্পের প্রক্রিয়ায় আবার চেনানোর কৃতিত্ব কম কথা নয়, এবং আমাদের শিল্পগত আনন্দ এ প্রক্রিয়ায় গভীর হয়ে ওঠে।

'মেঘে ঢাকা তারা'র পরিচালকের সামগ্রিক সজাগ বুদ্ধি, চোখ কানের সতর্ক সংবেদ্যতা তাই অবাক করে দেয় খুশিতে। তাঁর দলটিও দেখা গেল জমেছে ভালো, মোটামুটি এক একাত্ম শিল্প-মানসের নিষ্ঠায় ও সংহতিতে। ক্যামেরার কাজের দক্ষতা ও ইঙ্গিতময়তা ও স্পষ্টতা গোটা রচনাকে বেঁধে রাখে, যেমন বেঁধে রাখে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সহযোগিতা। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক উচ্চারণ ও ভাষা ব্যবহারের ছন্দ-সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যও খুব ভালো এসেছে। জায়গায় জায়গায় হয়তো অভিনয়ে কিছু আতি-শয্য হয়েছে, যেমন স্বামীজী দৃশ্যে তারুণ কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ছত্রধর চলনের একটু মাত্রাধিক্য। কিন্তু মোটামুটি এ চরিত্রের অভিনয়ে আশ্চর্য কৃতিত্ব। মা, শঙ্কর, এমন কি ছোট ভাই, শেষটা প্রায়-মৌন মণ্টু—এদের সকলের অভিনয়ই নিঃসংশয়েই স্পষ্ট এবং নায়িকার দীর্ঘ ও বিচিত্র পরিবর্তনময় অভিনয় আবেদনে শক্তিমত্তায় একেবারে অবাক করে দেয়। সচরাচর ফিল্মের নায়ক-নায়িকার মুখ বা শরীর প্রবল আবেগের তির্যকভঙ্গে দেখানোর সাহস পরিচালকদের মধ্যে দেখা যায় না। এবং নামকরা অভিনেত্রীরাও বা অভিনেতারাও শিল্পের এই নির্মম দাবির কাছে আত্মদান করতে পারেন না, প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যের বা আবেদনের ধারণাবশতঃ। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নায়িকার অভিনয়ের অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা তাই এত আশ্চর্যকর ভাবে খুশি করে।

ফিল্মটিতে ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, পরিচালক নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরাই সে বিষয়ে আলাপে পঞ্চমুখ হতে পারেন। আমাদের পক্ষে তা অসৎ হবে, কারণ যে সম্পূর্ণ শিল্প রচনার তৃপ্তি আমরা পাই সে তৃপ্তিতে ছোটোখাটো ত্রুটির সন্ধানটা হয়ে থাকে কষ্টকল্পিত। তাছাড়া, শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতে বিপজ্জনকও হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ এই ফিল্মে দেখলুম একটা সম্পূর্ণতা এসেছে শুধু জীবন-দর্শনের বা শিল্প রচনার সামগ্রিকতার মধ্য দিয়েই নয়, সেই সামগ্রিকতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান পেয়েছে সমস্ত ফিল্মটির মধ্য দিয়ে যেমন পায় কোন দীর্ঘায়িত গোটা সঙ্গীত রচনায়, রাগ রূপায়ণে, অথবা সিম্ফনির রূপায়ণে, সহিষ্ণু অংশে অংশে সংহতি নির্মাণে। অথবা জানা একটা বড় উপমা দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করি : শেক্সপিয়রের নাটকে অসতর্ক ত্বরিত অনেক দুর্বলতা অনেক ত্রুটি পণ্ডিত ব্যক্তিরা সহজেই খুঁজে পান, কিন্তু শুদ্ধ পাঠের মধ্যে বা অভিনয় করতে গেলে বোঝা যায় যে, সমগ্র নাট্যের ব্যঞ্জনা বা অর্থের দিক থেকে প্রতিটি ছোটখাটো ব্যাপারই সংলগ্নতার অর্থ পেয়ে যায় গোটা নাটকটিতে। ধরা যাক সর্বপরিচিত হ্যামলেট নাটক—রাজার প্রেত সেখানে তিনবার আসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এমন কি প্রেতের প্রস্থানও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ধরুন, প্রথম আবির্ভাব এবং বিদায়, তখন রাত্রি শেষ হয় প্রভাতের

পুণ্য রক্তরাগে। কিন্তু দ্বিতীয় বিদায়ের আনুষঙ্গিক বর্ণনায় রাত্রির উপরেই ঝোঁক পড়ে, সূর্য নয়, জোনাকি পোকায়। অথবা একালের লেখাও ধরা যায়, যেমন বের্টোল্ট ব্রেখটের তিন পয়সার অপেরা বা সেৎজুয়ানের ভালো মেয়ে নামক নাটক, যেখানে জীবনাগ্রহ ও শিল্পশক্তি উভয়ত মিলে লেখককে নির্ভীক অবলীলায় পার করে দেয় পাঙক্তেয় অপাঙক্তেয় দ্বিধা বিচারের উপরে।

যে কোন একটা দীর্ঘস্থায়ী শিল্প রচনাতেই এই সংলগ্ন সামগ্রিকতার প্রশ্ন ওঠে, সংযোজনার দীর্ঘ মননে ও গ্রন্থিবন্ধনেই এই মিশ্র জটিল কিন্তু স্পষ্টতঃ এক অখণ্ডতায় দীর্ঘ ঋজু শারীরিকতা বা শক্তিমত্তা পায় তার নন্দনময়তা। তাই যা হয়ত এক জায়গায় মনে হয় একটু বেশি লম্বা বা একঘেয়ে বা অপ্রয়োজনীয়, তার সার্থকতা পরে স্পষ্ট হয় সংযোজিত বিন্যাসের পর্দায় প্রতিসাম্য পেয়ে বা পুনরাবৃত্তিতেই। সঙ্গীতে এটা প্রাথমিক ব্যাপার, এতেই কম্পোজিশন বা সংযোজনা শরীর পায়। এই রকম চোখের দৃশ্যের বা কথার স্বরের পুনর্ধ্বনি বা প্রতিসাম্য অথবা পাল্টা সংস্থান 'মেঘে ঢাকা তারা'তে দেখলুম শিল্পের সেই সাঙ্গীতিক ইঙ্গিতময়তা এনেছে, যা শুধু মহৎ শিল্পরচনাতেই পাওয়া যায়। এই সঙ্গীতচারিত্রে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে প্রতীক, সরল সাধারণ কাহিনী হয়ে ওঠে গল্পের উপরে চেনা বাস্তব জীবনের প্রায় এক উচ্ছ্রিত রূপকমূর্তি। এই সঙ্গীতচারিত্রে সম্ভব হয় পূর্বোক্ত সেই পরম তৃপ্তি যে তৃপ্তিতে নিদারুণ সত্যের বাস্তব রূপায়ণের ধাপে ধাপে আমাদের একাধারে জীবনবোধ ও শিল্পসংবেদন আবেগে আবেগে বন্যায় স্নাত মননসর্বস্ব এক শুদ্ধিতে বিবিক্ত নিছক মানবিক শুভবুদ্ধিতে গৌরবান্বিত বোধ করে সমগ্রের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে।

ঋত্বিক ঘটককে অভিনন্দিত করি তাঁর সঙ্গীত পরিচালক নির্বাচনে। সচরাচর ফিল্মে দেখি সঙ্গীত প্রযুক্ত হয় মনোহরণের উদ্দেশ্যে বা বড়জোর অতিরিক্ত অলঙ্করণের প্রয়োজনে, অর্থাৎ সঙ্গীতযোজনা থেকে যায় বহিরঙ্গ। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় দেখলুম শুনলুম ক্যামেরা এবং যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত চলে প্রাণময় বা অর্গ্যানিক সম্বন্ধের একতায়, কে যে কার প্রাণ সে জিজ্ঞাসা তাই মনেই ওঠে না। এমন কি আগের পাহাড়ের সুর আর শেষের মানবীর কান্না অথবা ক্ষয়রোগীর কাশির দমক আর তারপরেই গানের ভেঙ্গে পড়া চমক সাঙ্গীতিক সংযোজনের অশেষ ব্যঞ্জনা পায় নিঃসংশয়ভাবে। বস্তুতঃ নিছক কণ্ঠের ব্যবহার, তন্ত্রীর ব্যবহার, তবলায় স্নায়ু তরঙ্গিত লহরা, চাবুকের শব্দাভাস, রেলগাড়ির তিনদফা কেটে যাওয়া ধ্বনিরেখা, সত্যপীরের পাঁচালী—এমন কি পাখীর ডাক এ সবেতেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অভিনব শিল্পপ্রতিভা দেখালেন। তেমনি রাগসঙ্গীতের বেসুর থেকে সুর, লোকসঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রবল অভিব্যক্তি উন্মোচন, এসবেতেই সঙ্গীত পরিচালকের বিচিত্র জ্ঞান ও প্রয়োগক্ষমতা অভিভূত করে

দেয় এবং নমস্কার জানাতে ইচ্ছা হয় এই গুণীর প্রতি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায়।

ঋত্বিক ঘটকের, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের, দীনেন গুপ্ত বা সুপ্রিয়া চৌধুরী বা অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের জাগ্রত মনের প্রয়োগের উদাহরণ তন্ন তন্ন করে দেখার চেষ্টা করছি না কারণ চোখ কানের সাক্ষাৎ আবেদন ছাড়া সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ সুকুমার কৃতিত্ব উপলব্ধি করা শক্ত। সামনে দেখলে বোঝা যায়, কেন মনে হয় সুপ্রিয়া চৌধুরীর কান্নার তরঙ্গ আমাদের স্নায়ু মন্থিত করে দিয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সাঙ্গীতিক ধ্যানরূপের সমে বিসমে মানবোৎসারিত সমাজ জীবনে ও বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির সংলগ্ন অর্থময়তায়। এই স্থাপত্যের সংলগ্ন ঐক্যে শিলায়িত হয়ে ওঠে অভিনয়ের অনেকগুলি উচ্চাবচ মুহূর্ত উল্লসিত বা মর্মাহত আবেগের ভাস্কর্যে, বিশেষ করে সুপ্রিয়া চৌধুরী বা বিজন ভট্টাচার্যের চেহারায় বা বাচনে। এইটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে সঙ্গীতের সামগ্রিকতার এরকম দরদী সজাগ প্রয়োগ—নাকি সৃষ্টিই—অসামান্য রুচিজ্ঞান, সুরের ও কণ্ঠযন্ত্রের ও নিছক ধ্বনির কর্তৃত্ব আমাদের ফিল্মজগতে অভাবনীয় কীর্তি।

১৯৬০

চার্লস চ্যাপলিন ও মঁসিয় ভের্দু

বুদ্ধদেব বসু

১

যদিও হলিউডের নিন্দায় আমরা অনেকেই শতমুখ, এবং হলিউডের প্রভাবে মার্কিন সাহিত্যের প্রগতিশীল অধঃপাতের বর্ণনাও বহুবার শোনা গেছে, তবু এ-কথা সত্য যে চ্যাপলিন ঐ হলিউডেরই সন্তান। যদি অন্য কিছু নাও থাকতো, তবু এই জাত-ইংরেজ ছোট্ট মানুষটি একাই আছেন পৃথিবীর কাছে হলিউডের বিজয়ঘোষণা। হলিউড বলতে স্বভাবত আমাদের চ্যাপলিনকে মনে পড়ে না; কিন্তু এ-কথা স্মর্তব্য যে সিনেমা—মার্কিন সিনেমাই—এই প্রতিভাশালীর ভাগ্যনিয়ন্তা। যে-দরিদ্র যুবক ভাগ্যের অন্বেষণে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলো, মার্কিন মাটিতে তার পা পড়লো ঠিক সেই সময়ে, যখন সিনেমা সে-দেশে হাত-পা ছুঁড়ে আঁতুড়ে বাড়ছে। সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখ্য এই সমাপতন। উল্লেখ্য এই কারণে যে সিনেমা যেমন তাঁকে চেয়েছে, তাঁরও তেমনি প্রয়োজন ছিলো সিনেমার, অবিকল্প প্রয়োজন। কেননা, তাঁর স্বাভাবিক শক্তিসমূহ এমন অসাধারণভাবে মিশ্রিত ছিলো যে সিনেমা ছাড়া অন্য-কোনো উপায়ে তাদের যথোচিত অভিব্যক্তি সম্ভব হ'তো না। কেউ-কেউ যেমন জাত-লেখক, চ্যাপলিন তেমনি ফিল্মের জন্যই জন্মেছিলেন।

'তৎসহ দুই খণ্ড কমিক' ব'লে বিজ্ঞাপিত পূর্ব-চ্যাপলিনের হ্রস্ব চিত্রাবলি যাঁরা মনে করতে পারেন, তাঁরাই বুঝবেন যে তক্তা ছেড়ে পরদায় বদলি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, অন্যদের তুলনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য তখনই স্পষ্ট ছিলো, বালকের চোখেও স্পষ্ট ছিলো। এই বৈশিষ্ট্যের মূল তাঁর হাস্যোদ্দীপক বেশভূষা বা অঙ্গসজ্জায় পাওয়া যাবে না, অধমতম বাউণ্ডুলের রম্যতম প্রতিচিত্রণেও না ; হাত, পা, চোখ, ঠোঁট ও পেশীর অসংখ্য অতুলনীয় সূক্ষ্ম যে-সব ভঙ্গিতে তিনি চতুর্বর্ণের চিত্তহরণ করেছিলেন, সে-সবেও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা নেই। গূঢ় মৌলিকতা তার কারণ ; ভঙ্গি, পোশাক, চরিত্ররূপ, যা-কিছু চ্যাপলিনের আর যা-কিছু চ্যাপলিন, সব-কিছুর মধ্যেই প্রথম থেকে তিনি স্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন ; তাঁর রচনামাত্রই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বানিয়ে-তোলা জিনিশ নয়, হ'য়ে-ওঠা পদার্থ।

চ্যাপলিনের প্রতিভা এই অর্থে শেক্সপীয়রীয় যে তাঁর ব্যাবসার চলতি প্রথা সব ক-টা মেনে নিয়েও তিনি বিশ্বাস্য, প্রামাণিক ও ব্যক্তিগত হ'তে পেরেছেন ; তাঁর মৌলিকতা বিদ্রোহবর্জিত ; কদাচ কোনো অদ্ভুত তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। কর্মক্ষেত্রের সমসাময়িক অবস্থা এবং মাধ্যমিক মার্কিন বোধের সীমানা—এর কোনোটাকে অতিক্রম না-ক'রেও নির্জন নিজের একান্ত কথাটা তিনি ব'লে উঠতে পেরেছেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা হ'লো এই। হলিউডি সূত্র বারে-বারেই তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে ; 'দি গোল্ড রাশ'-এ ছেঁড়া কাঁথা থেকে লাখ টাকার গল্প, 'সিটি লাইটস'-এ প্রণয়ের ভাবালুতা, জ্যাকি কুগানের সহযোগে রচিত চিত্র দুটিতে কৈশোরলালিত্য। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্বকীয় এবং বিষয়-নির্বিশেষে সক্রিয় ব'লে গতানুগতিক সূত্রেই নূতন অর্থ বারে-বারে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। অর্থাৎ, আবার শেক্সপীয়রের মতোই, চ্যাপলিন স্তরবহুল শিল্পী, ভোক্তার তারতম্যের অনুপাতে তাঁর আবেদনের স্তরও ভিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু নিম্নতম স্তরেও বঞ্চিত হ'তে হয় না, কেননা নিছক উপভোগের সমান অংশিদার সকলেই।

সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ ফিল্মের জগতে আরো আছে ; কিন্তু চ্যাপলিনের সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। পৃথিবীর চিত্রলোকে সর্বমুখিতায় তাঁর জুড়ি নেই। নটরাজ তিনি ; সেই সঙ্গে কাহিনী, সংলাপ, সংগীত তাঁরই রচনা ; সমগ্র প্রযোজনাও তাঁর। তাঁরই সেই আশ্চর্য আকস্মিক সংকেত, কবিতার পঙক্তির মতো যা অবিস্মরণীয় ; সার্বিক, সর্বশেষ প্রভাবটিও তাঁরই। চ্যাপলিনের সিনেমায় চ্যাপলিনই সর্বস্ব ; একে তো এমন মুহূর্ত বিরল, যখন আমরা তাঁকে দেখছি না, তার উপর অন্যান্য নটনটী সুদ্ধ তাঁর সৃষ্টি, কেননা তারা অখ্যাত, অশ্রুতপূর্ব, এবং প্রতিবারেই নতুন। বস্তুত, চ্যাপলিন উপন্যাস লিখলে যতটা তার লেখক হতেন, প্রায় ততটাই তাঁর ফিল্মের তিনি প্রণেতা।

উপরন্তু, তিনিই মূক যুগের একমাত্র খ্যাতনামা, যিনি বাক্‌চিত্রের বিপ্লব উত্তীর্ণ

হয়েছেন। শুধু যে উৎরেছেন তা নয়, জয়ী হয়েছেন, বিজয়ী। চ্যাপলিন, মূক মুদ্রার অধীশ্বর, প্রথমেই লুপ্ত হবার তাঁরই তো কথা ছিলো। কিন্তু শিল্পপদ্ধতির এই আকস্মিক বিরাট পরিবর্তন তিনি আত্মসাৎ করলেন—শুধু দক্ষতার দ্বারা নয়, নির্লোভ চারিত্র-গুণে। সঙ্গে-সঙ্গেই বাক্‌যোজনায় রাজি হ'লে সর্বনাশ অবধারিত জেনে তিনি জিতবেন ব'লে ঠেকালেন, শিখবেন ব'লে হার মানলেন। সংকট বড়ো অদ্ভুত; প্রায়-প্রৌঢ় বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্পীকে হয় নতুন ক'রে শুরু করতে হবে, নয়তো মেনে নিতে হবে তিরোধান। পরীক্ষা কঠিন, কিন্তু চ্যাপলিনও কম যান না। তলব করলেন তাঁর বুদ্ধির, অভিজ্ঞতার সম্বল; খুঁজে পেলেন তখন পর্যন্ত অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য ক্ষমতার ভাণ্ডার। যা এসেছিলো লুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে, তাতেই বিস্তৃত হ'লো তাঁর কর্মক্ষেত্র, নতুন রূপ নিলো উদ্ভাবন, সক্রিয় হ'লো তাঁর সাংগীতিক, বাচনিক, বাগ্মিক প্রতিভা; মূকাভিনয়ের সরল রূপকের জগৎ থেকে তাঁর মুক্তি হ'লো বাস্তব আলেখ্যের সমৃদ্ধ জটিলতায়। মহত্তর চ্যাপলিনের জন্ম হ'লো।

কিন্তু একবারেই এতটা হ'লো না। ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে তিনি এগোলেন: নিজেকে শেখালেন নববিধান, আর সেই সঙ্গে হলিউডকেও শেখালেন সিনেমায় শব্দ-যোজনার প্রকৃত সার্থকতা কোথায়। বাক্‌চিত্রের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রথম রচনা 'সিটি লাইটস'-এ কারো মুখে কথা ফুটলো না, শুধু মাঝে-মাঝে আওয়াজের চমক আর সংগীতের আঘাত লাগলো। তৎকালীন গীতবাদ্যচীৎকারে সর্বতোমুখর কর্ণভেদী মর্মভেদী বাক্‌চিত্রের তুলনায় 'সিটি লাইটস'-এ এতটাই সুখশান্তি ছিলো যে অনেকেই তখন ভেবেছিলেন চলচ্চিত্রে স্তব্ধতাই স্বর্ণিল। কিন্তু চ্যাপলিন তা ভাবেননি, কেননা তাঁর পরবর্তী 'মডার্ন টাইমস'-এ এক তিনি ছাড়া সকলেই কথা বললো, আর তাঁর গভীর, সুগোল কণ্ঠস্বরও সেখানেই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম। এই 'মধ্যবর্তী' রচনা দুটির কোনো-কোনো অংশ আপতিকরূপে বাক্‌চিত্রকে ব্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষাবর্জিত বিশুদ্ধ ধ্বনি নিয়ে পরীক্ষা। মূকাভিনয়ের অতিরঞ্জিত দৃশ্যভঙ্গির পরিবর্তে চ্যাপলিন প্রয়োগ করলেন শ্রাব্য ভঙ্গির আতিশয্য। ধ্বনি, শুধু ধ্বনি, কত যে কার্যকর হ'তে পারে তা আমরা বুঝলাম 'সিটি লাইটস'-এ গণবক্তৃতার ব্যঙ্গরূপ শুনে ('দি গ্রেট ডিক্টেটর'-এ হিটলারি বক্তৃতায় তারই পূর্ণ পরিণতি), উদরস্থ বেলুন থেকে নিঃসৃত অনৈচ্ছিক কণ্ঠ-বাদনে, আর 'মডার্ন টাইমস'-এ চ্যাপলিনের সেই মরীয়া-হওয়া, তখন-তখন-তৈরি-করা বিনা-কথার গীতনিস্বনে। সেই গান, এডগার অ্যালান পো-র নারীহন্তা বানরের কিচিমিচির মতো, প্রত্যেকেই তখন ভেবেছিলো নিজের অজানা কোনো ভাষায় বিন্যস্ত। কৌশলের দিক থেকে, রসের দিক থেকেও, সিনেমার সারা ইতিহাসেই স্মরণীয় এই অংশগুলি চ্যাপলিনের গান্ধর্ব-বিদ্যারই আবিষ্কার। মুখর হবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা নিয়েও

চ্যাপলিনের মন্থর সতর্কতা শুধু ধৈর্য ও সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক নয়, এ থেকে তাঁকে আত্মনিষ্ঠ ও বিবেকবান শিল্পী ব'লেও আমরা চিনতে পারি।

২

কিন্তু এত বড়ো গুণী হ'য়েও চ্যাপলিন আজ সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয় হতেন না, যদি না তাঁর স্বকীয় কিছু বক্তব্য থাকতো, আমাদের সকলের পক্ষে জরুরি কোনো বক্তব্য। তাঁর অনন্যতার প্রকৃত উৎস এইখানে যে সর্বোপরি তিনি ভাবুক। শুধু যে ভাবতে পারেন তা নয়, খাঁটি সিনেমার ভাষায় ভাবতে পারেন। ('দি গোল্ড রাশ'-এ 'ছোট্ট মানুষটি' তার প্রকাণ্ড বুভুক্ষু সঙ্গীর চোখে মস্ত নধর মুরগি হ'য়ে নৃত্য শুরু করলে, নরভুক্‌বৃত্তির এমন ব্যঞ্জনা আর কোন শিল্পরূপে সম্ভব হ'তো?) যেহেতু চ্যাপলিন, একমাত্র চ্যাপলিন, সিনেমাকে সাহিত্যের মতোই চিন্তার বাহনরূপে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সেইজন্যই, শুধু পূর্ব-জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নয়, পরবর্তী ক্ষণপ্রভদের অতিক্রম ক'রে বিশ্বব্যাপী দুঃসময় ভ'রে তাঁর প্রতিপত্তি আজ অব্যাহত। গত শীতের গার্বোরা আজ কোথায়? তারা আসে যায়; চ্যাপলিন থাকেন।

চ্যাপলিন হাস্যরসে তুলনাহীন, কিন্তু তাঁর হাসি, এলিয়টের বর্ণিত 'অর্থে'র মতো, শুধু আমাদের মুখ বন্ধ ক'রে রাখে, আর সেই ফাঁকে তিনি নিজের কাজ হাসিল করেন, নিজের কথা ব'লে নেন। ফলত, তাঁর বক্তব্য প্রকট হ'য়ে ওঠে না; 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' বাদ দিলে আর কোনোখানেই ওঠেনি। চিত্রটির প্রকাশকাল ১৯৩৮, যখন ফ্যাসিবাদের বিভীষিকার সামনে তাঁর শিল্পের দাবিকে তিনি গৌণ ক'রে দেখেছিলেন। সেটি যে চ্যাপলিনের প্রতিভার যোগ্য হয়নি, তা বলার জন্য দ্রষ্টা হ'তে হয় না, কিন্তু সেই একটি অপলাপ নিয়ে নালিশ তোলা, তার ঠিক দশ বছর পরে 'মঁসিয় ভের্দু' পেয়েও, শুধু অনর্থক নয়, কৃতঘ্নতাও; কেননা এই 'হাস্যময় হত্যালীলা'র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই।

'নতুন চ্যাপলিন': বিজ্ঞাপনের ঘোষণা। নিশ্চয়ই; কিন্তু নতুন শুধু এ-অর্থে নয় যে এতদিনে প্রায় বিশ্বপুরাণের অঙ্গীভূত সেই ঢিলে জুতো আর ঢোলা পাৎলুন-পরা বাউণ্ডুলে এখানে প্রৌঢ় প্যারিসীয় ফুলবাবুতে রূপান্তরিত: 'মঁসিয় ভের্দু' নিরন্তর উদ্বর্তনের একটি চরমক্ষণ। পৃথিবী বদলেছে, আমরা বদলেছি, চ্যাপলিনও বদলেছেন। আমরা বুড়ো হচ্ছি, চ্যাপলিনও বুড়ো হচ্ছেন। যে-সব প্রতিবন্ধক সহজাত কিংবা অপ্রতিকার্য, তার সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্যে শিল্পীর কুলনির্ণয় সম্ভব। অনেকেই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন, কেউ-কেউ কোনোরকমে তাকে ঠেকিয়ে রাখেন, দু-একজন সেই দুর্বলতাকেই শক্তি ক'রে তোলেন। চ্যাপলিনের খর্ব আকৃতি আর কমনীয় প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে পরম

কর্তৃত্ব আমরা বরাবরই দেখেছি ; এখানে উপরন্তু আর-একটি সম্পদ তিনি পেয়েছেন, ধূসরায়মান কেশগুচ্ছ, যা স্পষ্টতই কৃত্রিম বর্ণলেপনের অপেক্ষা রাখেনি। ভের্দু, পেশাদার পতি, পেশাদার পত্নীহন্তা, সে যে এমন শোকান্তিক, হসন্তিক, মর্মান্তিক ; আর শেষ পর্যন্ত এমন গরীয়ান, তার কারণই ঐ যৌবনাতিক্রমের বিজ্ঞপ্তি। মাদাম গ্রোনেব কাছে তার প্রণয়নিবেদনের উৎক্ষেপ ; আনাবেলার রতিমত্ত আলিঙ্গনে তার বিতৃষ্ণ মুখভঙ্গি ; তার জীবে দয়া ; তার প্রকৃত অথবা একমাত্র স্ত্রী এবং সন্তানের জননী, খঞ্জ মোনার প্রতি তার স্নেহের দ্রবতা ;—এই সমস্তই তার কেশবিচ্ছুরিত রৌপ্য আভায় আলোকিত। ভের্দুর প্রৌঢ়তা এই কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন।

চ্যাপলিনের ভাবুকতা, মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা-বেদনা, 'মঁসিয় ভের্দু'তে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হ'লো। যৌবন-পেরোনো চাকরি-খোয়ানো এই ব্যাঙ্কের কেরানি আধুনিক দুর্গত মানুষের প্রতিভূ। এই রণদীর্ণ জগৎ, যেখানে মানুষ দারিদ্র্য ও দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে আন্দোলিত, তারই বিরুদ্ধে ভের্দুর যুদ্ধঘোষণা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে গুণ্ডারাজের আসন্ন বিস্তার উপলব্ধি ক'রে, সাধারণের আকাঙ্ক্ষিত শান্ত, সাধু জীবনের আশা সে ত্যাগ করেছে, এখন হিংস্রতার উত্তরে হিংস্রতা নিয়েই সে প্রস্তুত। এই সংগ্রামে তার পরাজয় অবধারিত ; কেননা ও-বস্তু টিকে থাকতে পারে শুধু বৃহৎভাবে সংঘবদ্ধ হ'লে, আর ভের্দু একজন মানুষ মাত্র, একজন ব্যক্তি—সভ্যতার সেই অমূল্য সম্পদ, যার বিনাশে বর্তমান পৃথিবী বদ্ধপরিকর। বধ্য দুর্বল দুর্বলতরকে বধ ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এও সে জানে যে তার নিস্তার নেই। সেই কাফের দৃশ্য, যেখানে ভের্দুর কোনো-এক বিগত 'পত্নী'র কঠোরদর্শন আত্মীয়যুগল শেষ পর্যন্ত তাকে দেখে ফেললো, তাতে স্পষ্টই বলা আছে যে ভের্দু ধরা পড়লো না, ইচ্ছে ক'রে ধরা দিলো। কাফে থেকে বেরিয়ে এসেছিলো ; ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিলো, সময় ছিলো প্রচুর। কিন্তু ভের্দু ফিরে গেলো। তা-ই ভালো। অমঙ্গল তার অনুগামীকে ধ'রে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে হত্যালব্ধ অর্থ। শেয়ারবাজার বিচূর্ণ ; য়োরোপ ভ'রে ব্রাউন-কামিজের হংসপাদিক কুচকাওয়াজ চলছে। আর সেই বেড়াল-পোষা, শোপেনহাওয়ার-পড়া, জেল-ফেরতা নিঃস্ব বিধবা তরুণী, অসীম অমঙ্গলের মধ্যে এক বিন্দু ভালো, যাকে বিষক্রিয়ার পরীক্ষা থেকে শুধু নয়, টাকা দিয়েও ভের্দু বাঁচিয়েছিলো, সে এখন এক ধনী অস্ত্রনির্মাতার হীরকচ্ছুরিত উপপত্নী। এদিকে পুলিশ হয়তো কখনোই তাকে ধরতে পারবে না ;—আর তাহ'লে ? ক্লান্ত সে ; বুড়ো হচ্ছে। না, এ-ই ভালো ; এখানেই খেলা ভাঙুক।

'মঁসিয় ভের্দু'র কাহিনী এখানেই সমাপ্ত : বিচারদৃশ্য চ্যাপলিনের ভাষ্য। কী উপন্যাসে, কী নাটকে, এই অংশই সবচেয়ে আশঙ্কাজনক, কিন্তু নরহত্যা, মনুষ্যজীবন এবং ভগবানের বিষয়ে ভের্দুর অতর্কিত মন্তব্য যদিও অব্যবহিত বোধগম্যতার প্রয়োজনে

অতিসরল, তবু তা নাৎসিবিরোধী চ্যাপলিনের শেষ বক্তৃতার মতো ছন্দপতন ঘটায়নি, নাটকীয়তার দিক থেকেই সঙ্গত হয়েছে। 'দি গ্রেট ডিক্টেটর'-এ চ্যাপলিন শেষ পর্যন্ত সব ছদ্মবেশ মোচন ক'রে আত্মরূপেই আত্মকথা বলেছিলেন; কিন্তু—যদিও নাম তার কখনো মঁসিয় ভের্দু, কখনো ক্যাপ্টেন বনুর, কখনো মঁসিয় ফ্লোরে, আবার কখনো বা মঁসিয় ভার্নে—ভের্দু সব সময়ই ভের্দু, তার সম্মোহনে বিরাম নেই, গিলোটিন-যাত্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে অবশ্যমান্ত। নাটকের গতিকে কোথাও ব্যাহত না-ক'রে চ্যাপলিন তাঁর সব কথা ব'লে নিয়েছেন; আমাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে ভের্দু ই বধ্য, আর ঘাতক তার পরিবেশ—আমাদের পরিবেশ : এই বর্তমান পৃথিবী।

চ্যাপলিনের বিশেষ কীর্তি এইখানে যে এমন প্রচুর আমোদের সঙ্গে-সঙ্গে এই কাহিনীর সমস্ত বিভীষিকা তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন। বিভীষিকা মুহূর্তের জন্যও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠেনি; সারা ফিল্মে আমরা চোখে দেখলাম শুধু একজনের হত্যা, কিন্তু বিষপ্রয়োগে গোয়েন্দার সেই অবলোপনে বরং যত্নসাধিত মৃদুতাই লক্ষণীয়। চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে নারীহত্যাও একটিমাত্র ঘটলো; কিন্তু সেটি আমরা চোখে দেখলাম না, হত্যার উপায়টা পর্যন্ত অনুমানের বহির্ভূত থাকলো। খবরটা ভের্দু আমাদের জানিয়ে দিলো শুধু তার নিশীথরাত্রির চান্দ্রিক উচ্ছ্বাসে; আশ্চর্য সেই পরিহাস, আশ্চর্য ধূর্ত বক্রোক্তি। এ-দুটো বাদ দিলে ভের্দুর পৈশাচিক প্রচেষ্টার প্রতিঘাতে তার নিজেরই দুর্দশার সীমা থাকে না; আনাবেলার সলিলসমাধি ঘটাতে গিয়ে সে নিজেই প্রায় ডুবে মরে, বর সেজে বিয়ে করতে গিয়ে তাকে টেবিলের তলায় লুকোতে হয়। ফলত, তথ্যের হিশেবে যে-মানুষ ঘৃণ্য, কার্যত তাকে দেখে আমরা হেসে গড়াই। চ্যাপলিনের কৌতুকপ্রতিভার প্রভাবে আমাদের অনুকম্পা নিরন্তর ভের্দুর দিকে ব'য়ে চলে। তাকে আমরা নারীহন্তা রাক্ষস ব'লে জেনেছি, কিন্তু চোখে দেখছি ক্ষুদ্র, অক্ষম, হাস্যকর, করুণাভাজন একজন মানুষকে।

তবু বিভীষিকার বিরাম নেই, বিরাট বেনামি কোনো নির্যাতনের আতঙ্ক কাফকার শিহরণের মতো আদ্যন্ত অন্তঃশীল। রেলগাড়ির চাকার প্রতীকী ঘূর্ণনে আতঙ্ক; ভের্দু যখন আলগোছে বলে, 'Business is a ruthless business,' সেই কথার স্বরে আতঙ্ক; আনাবেলার বিকট হাসির হায়েনা-তানে আতঙ্ক। আসলে, এই রূপসী রমণীর বিকৃত, কুৎসিত চিত্রণে চ্যাপলিন আমাদের জানালেন যে দাঁত-নখ-মাংসপেশীময় শক্তি-রূপিণীর পরাভব অসম্ভব, কেননা পৃথিবী হিস্টিরিয়ার হাতে সমর্পিত, অতএব রাজত্বই আনাবেলার। পূর্ণাঙ্গ একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয় এখানে দেখছি নব্বুই মিনিটের প্রমোদচিত্রে সংহত : এই দুঃসাহস চ্যাপলিনের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু চ্যাপলিনও এই অসাধ্যসাধন করতে পেরেছেন প্রায় সিনেমার স্বভাব লঙ্ঘন ক'রে। মঁসিয় ভের্দুতে

সংক্ষেপীকরণ অত্যধিক, সিনেমার পক্ষে অত্যধিক, কেননা সিনেমায় অর্থবোধের অব্যবধান চাই। গার্হস্থ্য জঞ্জাল পোড়াবার চুল্লির ঘন কালো ধূমোদ্‌গিরণ পলকের জন্ত আমাদের দেখানো হ'লো, তা-ই থেকে একটি বীভৎস ঘটনা বুঝে নিতে হবে। কাহিনীর বিভিন্ন অংশের সংযোজনার যান্ত্রিক সূত্রগুলি এতদূর পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে যে এই চিত্র আমাদের ঋজুপৃষ্ঠ মনঃসংযোগ দাবি করে। প্রথমবার দেখে মঁসিয় ভের্দু হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; আবার দেখতেই হবে, সম্ভব হ'লে আরো অনেকবার। কিন্তু সিনেমাভবনে পুনরাগমন যখন অনিশ্চিত, তার সম্ভাবনাও নিজেদের আয়ত্তে নেই, এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম ফিল্মটিরও অবলুপ্তি যখন অনিবার্য, তখন এমন চিন্তা অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক যে মঁসিয় ভের্দু ফিল্ম না-হ'য়ে—এমনকি চ্যাপলিনের ফিল্ম না-হ'য়ে—উপন্যাস হ'লেই ভালো হ'তো। জয়স সত্যই বলেছিলেন যে সাহিত্য সর্বাপেক্ষা মননশীল শিল্পরূপ, অর্থাৎ, কোনো মননশীল বক্তব্যের যথাযোগ্য স্থায়ী বাহন একমাত্র সাহিত্যই হ'তে পারে। পরিশেষে, তাই, সিনেমার এই অপূর্ব উন্নয়নের জন্য চ্যাপলিনকে আকাশস্পর্শী প্রশংসা ক'রেও এ-আক্ষেপ থেকে যায় যে এই বিরল প্রতিভা এমন এক উপায়ে আত্মপ্রকাশে বাধ্য হ'লো, যা স্বভাবতই অচিরস্থায়ী।

১৯৪৯

সুবর্ণরেখা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ঋত্বিক ঘটকের মনে কী ছিল, জানি না। 'সুবর্ণরেখা' দেখে আমার মনে হয়েছে: এ ছবিতে বাস্তবের ও তন্নিষ্ঠ চিন্তার একাধিক স্তর আছে, এবং ছবির প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সমস্ত স্তরগুলিতেই প্রসারিত ও বিন্যস্ত। সবগুলি মিলিয়েই এর কন্‌টেন্ট, যা মুখ্যত একটি মৌলিক বিন্দুতে সমাহৃত।

প্রথম স্তর। 'সুবর্ণরেখা' সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের নেমিচক্রে, রাজনীতির দাবাবড়ে হয়ে যেসব নির্লিপ্ত মানুষ চলে আসতে বাধ্য হল সাতপুরুষের ভিটে, কালানুক্রমিক জীবিকা, আর পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে, তারপর নতুন করে ঘর বাঁধার লড়াই শুরু করল, তাদের কয়েকজনকে কেন্দ্র করে পরিচালক একালের জীবন ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকাশ করেছেন, ঘটনা ও চরিত্র উভয় দিক থেকে। ফুটে উঠেছে বর্তমান পরিবেশ ও তদন্তর্গত জীবনসংগ্রাম, বাঁচবার দুরন্ত প্রচেষ্টা। এ চেষ্টা কোথাও দল বেঁধে, কোথাও দলছুট একাকিত্বে, কোথাও পারিবারিক ঐক্যে, কোথাও বা সেই

ঐক্যের অনিবার্য ভাঙনে। নবজীবন কলোনীর অন্যতম যোদ্ধার সামনে যখন লোভনীয় চাকরির হাতছানি, তখন থেকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত ; ব্যালকনি থেকে ক্যামেরার প্রথমে নতদৃষ্টি, পরে উর্ধ্বমুখী দৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে এই বিচ্ছেদরেখাটি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি : উদ্বাস্তু ঈশ্বর ও ম্যানেজার ঈশ্বর, নবজীবন কলোনী ও ছাতিমপুর বাংলোর মধ্যে ক্রমদূরত্ব। তার পরে, সমষ্টিবিরোধী ব্যষ্টিচেতনা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে ঈশ্বরেরই কাছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব তো শুধু বাইরে নয় ভেতরেও—প্রতিষ্ঠার মোহে ঈশ্বর পেছন ফিরে তাকায় না, সমষ্টির কথা ভাবে না, অথচ সামষ্টিক প্রয়োজনে তৈরি সমাজবিধিকে মেনে চলে নিজের স্বার্থ ও সুবিধেমতো। আত্মদ্বন্দ্ব তাই তার ললাটলিখন, নবজীবন তার করতল অতীত, আপন মানুষ সরে গেল দূরে। তারাও কি সুখ-শান্তি পেল ? হরপ্রসাদের, ঈশ্বরের, আর সকলের মত, তারাও পরিবেশের হাতে নিয়ত নিহত, বাস্তবের অশান্ত স্রোতে বিপর্যস্ত, নিরালম্ব বায়ুভূত···পরাজিত। সীমান্তের ওপারে যে বাড়ি হারিয়ে গেল, কোন পারেই তা আর মিলল না।

দেশ স্বাধীন হল, পরিবেশ স্বচ্ছ হল না, পরিস্থিতি জটিলতর। প্রাণরক্ষার দুরূহ সংগ্রামে, নানামুখী সংঘাতে, জীবনের ধারা বক্র, মন তির্যক, পুরানো ধ্যান-ধারণা ভাবনা বাসনা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ভাঙনের মুখে ; নীড়ের হাতছানি অথচ আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নবিলাস বারবার ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসকে, এষণাকে ; ঐক্যবদ্ধ মানুষ একলা হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ, বিচ্ছিন্নতা, বিভ্রান্তি অবশেষে বিনষ্টি। ঈশ্বরের চোখের সামনে সীতার মুখ তাই কেবলি অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে যায়। চশমা গুঁড়িয়ে যায় ভোগের পদতলে, আদর্শ গুঁড়িয়ে যায় পলায়নী মনোবৃত্তির অতিচাপে। শেষ পর্বে পরিচালক নতুন করে লড়াই আরম্ভের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তবু অবসাদ, বিষণ্ণতা, অসহায় আশাহীনতা, ফ্রাসট্রেশন ও ডিসইনট্রিগেশনের সুর সচেতন চিত্তকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে থাকে। প্রথম সচেতনতা নবজীবন কলোনীর ওপর শোষণ-শক্তির নির্মম অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে, দ্বিতীয় আঘাত বহুরূপীর কালীমূর্তির হঠাৎ সম্মুখীনতায় ; তৃতীয় ও চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দু সীতার দা দিয়ে গলা কুপিয়ে আত্মহত্যায়। প্রথমটি বাস্তব, দ্বিতীয়টি রূপক, তৃতীয়টি সাংকেতিক, যার সঙ্গে মিশে থাকে একটি স্ফুটন্ত সরল মুখ, একটি চোখ—'লা দল্‌চে ভিতা'র সেই মৎস্যচক্ষুর মত বিবেকের তন্দ্রাহীন দৃষ্টি ; পরিচালক সমকালীন জীবনের ও মনের অবক্ষয়কে একটু-একটু করে তুলে নিয়ে গেছেন ভয়ঙ্করতার, বীভৎসতার অপ্রত্যাশিত এলাকায়, এবং বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায় ও রসের স্ফূর্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমাদের পরিচিত জগৎ, তার সমস্ত সুন্দর অসুন্দর, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, লড়াই ও স্বপ্নবিলাস নিয়ে, শিল্পরূপ লাভ করেছে। ছবির প্রথম দিকে বস্তুভার যতটা, শেষ দিকে ব্যঞ্জনার ততোধিক প্রাধান্য, এবং এই ব্যঞ্জনা 'সুবর্ণরেখা'কে দিয়েছে গভীরতা ও রসময়তা।

দ্বিতীয় স্তর। ছাতিমপুরের মাঠ ভাঙতে ভাঙতে বিদায়ী ম্যানেজার রামায়ণের গল্প শুনিয়েছে বালিকা-সীতাকে। নিছক গল্পের জন্যে কিংবা ভক্তিভাব জাগাবার জন্যে নয়, পরিচালক 'সুবর্ণরেখা' কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের আদল আনবার চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা নতুন নয়। শিল্পে সাহিত্যে অসংখ্যবার এই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে, শ্রীঘটকের পূর্ব-গামী ছবিতেও এর আভাস আছে, এখানে আরও ব্যাপকভাবে। শুধু রাম-সীতা নামকরণে নয়, তার চেয়েও বেশি। সীতা 'সীতামা' বলে উল্লিখিত হয়েছে। মূল রামায়ণে সীতার জন্ম রহস্যাবৃত, এখানে সেই রহস্য অভিরামে (রক্তকরবীর 'রঞ্জন'-এরও এই জাতীয় রাহস্যিক পরিচয়) আরোপিত। তার নাম কৌশল্যা। অভিরাম সীতার বিবাহ স্বয়ংবর সভাকে স্মরণে আনে। বিনু লব-কুশের সগোত্র। ঈশ্বর একই দেহে দশরথ ও রাবণ (পুনশ্চ রক্তকরবী : যক্ষপুরীর রাজা একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ)। ঈশ্বর যখন দশরথ, রাম-বিলাস তখন কৈকেয়ীর স্বজাতি। ঈশ্বর যখন রাবণ, হরপ্রসাদ তখন বিভীষণ, এবং মুখার্জী কালনেমি। অবশ্য মহাকাব্যের আদলে গড়ার অর্থ চরণে-চরণে তার সঙ্গে সাযুজ্য নয়, এবং এসব ক্ষেত্রে স্রষ্টা-শিল্পী প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণ করে থাকেন, ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে একালকে মেশাতে গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটান, যেমন করেছেন কক্‌তো বা রবীন্দ্রনাথ বা সার্ত্র বা জীদ্‌ বা জেম্‌স জয়েস। তাই রেখায় রেখায় না মিলিয়েও দর্শক 'সুবর্ণরেখা'য় রামায়ণ কাহিনীর আভাস খুঁজে পান, সেই বারে বারে নির্বাসন বা স্থানান্তর ও আত্মাহুতি, রাম-সীতার দশরথের-রাবণের জীবনপালা। সেই সমান দুঃখ, সমান যন্ত্রণা একালের রাম-সীতার মধ্যেও। এইভাবে একাল ও সেকালকে যুক্ত করে পরিচালক সম-কালীন সমাজবাস্তবতাকে দিয়েছেন মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি, সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতা। এই যোগাযোগের ফলশ্রুতি : বার্তমানিক জীবনের ও তন্নিষ্ঠ শিল্পের আন্তর স্বরূপটি ব্যাপক আবেদনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে যদি এ ছবি অতি সরল না হয়ে থাকে, সে দায় বা দোষ পরিচালকের নয়। তিনি শুধু একটা অপরাধ করেছেন : গ্রাম্য লৌকিক পৌরাণিকতার রীতিতে রামায়ণ-কাহিনীর অবতারণা করেন নি, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদের মত মননশীলতার আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং 'সুবর্ণরেখা'র মহাকাব্যিকতা যদি দুরূহ হয়ে থাকে, তাহলে রেফারেন্স দেব 'রক্তকরবী'র দুর্বোধ্যতার। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শক সমাজের পরিশীলিত চিত্তের এপিক দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

তৃতীয় স্তর। রামায়ণ কাহিনীর অভিযোজনা আর একটি দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে : মাইথোপিয়া বা উপকথাবৃত্তি, আধুনিক সাহিত্যে আধুনিক রীতিতে প্রাচীন উপকথার শৈল্পিক প্রয়োগ। যেহেতু, রামায়ণও মৌলত আদিম উপকথা। কিন্তু এই উপকথাবৃত্তি সম্পর্কে আমি সচেতন হয়েছি ছবির দেহে 'শিশুতীর্থ' কবিতার প্রয়োগে। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-কথাকে আশ্রয় করে এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের একটা ব্যাখ্যা দিতে

চেয়েছেন : জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম পেরিয়ে পেরিয়ে মানুষ চলেছে প্রেমের ও শক্তির তীর্থের অভিমুখে, নবজাতক তথা চিরজীবিত মানুষের জয়গান কণ্ঠে নিয়ে। রামায়ণের মত খ্রীষ্ট-কাহিনীও আদিম উপকথা থেকে ক্রম-সঞ্জাত। এবং আদিম উপকথার একটি মূল সূত্র : জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম।

সমাজবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন, যাযাবর শিকারী সমাজে নয়, পৃথিবীর তাবৎ স্থাবর কৃষি-সমাজে শস্যের আসা-যাওয়া-পুনরাবির্ভাবের প্রেক্ষিতে জাদু-কৃত্যের আধারে কৃষি-প্রজনন তত্ত্বের জন্ম, যার মুখ্য বক্তব্য : জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্মের মাধ্যমে সৃষ্টি তথা প্রাণের অব্যাহত লীলা ও প্রবহমানতা। প্রথমে আকাশ বা সূর্য ও পৃথিবী বা সমুদ্রের মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের কাহিনীতে এই আদিম ভাবনার রূপায়ণ ; তারপর আরও অনেক কাহিনী ও বিচিত্র বিবর্তন। এই আদিম কৃষিভাবনাঘনিষ্ঠ উপকথাগুলির অন্যতম রামায়ণ ও খ্রীষ্টকাহিনী ; প্রথমটির অনুসরণে 'রক্তকরবী', দ্বিতীয়টির আশ্রয়ে 'শিশুতীর্থ' লেখা হয়েছে। সুতরাং 'সুবর্ণরেখা'য় 'শিশুতীর্থ'র প্রয়োগ অকারণ নয়, রামায়ণের অভিযোজনা কেবলমাত্র মহাকাব্যিক নয়, অন্তত তা আর থাকে নি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ছবির বিষয়বস্তু এই আদিম উপকথার প্যাটার্নে সাজানো : পুরুষানুক্রমিক ভিটে থেকে উদ্বাস্তু জীবন থেকে নবজীবন কলোনী থেকে ছাতিমপুর থেকে কলকাতায়—কেবলই অপসরণ এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে, রূপ থেকে রূপে, বাধা-বিপদ-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কেবলই এগিয়ে চলা, এ যেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বারে বারে পুনর্জাত হওয়া ; তারপর দৈহিক মৃত্যু, তারও পরে বিনুর হাত ধরে নতুনতর উজ্জীবন ও যাত্রা। বুড়ো ঈশ্বর ও শিশু বিনু ; একজন মৃতপ্রায়, অন্যজন নবজাতক। যে ঈশ্বর নিজেই একদা অজ্ঞাতের পথিক হয়েছিল, আত্মহত্যার চেষ্টা ও আত্মিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে-ই যেন পুনর্জাত বিনুর মধ্যে, আবার নতুন পদক্ষেপ। এক যায়, আর আসে, এই যাওয়া-আসার মাধ্যমে, বাধা-প্রতিরোধ পেরিয়ে পেরিয়ে, মৃত্যু-বাহন প্রাণের আশ্চর্য লীলা। সেই লীলা দৃশ্যগোচর, যেমন বুনুয়েল-বেয়ারম্যানে, তেমনি, অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে, 'সুবর্ণরেখা'য়।

আদিম মৃত্যু-পুনর্জন্ম-ভাবনা তথা প্রাণ গতির লক্ষণ আরও কয়েকটি আছে ইতস্ততঃ। যথা : তিন ম্যানেজার, জলে মুকুট ভাসানো, ভাঙ্গা বিমানঘাঁটি, নচিকেতার এবং উপনিষদের 'ক্রতোং স্মর কৃতং স্মর' শ্লোকের ও সূর্যমন্ত্রের উল্লেখ, ভোরের বৃষ্টির ও ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার গান ইত্যাদি। এগুলি মৃত্যু ও নবজন্ম, স্থিতি থেকে গতির অর্থ দ্যোতনা করে। 'নতুন বাড়ি'র বাসনা সবার মনে—কলোনীবাসীদের, হরপ্রসাদের, ঈশ্বরের, অভিরামের, সীতার, বিনুর, বাসা আর ভালবাসার সন্ধান, নীড়ে আশ্রয়লাভ, পুনরায় স্থান-চ্যুতি। নবজীবন হাতছানি দিয়েছে, পরমুহূর্তে পরিস্থিতির টানা-পোড়েনে নতুনতর বাঁকে উড়িয়ে চলা। স্থায়ী বাসা কেউই পায় নি ; 'আঁকা বাঁকা নদী, আর দূরে নীল নীল

পাহাড় ; সেইখানে বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান গায়'—বিনুও পৌঁছবে সেখানে, আবার ভেসে চলে যাবে অজ্ঞাত দিগন্তে। সুবর্ণরেখার তীরে তীরে চলবে নিত্যকালের আসা-যাওয়া, জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্ম। তার কাছে পৌঁছতে হয় 'গাছের তলা' দিয়ে সজীব 'ধানক্ষেত'-এর মধ্যে দিয়ে। কারণ, সুবর্ণরেখা নদী নয়, বলাকা কাব্যের 'চঞ্চলা'র মত প্রবহমান প্রাণের প্রতীক, তাই তার তীরেই নব জীবনের ঘোষণা, এলিয়টের ভাষায় 'ইন মাই এণ্ড ইজ মাই বিগিনিং'. 'দাঁড়ালে কেন ? চলো চলো', 'চরৈবেতি চরৈবেতি'।

লোকায়ত কৃত্য ও কৃষি-প্রজননতত্ত্ব ধ্রুপদী নাটক-মহাকাব্যেরও উৎসভূমি। আদিম উপকথার অভিযোজনা 'সুবর্ণরেখা'কে দিয়েছে লোকায়তি, প্রসার ও গভীরতা। সুদূর অতীতের যোগে বর্তমান পায় নব রূপ, দর্শকচিত্তে আরও স্পষ্ট ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। কারণ এ অভিজ্ঞতা, এ অনুভূতি বহু হাজার বছরেরও হৃদয়ে-হৃদয়ে পরিবাহিত, পরিস্রুত।

চতুর্থ স্তর। মৃত্যু পুনর্জন্ম প্রসঙ্গে আদিম দর্শনচিন্তা আদিম যুগেই শেষ হয়ে যায় নি। ধ্রুপদী ও মধ্যযুগে নতুন নতুন রূপ ও অর্ঘ্যে স্নান করে সে এসে পৌঁছেছে সাম্প্রতিকের ঘাটে। এখন, অবশ্যই অন্যভাবে, বিজ্ঞানও বলছে মৃত্যু-পুনর্জন্মের তথা বিবর্তনের কথা। সাহিত্যে-শিল্পে এই চিন্তার নব নব অভিব্যক্তি। রক্তকরবী বা শিশুতীর্থের মত 'সুবর্ণরেখা'র প্রাণভাবনাও একদিকে যেমন আদিম কৃষিভাবনা, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গে যুক্ত, শুধু গতিবিজ্ঞান নয়, আর একটি শাখার সঙ্গেও।

'চিত্রপট', 'চলচ্চিত্র' ইত্যাদি পত্রিকায় ইতি-উতি মুদ্রিত রচনায় শ্রীঘটকের চিন্তা-ধারার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়, সে-চিন্তা মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর 'কালেক-টিভ আনকনসাস' বা 'সামষ্টিক অসংজ্ঞান' তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অনুগামী। ছবির মধ্যেও ইয়ুংগীয় ভাবনার লক্ষণ স্বতঃবিদ্যমান। যেমন : প্রিমডিয়াল ইমেজ বা পুরাকল্পীয় চিত্রকল্প-রূপে কালীর অবতারণা ; ঈশ্বরের 'সোল-ইমেজ' বা দ্বিতীয় সত্তারূপে হরপ্রসাদের পরি-কল্পনা ; ঈশ্বর (হরি) ও হরের সমন্বয়ে জীবন-মৃত্যুর যামলতার দ্যোতনা ; সামষ্টিক অসংজ্ঞান তত্ত্বের অভিব্যক্তি ও তার পটভূমিকায় 'ইনসেস্ট' বা নিষিদ্ধ কামের নিগূঢ় প্রকাশ।

ফ্রয়েডের কাছে 'লিবিডো' অর্থে যৌনতা যা ব্যক্তিগত ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয়। ইয়ুং-এর কাছে 'লিবিডো' প্রাণশক্তির উৎস যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত এবং মানুষের ধারাবাহিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে তিনি বের্গসঁর গতি-দর্শনের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অসংজ্ঞান দ্বিবিধ : একটি ব্যক্তিগত যেখানে ব্যক্তিক স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভিড় ; অন্যটি সমষ্টিগত। সমষ্টিগত অসংজ্ঞান ব্যক্তি পায় উত্তরাধিকারসূত্রে। আদিম কাল থেকে অভিজ্ঞতা ও অনুভব ও চিন্তা মানুষে মানুষে চলে এসেছে, তারাই বিচিত্র রূপ নিয়ে জড়ো হয় এই 'ইমপার্সোনাল কালেকটিভ

আনকনসাস'-এ, যাকে তিনি বলেছেন 'sediment of all the experiences of the universe of all time', সর্বকালের পার্থিব অভিজ্ঞতার সার। শিশুর অবচেতন থেকে যেমন ফ্যান্টাসী বা কল্পকথার জন্ম হয়, তেমনি ব্যক্তির এই সামাজিক অসংজ্ঞান থেকে জন্ম নেয় আদিম পুরাকল্পীয় ইমেজ (কালী বা উমা বা শিব বা আফ্রোদিতে বা সিসিফাসরূপে)। এই প্রতীকী ইমেজগুলি আদিম উপকথার শৈল্পিক ফসল। সুতরাং আধুনিক ব্যক্তিচিত্তের জীবনধারা ও জীবনভাবনার সঙ্গে আদিম চিন্তা-ভাবনা-চেতনার ও উপকথার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে; তার বহু উপাদান নানা তির্যক রূপে ও রীতিতে আমাদের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। অর্থাৎ আজকের বাস্তবে যেমন আধুনিক উপকরণাদি রয়েছে তেমনি রয়েছে আদিমতার বহুবিধ প্রচ্ছায়া। এইভাবে সেকাল-একালকে যুক্ত করে ইয়ুং রায় দিয়েছেন : 'The life line of an individual is the resultant of the individualistic and collectivistic tendency of the psychological process at any given moment'। শিল্পে-সাহিত্যে কনসাস ও আনকনসাস, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আনকনসাসের এই লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়, তারই নাম 'মাইথোপিয়া' বা 'উপকথাবৃত্তি'। 'সুবর্ণরেখা' এমনই একটি মাইথোপিয়িক বা উপকথাবৃত্তিক শিল্পসৃষ্টি; যেখানে ইয়ুং-এর ভাষায় 'We are again experiencing an ebullition of the unconscious destructive powers of the collective psyche'.

পরিবেশে স্থিত চিত্ত যখন স্বাস্থ্যবান, তখন সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞানে সুস্থ ভারসাম্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আর, যখন পরিস্থিতির অভিঘাতে বা আন্তর কারণে চিত্ত অস্বাভাবিক বিপর্যস্ত, তখনই বাধে উভয়ের দ্বন্দ্ব, যার ফল মানসিক সংঘর্ষ ও বিক্ষিপ্তি, বিচ্ছিন্নতা ও অবদমন; ব্যক্তিচিত্তের অধুনা আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আদিম সামষ্টিকতা প্রকট হয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। সামষ্টিকতা দেয় গোষ্ঠীচেতনা, স্বাতন্ত্র্য দেয় ব্যক্তিত্ব; বিপর্যাসে উভয়ে পরস্পর বিপ্রতীপ। ঈশ্বর চরিত্রে এই বিপ্রতীপের সংঘর্ষ আদ্যন্ত। কলোনীতে সে গোষ্ঠীভাবনায় উদ্বুদ্ধ; কিন্তু ছাতিমপুরে এসে মন বদলে গেল, ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠায় বহু-র থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল; অথচ বহুর প্রয়োজনে সৃষ্ট নীতি-বিধানকে পরিত্যাগ করল না। অভিরাম-সীতার বিবাহে তার বাধাদানের প্রাথমিক কারণ- চাকরির উন্নতি এবং সামাজিকতার আনুগত্য। চাকরির প্রয়োজনে সে সমাজকে ত্যাগ করে, অথচ বিয়ের ব্যাপারে সেই সমাজেরই দোহাই দেয়। ফলে, অচিরেই মানসিক সংঘর্ষ ও সংকটে আক্রান্ত হয়, বিচ্ছিন্ন হয় পরিবেশ ও আপনজনের সান্নিধ্য থেকে। এই অবস্থায় শক্তিমান গৃহপতি সমাজপতিরা দেব-প্রতিম বিধানকর্তা হয়ে ওঠে; অভিরাম-সীতার প্রতি ঈশ্বর ও রামবিলাসের মনোভাবে ও আচরণে তার প্রকাশ। শুধু একের বিচ্ছিন্নতা নয়, নতুন-

পুরাতনের দ্বন্দ্বও এই সংঘর্ষের অন্যতম ফল ; ছাতিমপুরের বাংলোয়, শালবনের ছায়ায়, নদীর স্রোতে তার স্বাক্ষর। আদিম মানবসন্তান কালক্রমে বাসা বেঁধেছে, ঘর বেঁধেছে, শান্ত হয়েছে। তবু আদি স্বাধীন যাযাবরত্বকে কোনদিনই ভুলতে পারে নি ; তাই যুগে যুগে মানুষের মধ্যে স্থাবরতা ও জঙ্গমতার নিত্য দ্বন্দ্ব, নিত্য লীলা। 'সুবর্ণ-রেখা'র মানুষগুলি চেয়েছে বাসা বাঁধতে, স্থাবর হতে, আর কেবলই বাসা বদল করেছে, জঙ্গম হয়েছে, শেষে পা রেখেছে সেই দিগন্তে, যেখানে সুবর্ণরেখার নিরবধি গতি, যেখানে তার তীরে নতুন বাড়ির ইশারা, চলার পাশেই অচলতা।

ফ্রয়েডের আর একটি আবিষ্কার 'নিষিদ্ধ কাম'। সন্তানের মধ্যে মাতৃ-পিতৃ-গমনের নিভৃতচারী বাসনা লক্ষ্য করে তিনি ঈদিপাস ও ইলেকট্রা-কম্‌প্লেক্‌স তত্ত্ব স্থাপনা করেছেন। ইয়ুং এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন ও অর্থবদল করেছেন। তাঁর মতে, এই কমপ্লেক্‌স্‌-এর মূল উৎস 'সহবাস' নয়, অন্যত্র নিহিত, আদিম সৌর-উপকথা তার প্রমাণ। আকাশের দিকে তাকিয়ে আদিম মানুষ কল্পনা ও গল্প সৃষ্টি করেছিল : সমুদ্রমাতার গর্ভে সূর্যের জন্ম, তারপর একক ব্যক্তিত্বে আকাশচারণা, শেষে সমুদ্রমাতার গর্ভে বিলয়, পরদিন আবার নবজন্ম। এই কাহিনীর ইয়ুংগীয় ব্যাখ্যা : এই সৌর উপকথাটি আদিম জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম দর্শন-চিন্তার শিল্পরূপ—মাতৃগর্ভ থেকে জাত পুত্র স্বভাবতঃ মাতৃমুখী, কালক্রমে সে চায় এই আনুগত্য ছিঁড়ে ফেলে স্ব-অধীন ব্যক্তিত্বে উজ্জীবিত হতে। অন্যদিকে অমরতার আকাঙ্ক্ষাও সীমাহীন, অথচ সামনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ; সমস্যার সমাধানার্থে এই মৃত্যুও মা-রূপে কল্পিত ; মৃত্যুর পরেও পুনর্জন্মের সম্ভাবনাকে এইভাবে ফুটিয়ে তোলা হল : 'Struggle of the son away from the mother towards the mother' উদ্দেশ্য : 'to sacrifice infantile hero...to be a child again...to be born again, to be immortal' সুতরাং এ মানসকূট মাতৃগমনাকাঙ্ক্ষা নয়, অমরতালাভের উদ্দেশ্যে আবার শিশু হয়ে যাওয়া, মৃত্যুরূপা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে পুনশ্চ সেই গর্ভজাত নবজন্ম প্রাপ্তি। বলা বাহুল্য, অবদমন ও উদ্বর্তন এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই কাহিনী ও চিন্তার অনুষঙ্গী : একই নারী মা ও স্ত্রী ; মায়ের দ্বৈত রূপ—জন্মদাত্রীরূপে তিনি জগজ্জননী, মৃত্যুর অধীশ্বরীরূপে ভয়ংকরী ; নায়ক চির-পরিব্রাজক, জন্মলগ্নে সে পুনর্জাত সন্তান, যৌবনে ব্রহ্মচারী বা স্বামী, অস্তাচলে পুনরায় সন্তান কিন্তু বৃদ্ধ মৃতপ্রায় ; প্রথমে যৌবনলাভ, পরে অমরতালাভের জন্যে তাকে আত্মবলিদান দিতে হয় নিজ সত্তা বা তার প্রতীককে ; এই 'সমুদ্র-যাত্রা'র পথের বাধাগুলি ভয়ংকরী মাতারূপে পরিকল্পিত, নায়কের হাতে যার মৃত্যুও ঘটে ; সমুদ্র-পাহাড়-নদী, উপত্যকা, গাছ, ধান, মৃত্যু ইত্যাদির অবশ্যম্ভাবী প্রতীকী সমাবেশ। ইয়ুং-এর ধারণা, তাঁর ব্যাখ্যাত এই মাতৃকাম আদিম সমাজমানসে বিদ্যমান ছিল, এবং তারই রূপান্তরিত তির্যক রূপ আধুনিক ব্যক্তিচিত্তে

নাগরিক। এবং যেহেতু সামষ্টিক সত্তা ব্যক্তিত্বের বেদী, এই মানসকূট বর্তমান সমাজ-জীবনে ও মানসে নানা ভাবে ক্রিয়াশীল, দ্বন্দ্বে-অবদমনে-অভিপ্রকাশে জটিল। সেই সক্রিয় জটিলতার চিত্ররূপ 'সুবর্ণরেখা'।

সীতার জীবনে যত বাধা বিপর্যয় আর মৃত্যু, তারই প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে পুরা-কল্পীয় চিত্রকল্পরূপা কালী। সীতার স্বপ্নবিনাশের মূল কারণ ঈশ্বর ; কালী ঈশ্বরেরও প্রতীক (নারী থেকে পুরুষে চিত্রকল্পের রূপান্তরণ ইয়ুং উল্লেখ করেছেন এবং উপনিষদীয় ব্রহ্ম তথা 'ঈশ্বর'-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন), আগামী দিনের সংকেত। সীতার প্রতি ঈশ্বরের অনুরাগ, অভিরামের প্রতি তার ভালবাসায় বাধাদান, বিচ্ছেদে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, এবং শেষে ঘুরে-ফিরে বিশেষ পরিস্থিতিতেও মনোভাব নিয়ে তারই কাছে ফিরে আসা—চিত্রবস্তুর এই সচেতন প্যাটার্ন একটি বক্তব্যকেই পরিস্ফুট করে তোলে : 'ঈদিপাস-কম্‌প্লেক্‌স্‌'। ঈশ্বর ও সীতার সম্বন্ধ আদিম সৌর উপকথা তথা মাতৃকামের প্রতিলিপি (পুনশ্চ উল্লেখ করি : ইয়ুং এই বিশিষ্ট মানসকূটকে 'সহবাস' অর্থে গ্রহণ করেন নি ফ্রয়েডের মত)। আদিম কথায় অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে বোন মায়ের স্থান গ্রহণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রে বোন মেয়ে মায়েরই প্রতিভূ। সীতাকেও বলতে শুনি 'আমি তো তোমার মা-ই' ; অনেক পরে, ঈশ্বর বেণীমাধবকে বলে, 'ভেবেছ আমার বোনেরই এই দুর্দশা, তোমাদের বোন নেই' ; ক্লোজ শট বিন্দু, সে চিৎকার করে বলে, 'মা'—এই সংলাপ যুগলের মধ্যেও একই তথ্য সন্নিবেশিত। বস্তুত, সীতার প্রতি এই বিচিত্র মনোভাবেই ঈশ্বরের চরিত্রে জটিলতা দ্বন্দ্ব ভার-অসমতা (যে কারণে মহাকাব্যিক স্তরে তাকে একই সঙ্গে বিপরীতধর্মী দশরথ রাবণরূপে বর্ণনা করেছি। দশরথরূপে সে প্রথমে সীতার কল্যাণকামী আশ্রয়, পরে দুজনকে পাঠায় নির্বাসনে, রাবণরূপে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে গোপন অব-চেতনে)। অভিরাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সীতার প্রেমে আপত্তির এইটেই মুখ্য কারণ ; বাইরের যুক্তিগুলি অবচেতনে অবদমিত বাসনার বহিরঙ্গ তির্যক অভিব্যক্তি। তাই সে আজীবন কুমার, হরপ্রসাদের ভাষায় 'জীবনটাতো ব্রহ্মচর্য কইরা কাটাইলা' ; তাই সে সীতার প্রেমের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, বলে, 'অন্য কিছু হওয়ার আগে আমি তোর মৃত্যু কামনা করি' ; তার বিচ্ছেদে অস্থির অসহায়তায় 'আত্মহত্যা করতে যায়'। তার মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ তার নিজের মধ্যে, এবং তার দ্বিতীয় সত্তা ('Soul-image') হরপ্রসাদের মধ্যেও, যেখানে 'projection of soul-image' যার কাজ নিরুদ্ধ আবেগের মুক্তিদান। হরপ্রসাদের ভোগলোলুপ আকাঙ্ক্ষার তত্ত্ব ঈশ্বরেরই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্ষেপণ। তাই যখন সে বলে, 'নচিকেতাকে যমরাজ বলেছিলেন, আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে যেও না, অন্য বর প্রার্থনা কর। এই যে অপ্‌সরাগণ—' এ উক্তি আসলে ঈশ্বরেরই। সীতার সঙ্গে তার নিজের মানস-সম্পর্ককে (এই প্রেক্ষিতে অভিরাম

সীতার সম্পর্কও স্মরণীয়) সে বুঝতে চেষ্টা করেছে রুদ্ধ স্তব্ধতার মধ্যে—কেন এই যন্ত্রণা, এই অসহ্যতা। ভোগের মধ্যে দিয়ে এই নিষিদ্ধ অবচেতন অবদমিত কামনা থেকে সে মুক্তি পেতে চাইল, ভুলতে চাইল কন্যাসমা-মাতৃরূপা বোনকে। কিন্তু 'away from the mother towards the mother', পালাতে গিয়ে সেই সীতার কাছে অবশেষে। পরে হরপ্রসাদ এক জায়গায় বলেছে বেণীমাধবকে ; 'ঈশ্বর এটা realise করেছে। তাই বলেছে আর কি। মাতা দ্বার খোল' ; বস্তির মুখে দাঁড়িয়ে কাজলাদিও বলেছে : 'ঐ ঘরে নিয়ে যাব'। তারপর সাক্ষাৎ, নিজেরই অবচেতন কামনার মুখোমুখি। সীতার একটি চোখ তাকিয়ে থাকে—দুবার ; যে সীতা 'সীতা-মা', স্নেহময়ী মাতা, তার চোখে আজ ভয়ংকরী গগনের অপলক দৃষ্টি, আর তার সামনে ঈশ্বরের দৃষ্টি 'অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এবং স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে'। (সীতা কি দাদার মন জানতে পেরেছিল ? তাই কি বলেছিল, 'দাদার কাছে বলার আগে আমি বিনুকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করবো। আত্মহত্যা করবো —সবচেয়ে খারাপ কাজ করবো'—?)। তারপর 'লং শট-এ সীতা। সে বঁটিদাওটা হাতে নেয়, এবং সরে যায়। কি যেন একটা কাটার শব্দ ভেসে আসে। মিড শট-এ ঈশ্বর। তার পাঞ্জাবীতে রক্তের ছিটে'—এ তো সীতার আত্মহত্যা নয়, একদা যে মৃত্যুকামনা করেছিল ; ঈশ্বরের হাতেই তার মৃত্যু ঘটল যেন। তাই 'সে বঁটিদাওটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে।...নেপথ্য থেকে ভেসে আসে : 'হায় রাম !' আদিম উপকথার মিত্রর মত ঈশ্বরও আত্মদান করল ; 'ক্লোজ শট ঈশ্বর। সে মাটিতে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ক্লোজ শট বিনু, সে তার দিকে তাকিয়ে আছে' মৃতপ্রায় সূর্য ও নবজাতক সূর্য। কাট্‌ মাধ্যমে লংশট-মিড-শট-ক্লোজশট-এর প্রয়োগ শুধু দৃশ্যগত নয়, দর্শনগত কারণেও। আত্মহত্যার বাসনা এই-ভাবে পরিণত হল আত্মদানে, তা থেকে উপনীত আত্মজ্ঞানে (বেণীমাধবকে ঈশ্বর ও হর-প্রসাদের পূর্ব-উদ্ধৃত উক্তিদুটো এর পরে সংযোজিত হয়েছে)। ছাতিমপুর থেকে বার হয়ে বস্তিঘরে ; ব্রহ্মচর্য থেকে ভোগের পথে ত্যাগ ; নিশ্ছিদ্র একাকিত্বের বদ্ধতা থেকে আলোর রাজ্যে, আলো থেকে গভীর অন্ধকারে মৃত্যুর গর্ভগৃহে। সেখান থেকে আবার ছাতিমপুরে, আলোর জগতে মাতৃগর্ভে নবজাতক হয়ে। সূর্য পুনর্জাত রাওলে, ঈশ্বর পুনর্জাত বিনুতে, আবার বিশ্ব পরিক্রমা। গাছতলা দিয়ে, দুলন্ত ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে, পাহাড়ী উপত্যকার মাঝ দিয়ে, সুবর্ণরেখার তীর ধরে নতুন বাড়ির উদ্দেশে অভিযাত্রা। ঈশ্বর ও বিনু : প্রবীণ ও নবীন, মৃত সূর্য ও শিশু সূর্য ; নিয়ানডার্থাল মানুষ ও বিংশ শতকের মানুষ, আদিম ও আধুনিক। সেই এক প্রাণপ্রবাহ বয়ে চলেছে অনিবার, তারই লীলা পুনরাবৃত্ত বারে বারে : 'a repeating expression of living process', তার অভিভাব আজকের ব্যক্তিচিত্তে জমা হচ্ছে, কালেকটিভ আনকনসাস, সমকালীন জীবনে ও মানসে তারই বিচিত্র অভিব্যক্তি। সুবর্ণরেখা নদী নয়, অদৃশ্য প্রাণপ্রবাহ ; 'সুবর্ণরেখা' ছবিমাত্র নয়, সেই অনিবার

প্রাণপ্রবাহ ও নিগূঢ় কালেকটিভ আনকনসাসের গতিশীল দৃশ্যমালা; সমাজবাস্তবতা, মহাকাব্যিকতা, উপকথাবৃত্তি এরই অনিবার্য ও বহুমুখী উপকরণ-সমষ্টি। 'সুবর্ণরেখা' ভাঙা বাংলার আধুনিক উপকথা বা 'সাগা'. টাইটেলে তার পুঁথির ব্যবহার, এবং তার থীম-মিউজিক বা ধ্রুবসংগীত 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা' এবং কাল-বিভাজক সহলিপি। ইয়ুংগীয় সমাজভাবনা এর কেন্দ্রবিন্দু, আর সমস্ত তার প্রসারিত ঘনিষ্ঠ রেখা-উপরেখা।

প্রকাশ ও প্রয়োগবিজ্ঞানের দিক থেকে 'সুবর্ণরেখা'র আঙ্গিক-পর্যালোচনা করলাম না। গল্প, প্লট, তাদের ভাষ্য ও ভাবরূপের মধ্যে দুর্বলতা-ত্রুটি কিছু কিছু আছে; সেসবের বিচারও করলাম না। যেহেতু এ প্রবন্ধের একাগ্র লক্ষ্য: 'সুবর্ণরেখা'য় স্তরবিন্যস্ত কনটেণ্ট-এর নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রাস্তিক পরিচয় দান।

ইয়ুংগীয় সমাজভাবনা এবং তার অনুষঙ্গী সমাজবাস্তবতা, মহাকাব্যিকতা ও উপকথা-বৃত্তি—সমস্তের মিলনে 'সুবর্ণরেখা' যে বস্তুসত্যকে প্রকাশ করছে, তা হল, ইয়ুংএরই ভাষায়:

'There is an identity of elementary human conflicts existing independent of time and place' এবং 'Through buried strata of the individual soul we come indirectly into possession of the living mind of the ancient culture, and just precisely through that, we do win that stable point of view outside our own culture, from which, for the first time, an objective understanding of their mechanisms would be possible.'

ভারতীয় চলচ্চিত্রে কন্টেণ্ট-এর এমন রাজসিক মহিমার মুখোমুখি এর আগে আমরা হয়েছি কি?

পৃথিবীরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি: পথের পাঁচালী

পঙ্কজ দত্ত

'হয়তো', 'কিন্তু', 'যদি', 'বোধ হয়' জুড়ে সঙ্কোচ বোধ করে বলা নয়, নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করে একথা আজ পৃথিবীকে বলবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে যে, আমাদের দেশ পরিমাণেই শুধু নয়, গুণের দিক থেকেও এমন ছবি তৈরি করতে পারে, যা পৃথিবীর সমগ্র চিত্রশিল্পের ইতিহাসেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। একথা আজ

সদর্পে বলতে পারা যাচ্ছে, 'পথের পাঁচালী' ছবিখানি দেখবার পর। বিভূতি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি এই 'পথের পাঁচালী', কিন্তু সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্য রচনার বাহাদুরিতে এবং পরিচালন সৌকর্যে এমন একটা মৌলিক জিনিস সামনে এনে হাজির করে দিয়েছেন, যা অন্তত এদেশে চলচ্চিত্রের আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রদর্শিত দিশী বিদেশী এমন কোন ছবির কথা মনে করা যায় না, যাকে এর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে গণ্য করা যায়। ছবিখানি দেখার পর এবিষয়ে কারুর যদি সংশয় থাকে তো বুঝতে হবে তার মনে নিজের দেশের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্রীড়াবনত সঙ্কোচ আছে, নয়তো সে ব্যক্তি চরম উন্নাসিক আর নয়তো স্রেফ হিংসুটে। দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দিশী বিদেশী মিলিয়ে হাজার হাজার ছবি দেখে কোনক্ষেত্রেই এমন পুলকিত হওয়া যায়নি। এবং আর কোন ছবিকে এমনভাবে বিশেষণে বিশেষণে মুড়ে অলঙ্কৃত করে তোলার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেনি। এখন সত্যিই সারা পৃথিবীর টিকি নেড়ে একথা বলতে পারার আজ সুযোগ এসেছে যে, ভারতীয় ছবি সর্বাঙ্গীণ সৌকর্যে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবার মতো যোগ্যতার পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এবং বিস্মিত হতবাক হতে হয় ছবিখানি কিভাবে তোলা হয়েছে সেকথা ভাবতে গেলে।

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে আগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র 'দি রীভার' ছবিখানিতে একজন সহযোগীর কাজ মাত্র করেছেন ; আর শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তেরও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংস্রব বেশী নয়। এই তিন জন আর তাদের সঙ্গে অন্যদেশ হতে বাতিল হয়ে যায় এমনি সরঞ্জাম, তাও নেহাৎই অপ্রচুর। কিন্তু তাই নিয়েই এরা ঐন্দ্রজালিকের মতো যা সৃষ্টি করেছেন, তা পৃথিবীর সেরা সব সরঞ্জাম নিয়েও হয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শিল্প ও নাট্যসঙ্গত ভালোটুকু ভেবে ভেবে খুঁজে খুঁজে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যে গেঁথে গেঁথে ক্যামেরায় তোলার যে আদর্শ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনী ছবিখানি নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেইটেই একটা ইতিহাস। দেখা গেল, দরদী শিল্পী ও চিন্তাশীল মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে ভোঁতা যন্ত্রপাতিসরঞ্জাম নিয়েও কি অনিন্দ্য গরিমাই না ফুটিয়ে তুলতে পারে। ছবিখানির সংগঠনকারীদের নেতা হিসেবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিত্র নির্মাণের সমস্ত বিভাগগুলিতেও প্রাণের যে সাড়া এনে দিয়েছেন, তা সবকিছুকে নতুনের দৃষ্টিতে চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রত্যেকটি বিভাগই যার যা ভূমিকাকে ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে অথচ সবায়ের সঙ্গে সবায়ের সমন্বয়ের রাখি বেঁধে বিকশিত হয়ে ওঠার এমন দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায়নি। সবায়ের কাজ আলাদা আলাদা, কিন্তু সবাইকে মিলিয়ে একটা পরম রূপময় সম্পূর্ণতা গড়ে উঠেছে। ভূপেন্দ্র ঘোষ বা সত্যেন চট্টো-পাধ্যায় আগে অনেক ছবিতেই শব্দ গ্রহণ বা শব্দ যোজনার কাজ করেছেন, কিন্তু

'পথের পাঁচালী'তে পরিচালক তাদের কাজ এমনভাবে সাজিয়ে খেলিয়ে নিয়েছেন, যাতে তাদের কাজের চমৎকারিত্ব নতুন করে অঞ্জনায়িত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতকেও তো ছবিতে কতোরকমভাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু এ ছবির সঙ্গীত সংযোজনায় রবীন্দ্রশঙ্করের মতো প্রতিভার মৌলিকত্ব যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি কাহিনীর প্রয়োজন মেটাতেও সেই সঙ্গীতকে কিভাবে প্রয়োগ করলে তা ছবিরও একটা বিশেষ মর্যাদার অঙ্গ হয়ে ওঠে সেবিষয়েও পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথ করে দিয়েছেন। পরিচালন প্রতিভা দেখিয়ে দিল যে, কলাকৌশলের প্রতিটি দিকেরই এক একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে প্রত্যেককে জড়িয়ে সমগ্রতাকেও এমন একটা অপূর্বতায় পরিস্ফুট করে তোলা যায়, যা দেখতে দেখতে প্রতিনিয়তই বলে উঠতে ইচ্ছে করবে 'চমৎকার', 'চমৎকার'!

'পথের পাঁচালী'র মৌলিকত্ব এমনি চমকপ্রদ যে ছবিখানি মানুষের আবেগের কোঠায় কি পরিমাণ ঠাঁই করে নিতে পারবে, সে বিষয়ে ব্যবসাদারী মনে দস্তুরমতো সংশয়ের উদ্রেক হয়। নাচগান নেই এবং চুটকি রঙ্গ-তামাসা নেই বলে বাজারের কোন পরিবেশক ছবিখানি তোলা শেষ করতে টাকা আগাম দিতে এগিয়ে আসেননি। তার ওপর সংগঠনকারী ও শিল্পীরা প্রায় সকলেই নতুন লোক, পুরনো দু একজন যাঁরা আছেন, তাঁদের টান নেই। কিন্তু তবুও পরিচালক সত্যজিৎ রায় টাকা পাবার জন্য তাঁর শিল্পনিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিতে রাজি হননি। এইখানেই আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তার কথা। কোনদিন ভারতের কোন রাজ্য যা করেনি, ডাঃ রায় প্রথম চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। এ সাহায্য না পেলে চিত্র জগত অবশ্যই একটা মহান সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতো। পরিচালক সত্যজিৎ রায় রাজ্যের এই সাহায্যের মান তো রক্ষা করেছেনই, এমন কি একথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সবায়ের যে অগ্রণী সে মর্যাদাও পাইয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি অংশে মৌলিকত্ব প্রতিভাত করিয়ে দেওয়ার জন্ত ভেবেচিন্তে কাজ করার ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। মনকে মুগ্ধ করে তুলতে খুচখাচ কতো রকমের কাজ যার বর্ণনা দিয়ে শেষ করে ওঠা যায় না। কাহিনীর মানবিক আবেদনটাও এমন সহজ ও সরলভাবে এনে হাজির করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষ মাত্রেরই মনকে আবেগে আপ্লুত করে তুলবে। আগাগোড়া ছবিখানির কোথাও একটু অবাঞ্ছিত অংশ নেই, একটু কিছু বাজে নেই, যা মনের তারকে বাজাতে অক্ষম ; একটাও মুহূর্ত নেই যা চমক লাগিয়ে যায় না। এমন সবটুকুই তারিফের ছবি একটা প্রপঞ্চ বিশেষ বলে মনে হবে।

সুবৃহৎ উপন্তাস 'পথের পাঁচালী'কে একখানি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ছবির পরিসরে এনে

দেওয়া কঠিন এবং দুঃসাহসিক কাজ। তাছাড়া 'পথের পাঁচালী' হচ্ছে প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের বর্ণনাময় উপন্যাস। নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভাবৈচিত্র্যই উপন্যাসখানির মূল উপাদান। বলা বাহুল্য, বিরাট উপন্যাসখানির সবটুকু ছবিতে এনে দেওয়া সম্ভব নয়, আর সত্যজিৎ রায় তা করতেও চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাই বলে চিত্রনাট্যটি মূল গ্রন্থ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি, এইটেই সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ কৃতিত্বের একটি। বিরাট গ্রন্থখানি থেকে ছেঁকে ঠিক ভাব আর রসটুকু যথাযথভাবে এমন পরিবেশিত হয়েছে যা দেখবার পর কোন আক্ষেপ করার ছুতো পাওয়া যায় না। তাছাড়া ছবি-খানিকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক সৃষ্টি বলেই স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। কারণ গ্রন্থটির অবলম্বন হলেও চিত্ররূপায়ণে এতো মৌলিক সৃজনী প্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, যা এর মধ্যে একটা নিজস্বতার দাবী মূর্ত করে তুলেছে। আখ্যানভাগ বলতে কতোটুকুই বা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর। গল্প যখন আরম্ভ তখন তার সংসারে স্ত্রী সর্বজয়া, কন্যা দুর্গা আর বৃদ্ধা ভগিনী ইন্দির ঠাকরুণ। দুষ্টু মেয়ে দুর্গা পাশের বাগান থেকে ফল কুড়িয়ে আনে বলে সর্বজয়াকে কথা শুনতে হয়। সর্বজয়ার রাগ গিয়ে পড়ে ইন্দির ঠাকরুণের ওপর, কারণ দুর্গার টান তার ওপরেই বেশী। তাছাড়া হরিহরের চাকরি নেই বলে অনটনের মধ্যে সংসার চালিয়ে চালিয়েও সর্বজয়ার মেজাজ খিটখিটে। ইন্দির ঠাক-রুণের রাগ হলে ছেঁড়া কাঁথা মাদুর আর পার্থিব সম্বল পিতলের ঘটিটা হাতে নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অবসর সময়ে হরিহর যাত্রার পালা লেখে, তার আশা একদিন তার লেখা পালা অভিনয় হয়ে হৈহৈ পড়ে যাবে, তখন আর দুঃখ থাকবে না। এই আবহাওয়ায় জন্মালো অপু—স্বপ্নভরা সন্ধিৎসু দুটি চোখ সার। হরিহর একটা চাকরি পেলে। ইন্দির ঠাকরুণ আবার ফিরে এলো। দিন যেতে লাগলো। অপু বড়ো হতে থাকে; দিদির সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কিন্তু পাশের বাড়ির মেজ কাকিমা ওদের গরীব বলে দেখতে পারে না। ইন্দির ঠাকরুণের কাছে ভাই-বোনদুটি রূপকথার গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। অপু পাঠশালায় ভর্তি হয়। একদিন দিদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কাশবন পার হয়ে রেলগাড়ী দেখে আসে; নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা চমক এলো ওদের জীবনে। অনেকদিন মাইনে বাকি পড়ায় সংসার আবার অচল। কাজের খোঁজে হরিহর গেল বিষ্ণুপুরে। তারপর চার মাস তার কোন পাত্তা নেই। ইন্দির ঠাকরুণ মাঝে চলে গিয়েছিল, আবার এক দুপুরে ফিরে এলো। সর্বজয়ার মেজাজ আজ-কাল আরও তিরিক্ষি। ইন্দির ঠাকরুণ ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কোনরকমে দাওয়ায় বসে একটু জল খেতে চাইলে। সর্বজয়া খেতে বসেছিল, ননদকে বললে নিজেই গড়িয়ে নিতে। ইন্দির ঠাকরুণ এলো জল গড়াতে, সর্বজয়ার খাওয়ার দিকে দেখলে। গড়ানো জল আর খাওয়া হলো না; ইন্দির ঠাকরুণ আবার বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে নিজের পুঁজিপাটা

নিয়ে। খেলা সাঙ্গ করে ফিরবার পথে দুর্গা আর অপু দেখলে পিসিমা হাঁটুতে মাথা গুঁজে বাড়ির সামনের গাছতলাটায় বসে। ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত ছুঁতেই ধুপ করে পিসিমার দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ইন্দির ঠাকরুণের দেহে প্রাণ নেই। দুর্গা আর অপু ভয় পেলো। দেখতে দেখতে বর্ষা এলো সঘন হয়ে। ভাইবোন দুটিতে আনন্দে মাতামাতি করলে বর্ষার জলে। বাড়িতে ফিরে দুর্গার জ্বর ; প্রতিবেশিনী সর্বজয়ার এক সহৃদয়া জা ডাক্তার দেখালে ; নিউমোনিয়া। দারুণ ঝড়-জলের এক রাত্রে দুর্গা মারা গেল। কিছুদিন পর হরিহর ফিরলো টাকা যোগাড় করে। দুর্গার জন্য আনা শাড়িখানা সর্বজয়ার হাতে দিতেই এতোদিনের রুদ্ধ আবেগে সর্বজয়া কান্নায় ভেঙে পড়লো। এরপর হরিহর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বারাণসী যাত্রা করলে।

চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা বলতে কিছুই নেই। এতে আছে বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে এমন সমস্ত পরিবেশ গড়ে তোলা, যা আবেগকে উচ্ছ্বলিত করে যায়। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক একটা নাট্য-পরিণতি। এর মধ্যে যা সব প্রযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে অবাস্তবতাও নেই, অসত্যও নেই। দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে জীবনপথ অতিক্রম করে যাওয়ার এ এক অপরূপ ইতিবৃত্ত। গল্প হচ্ছে দুর্গা আর অপুকে নিয়ে। নিকষ দারিদ্র্যের মাঝে জন্ম তাদের। বলতে গেলে মানুষ ওরা প্রকৃতির কোলে ; স্বস্তির আলয় বৃদ্ধা পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণ। তার মধ্যে থেকেই ওরা দেখে গরীব বলে পাশের বাড়ির মেজকাকিমার ওদের ওপরে কি নিদারুণ ঘৃণা। কাকিমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু ওদেরই মতো এবং ওদের সঙ্গে মিশতে খেলতে চায় ; কিন্তু মার শাসনে দূরে সরে থাকে। এটাও ওরা দেখলে, না খেতে পেয়ে উপবাসে দিন কাটাচ্ছে, পাশের বাড়ির সহৃদয়া আর এক কাকিমাই শুধু তার খোঁজ নিতে আসে, কিন্তু আর কেউ ওধার দিয়েও মাড়ায় না, অথচ দিদি মারা যাবার পর ওরা যখন বারাণসী যাত্রা সাব্যস্ত করলে, তখন ভিটে ছেড়ে না যাবার জন্য পড়শীদের কতো উপদেশ। গ্রামের সেই পণ্ডিতমশাই—হাতে বেত নিয়ে ছাত্র পড়াচ্ছে, আবার মুদিখানাও চালাচ্ছে। তারই ফাঁকে চক্রবর্তী এসে মাথায় এক খাবলা তেল ঘষে বিনিময়ে চলে যাবার সময় পণ্ডিতের বারোয়ারির চাঁদা মকুবের আশ্বাস দিয়ে যায়। নিজের সন্তানদের পালন করার আকুলতায় সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা ননদের ওপরে সর্বজয়ার হৃদয়হীনতা মানুষের মনের আর একটা দিক উদ্ঘাটন করে দেয়। সইয়ের বিয়ের সাজ দেখতে দেখতে দুর্গার চোখের কোণে একটি ফোঁটা জল পল্লীবালার আশা ও স্বপ্নের কি আভাসই না ফুটিয়ে তোলে ! ছোটখাটো হলেও আঁতের জিনিসে ভরা সব ঘটনাবলী ; মনের ওপরে আঁচড় কাটে না, এমন কিছুই নেই কোথাও।

টুকরো টুকরোভাবে অনেক কিছুই লক্ষ্য করার রয়েছে বিন্যাসের মধ্যে। তেঁতুল চুরি করে চুপি চুপি অপুকে ডেকে তেল আনিয়ে আচার মেখে নিজের মুখে দেওয়া, আবার

কখনও অপুর গালে দেওয়া—এমনভাবে দৃশ্যটি বিন্যস্ত যে, দেখতে দেখতে দর্শক মাত্রেরই মুখ জলে ভরে ওঠে। এমনিধারা সব অতিসাধারণ, অনাড়ম্বর এবং স্বাভাবিক ঘটনা, যা দেখতে দেখতে দর্শকমাত্রেরই স্মৃতি ও অনুভূতি স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। দুর্গা আর অপুর কাশ-বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের থাম দেখে থমকে যাওয়া আর থামের গায়ে কান দিয়ে অবাক হয়ে গমগমানি শব্দ শোনা এবং তারপরই ট্রেনের হুইসল শুনে ছুটে ছুটে দেখতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণও ওদের সঙ্গে একানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। গ্রামের সেই মিঠাইওয়ালাকে দেখে তার পিছু অনুসরণ আর ঘুঙুরবাঁধা বাঁকের তালে তালে হাঁড়ির দোলনের সঙ্গে ছোটদের তাল রেখে চলা; ওদের চড়ুইভাতি করতে বসে নুন আনতে ভুল হওয়া নিয়ে ঝগড়া করে সব পণ্ড হওয়া ইত্যাদি সব সরল ঘটনা মনের ওপরে ভারি প্রশান্তি এনে দেয়। আর একদিকে রয়েছে ও বাড়ির মেজবৌয়ের মেয়ের বিয়ের ব্যাণ্ডবাদ্যি নিয়ে কেমন সমারোহ; আবার তার আগে রয়েছে অপুর জন্মাবার সময়কার থমথমে দৃশ্য। ইন্দির ঠাকরুণের বারবার রেগে চলে যাওয়া আবার ফিরে ফিরে আসা কেমন একটা করুণামেশা অনুভূতি এনে দেয়। তারপর ইন্দির ঠাকরুণের হাঁটুতে মাথা গুঁজে মরে পড়ে থাকা এবং দুর্গার ছোঁয়ায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ায় মনটা বড়ো উদ্বেল হয়ে ওঠে। এমন মৃত্যু-দৃশ্য ছবিতে কখনো দেখা যায়নি। আর এটা বড়ো বেশী মনে বাজে, অতি শান্ত-নিরীহ বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ বলে; সন্ধ্যেবেলা ভাইপো-ভাইঝিকে রূপকথা শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে গাইতে থাকে— "হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো।"—ওর নিজেকে পার করার জন্য হরির কাছে আবেদনের কথা স্মরণ করে। আপনা থেকেই মনটা ভারি হয়ে ওঠে। সর্বক্ষেত্রেই অনুভব হতে থাকে সরল অপুর কৌতূহলী চোখ দুটির অস্তিত্ব—যাত্রাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ দৃশ্য দেখতে যেমন, তেমনি পিসিমাব মৃত্যু দেখার সময়েও, সর্বত্র সবখানে। দুর্গার মৃত্যুর পর বারাণসী যাবার সময় অপু তার পুঁজিপাটা বাঁধতে গিয়ে তাকের মাথায় দিদির আচার খাবার ভাঙা নারকোল মালায় পুঁতির হার আবিষ্কার করে তার বিমর্ষ হয়ে সে হার পুকুরের গর্ভে নিক্ষেপ করা—সে এক অপূর্ব নাটকীয় স্পর্শ। এই পুঁতির হারটাই ছিল পাশের বাড়ির মেয়ের এবং চুরির দোষ এসে পড়ে দুর্গার ওপর। দুর্গা অস্বীকার করে কিন্তু তবুও মা র কাছ থেকে বেদম প্রহার খায়। সেই স্মৃতি জড়ানো এই হার। অতুলনীয় এর বর্ষার দৃশ্য। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল; ঝড় উঠলো—অপু আর দুর্গা ছুটেছে ছুটেছে। বর্ষার আভাসে ব্যাঙের দল সাঁতরাচ্ছে জলে। ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলো এক টাক মাথা; টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো টাকের ওপরে। পদ্মপাতার ওপরে টুপটাপ জল পড়তে লাগলো, দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে পড়লো। সেই প্রচণ্ড ঝর ঝর ধারায় দুর্গার চুল এলো করে ভেজার সে কি অপূর্ব দৃশ্য! তারপর দুর্গার মৃত্যু-রাত্রের ঝড়-বাদল। জানলায়

চটটা উড়ে খুলে পড়তে চায়, ওদিকে দরজায় আগলও ঝড়ের দাপটে ভাঙে ভাঙে। একা সর্বজয়া রুগণা মেয়ে কোলে পাশে শুয়ে অপু। প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপাদাপি, তার মাঝে সর্বজয়ার মুখে আশঙ্কার সঙ্গে জীবনরক্ষার দুর্জয় প্রচেষ্টা একটা দারুণ নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলে। আশঙ্কায়, উদ্গ্রীবতায় দর্শকমন এমন থমথমে হয়ে যায় যে, তেমন অনুভূতি আজও পাওয়া যায়নি কখনো। পরদিন সকালে জল-কাদা, উড়োচালা, মরা ব্যাঙ উঠোনের দৃশ্যকরুণতাকে জমিয়ে তোলে আরো। তারপর চূড়ান্ত নাট্যপরিণতি ঘটে হরিহর দীর্ঘকাল পর ফিরে এসে সর্বজয়ার হাতে দুর্গার শাড়িখানা তুলে দিতেই। সর্বজয়ার হাহাকারে কোন দর্শকের পক্ষেই আর আবেগধারা রোধ করে রাখা সম্ভব হয় না।

পরিবেশ সৃষ্টিতে এমন সব উপাদান এমনভাবে সাজানো, যার মধ্যে একটা চমৎকার সর্বজনীন আবেদন গড়ে উঠেছে। যে আবেদনটা ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দিশী-বিদেশী, পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন শ্রেণীর যে কোন মনের ওপরে ছোঁয়া দেবেই। বিন্যাসের ধারাটাকে নিও-রিয়ালিজম বলে আখ্যাত করা যায়—যুদ্ধোত্তরকালে ইতালীর দে সিকা প্রমুখ মনীষীবৃন্দের প্রচেষ্টায় যে ধারার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাদের অনেক পিছনে ফেলে এমন উঁচু ধাপে গিয়ে পৌঁচেছেন, যার ধারে-কাছে কিছু আছে বলে জানা নেই। নির্মম ও স্বাভাবিক বাস্তবকে কাব্যের ললিত ছন্দে, শিল্পের সুকুমার ভঙ্গীতে এবং নাটকের আবেগময় গতিতে এমন একটি সৃষ্টি এই 'পথের পাঁচালী' যা চলচ্চিত্রের মাহাত্ম্যকে নতুন করে উপলব্ধি করিয়ে দেয়। সবদিকেই চমৎকার সামঞ্জস্য। যেটি যেমন চরিত্র, চেহারাগুলিও ঠিক সেই মতোই খাপ খাওয়ানো। সুবীর দাশগুপ্তের অপু কিংবা উমা দাশগুপ্তার দুর্গাকে দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, অপু বা দুর্গার চেহারা আর কোন রকম হতে পারে, কিংবা ওদের অভিনয়ে যেভাবের চলাফেরা ভাব-ভঙ্গী অভিব্যক্ত হয়েছে তা আর কোন রকম হতে পারে। ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রে চুনী-বালা দেবী তো একটি পরম বিস্ময়। প্রায় নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধা; লোলচর্মে চোখ মুখ নাক একাকার, কিন্তু কি হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তিই না তার মধ্যে থেকেই ফুটে বেরিয়েছে। পৃথিবীর এই বয়স্কতমা অভিনয়শিল্পীর এই কৃতিত্ব সমগ্র জগতেরই অভিনয়ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় কীর্তি। তাই ওর অমনভাবে মৃত্যুটা মনকে বড়োই আকুলি-বিকুলি করে তোলে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিহর আশা ও স্বপ্নভরা যাত্রার পালা লিখিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চরিত্রের মতো দেখতেও হয়েছে ফুটেও উঠেছে তেমনি ভাবেই, আর কোন চেহারাই যেন ও চরিত্রে মানায় না। তেমনি ফুটেছে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজয়া। স্ত্রীরূপে জীবনের কোন সাধই পূরণ করতে পারলে না, কিন্তু তার জন্যে কোন নালিশ নেই। আর মাতৃরূপেও সন্তানসন্ততিকে পেট পুরে খেতে দিতেও পারে না কিন্তু তাদের বাঁচাবার জন্য কি দুর্জয় চেষ্টা। তার মধ্যেও বাঁচিয়ে চলেছে পরিবারের মর্যাদা—চুপি-

চুপি ভোরে উঠে থালাবাসন বন্ধক দিয়ে চাল এনেছে তবু মুখ ফুটে চরম অভাবের কথা পরম হিতৈষী প্রতিবেশীর কাছেও বলতে যায়নি। ভারতীয় নারীদের এই যে বৈশিষ্ট্য, বুক ফাটলেও মুখ না ফোটার, তা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শেষে দুর্গার জন্য শাড়ি নিয়ে দীর্ঘদিন পর হরিহর উপস্থিত হতে দুর্গার শোকে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো এমন উদাত্ত-আবেগ নিদারুণ করুণ দৃশ্য কমই দেখা গিয়েছে। ছোট ছোট চরিত্রগুলিরও প্রত্যেকটি ঠিক যেমন হওয়া দরকার ছিল তেমনিই হয়েছে। মুদিখানা চালাতে চালাতে গদিতে বসেই পাঠশালার পণ্ডিতী করার অংশে তুলসী চক্রবর্তীকে যেন নতুনভাবে দেখা গেল। বাঁকে হাঁড়ি ঝোলানো মিঠাইওয়ালার ছোট ছোট খরিদ্দার আকর্ষণের শৃগাল-দৃষ্টি ; আর তার ঝুমঝুম করে তালে তালে দুলে দুলে চলা মন থেকে মুছে যাবার নয়। যতোটুকুই চরিত্র হোক প্রত্যেকটিই এমন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে, মনে হয় এমনটি না হলেই যেন বেমানান হতো।

ছবিখানির বিন্যাসে অবলম্বিত নিও-রিয়ালিজম্ ধারায় একটা অতিরিক্ত লালিত্য যুক্ত হয়েছে সুব্রত মিত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ কৃতিত্বে। ক্যামেরায় এই তাঁর প্রথম হাত, কিন্তু এই হাতেখড়িতেই তিনি শ্রেষ্ঠ ক্যামেরার কাজের সমতুল যোগ্যতা দেখিয়েছেন। নির্বাক প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটা নাটকীয় ভাবমুখরতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কলকাতার অল্প দূরে বোড়াল গ্রামে ছবিখানি তোলা। এতে স্টুডিওর কৃত্রিম আলোতে তোলার অংশ খুবই সামান্য ; সবই প্রায় বহির্দৃশ্যে গ্রামের প্রাকৃতিক আলোয় তোলা। তাই প্রতিটি অঙ্গে প্রাণের অমন সাড়া। বাঁশ বনে দুর্গা ও অপুর ছুটোছুটি খেলা ; কাশের ঘন বনে হাওয়ার ঢেউ ; পুকুরের পাড় দিয়ে মিঠাইওয়ালার যাওয়া ; বৃষ্টির আগে জলের ওপরে ব্যাঙের খেলা ; কলমিডাঁটায় ফড়িঙ ওড়া ; মৃত ইন্দির ঠাকরুণের ঘটিটা গড়িয়ে পুকুরে গিয়ে পড়া ; মড়ার ওপরে একটা মাছি এসে বসা ; বর্ষায় ভিজে কুকুরের গা ঝাড়ানি ; মেঠো পথে শবযাত্রা ; পদ্মপাতায় বৃষ্টির ধারা, তারপর সেই আসল বৃষ্টি প্রভৃতি ; ছবিখানিব প্রতিটি ইঞ্চির মধ্যে আলোকচিত্রের সৌকর্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যগুলির রচনাও প্রত্যেকটিই চমৎকার অভিনবত্বে ভরা। বেশ একটা মৌলিকতা অনুভব করা যায়। 'টেকনিক' বলতে দুর্গার ভেজার সময় বর্ষার দৃশ্য এবং দুর্গার মৃত্যুর আগের রাতের দুর্যোগ অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। ক্যামেরার মতো শব্দকেও একটা ভূমিকায় চমৎকারভাবে খেলানো হয়েছে। ট্রেন আসার সময় রেলের ওপরকার শব্দ, টেলিগ্রাফ পোস্টের গুমগুমানি ; বৃষ্টির ঝড়ের গর্জন, কাশবনের শনশনানি এসব শব্দও লক্ষ্য করার বিষয়। শব্দযোজনার জন্য ভূপেন ঘোষ এবং শব্দ পুনঃযোজনার জন্য সত্যেন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কৃতিত্বে নতুন করে মর্যাদা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পনির্দেশ ও সুরযোজনার দিকটায়ও সাড়া পড়িয়ে দেবার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। হরিহরের

সংসারই হোক, কি পণ্ডিতের মুদিখানাই হোক আর বিয়ে বাড়িই হোক, এমন সাজানো যাতে সবক্ষেত্রেই বাস্তবতা পরিপাটিভাবে ফুটে উঠেছে। বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশে কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই। তেমনি কৃত্রিমতার রেশও কোথাও পাওয়া যায় না রবীন্দ্রশঙ্কর সংযোজিত আবহ সুরে। সবই দিশী বাজনা, মেঠো আর গেঁয়ো সুর, কিন্তু নাটকে চমৎকার মৌতাত যোগ করে গিয়েছে আগাগোড়া। তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে দুর্যোগের দাপটও ব্যক্ত হয়েছে বাজনার মধ্যে দিয়ে। এদিক থেকে রবীন্দ্রশঙ্কর একটা অনুকরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন বাজনার সঙ্গে মেল সৃষ্টি করায়ও নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। ছবিখানি সম্পাদনায় দুলাল দত্তের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

'পথের পাঁচালী'-র গুণকীর্তন লিখে শেষ করা যায় না। এতো দিকে এতো গুণের ছবি আগে আর দেখা যায়নি। প্রতিটি ক্ষণ লোককে মুগ্ধ বিস্ময়ে ছবির ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দেবার জোর সম্পন্ন এমন ছবিটি আর হয়নি। উদ্যানের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হতে যেমন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, বুঝিয়ে বলে দেবার দরকার হয় না তেমনি 'পথের পাঁচালী'-র গুণগুলোও স্বতই দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

১৯৫৫

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সাহিত্যর কোনো বিষয় যখনি চলচ্চিত্রের পরদায় দেখা দেয় তখনি দর্শকের মন তার মধ্যে সেই সাহিত্যের ছবি খোঁজে। হাতের কাছে বই রয়েছে, তবু ছবির মধ্যে সেই বই-এর রসকে ফিরে পেতে ইচ্ছে যায়। যেন প্রিয়জন কাছে থাকলেও তার ফোটোগ্রাফ দেখার মতো। বিশেষ করে বাঙালী মন সাহিত্য-প্রধান, সাহিত্য আমাদের কাছে আঁকা ছবি বা নাচের চেয়ে প্রিয়। এমনকি গানের ব্যাপারেও সুরপ্রধান সঙ্গীতের চেয়ে ভাষা-প্রধান গানই আমাদের মনকে বেশি টানে। তবু সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' দলমতশ্রেণীনির্বিশেষে বাঙালী মনকে অভিভূত করেছে, এতে চলচ্চিত্রের জয়জয়কার।

কেননা চলচ্চিত্রের 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের বই-এর পুনরাবৃত্তি নয়, এমনকি ঠিক পুনঃসৃষ্টিও নয়। প্রায় তিরিশ বছর আগেকার এই উপন্যাসে, বাঙালী জীবনেও শুধু সত্য ছিল না, স্বপ্নও ছিল। বিভূতিভূষণের বাস্তবতা সেই স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। তাতে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু তার কর্কশতা নেই, ক্লেশ আছে, কিন্তু তার

অসুন্দরতা নেই। বিভূতিভূষণের রচনার সময়ে তার রোম্যাণ্টিক বাস্তবতার মেজাজ কালধর্মী ছিল, আজকের বাস্তববোধ আরো স্পষ্ট, তার মেজাজ আলাদা। অথচ কালধর্মী বলেই এবং মানুষের ও প্রকৃতির সম্বন্ধে নিবিড় বোধের ফলে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র সাহিত্যমূল্য কিছুমাত্র কমেনি। পরে তাঁর রচনা যত আরো স্বপ্নময় হয়েছে, কালধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তত তার মূল্য কমেছে। 'পথের পাঁচালী' অমর কিন্তু 'দেবযান' ইতিমধ্যেই স্মৃতিমাত্র। বিশেষ দেশ-কালের সত্যতাকে যে শিল্প প্রকাশ করে তাই সবচেয়ে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। ধোঁয়াটেভাবে সারা পৃথিবীর চেহারা নিয়ে যখন কিছু উপস্থিত হয়, তখন তাকে কেউ-ই চিনতে পারে না। 'পথের পাঁচালী' একটি বিশেষ দেশকালের বলেই তা সর্বকালের।

সর্বকালীন যে শিল্প তাকে বিশেষ বিশেষ কালে মানুষ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে। আজকের পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী'কে আজকের মন নিয়েই দেখেছেন। শুধু গল্পের নানা ঘটনার বর্জনে বা পরিবর্তনে নয়, অন্তর্নিহিত ভাবেও 'পথের পাঁচালী' বই আর ছবিতে অনেক পার্থক্য। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সব কিছুই সুন্দর নয়, কেবল যা সুন্দর তাই সুন্দর, যা অসুন্দর তা অসুন্দর, সত্যজিৎ রায়ের হরিহর সোনার বাংলার গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, সে যখন খেতে বসে কালো দাঁত থেকে মাছের কাঁটা বার করে, অথবা বিদেশ থেকে ফিরে কোঁচা দিয়ে বগলের ঘাম মোছে তখন সেটা দৃশ্য হিসেবে মোটেই মনোরম নয়, যেমন নয় প্রায়ই সর্বজয়ার মুখ বা ইন্দিরঠাককণের লোলচর্ম পিঠ, বা শীর্ণ হাতে বাটিতে ভাত চটকানো। ইন্দির মোটেই ফোটোগ্রাফের বই-এর বুড়ী নয়, অপুও দেবশিশু নয়। বিভূতিভূষণের অপু 'অপরাজিত' পেরিয়ে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' হয়ে 'দেবযান'-এ গিয়ে অবাস্তবতার চরমে পৌঁছয়, 'পথের পাঁচালী'তেই তার দেবশিশুত্বের আরম্ভ। সত্যজিৎ রায়ের অপু সাদাসিধে গ্রাম্য ছেলে, হয়তো একটু লাজুক, কল্পনাপ্রবণ, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

এজন্যই চলচ্চিত্র মহলে কেউ কেউ বলেছেন বুড়ীকে আরেকটু সুন্দর করলে ভালো হত, আর সাহিত্য মহলের কেউ বা বলেছেন অপুর মধ্যে বিভূতিবাবুর philosophy of wonder নেই। তবু দর্শকসাধারণের মনকে 'পথের পাঁচালী' যেমন নাড়া দিয়েছে তেমন আর কোনো ছবি কখনো দেয়নি। কেননা সুন্দর-অসুন্দরের এই টানাপোড়েনের ফলেই জীবনের বাস্তবরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সুন্দরকে আরো সুন্দর লাগে, জন্মের আনন্দ মনে আরো দোলা দেয়, মৃত্যুর বেদনা মর্মান্তিক হয়ে বাজে। পোড়ো ভিটে আর ভাঙা দরজার মাঝখানে ইন্দিরঠাকরুণের একটি গালভাঙা হাসি সমস্ত মানুষকে মুহূর্তে আপনার করে দেয়। শ্রীহীন বিপন্ন সংসারের পাশেই পুকুরে পদ্মপাতার ওপর হাওয়ার হিল্লোল জীবনকে আরো কত সত্য বলে প্রতিভাত করে। সর্বজয়ার সংসার যখন ভেঙে

পড়ছে তখন দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজার অকারণ আনন্দ, আবার সেই আনন্দের মধ্য থেকেই মৃত্যুর হাতছানি। রাত্রে হরিহরের পাশে বসে অপুর পড়াশুনা ও সর্বজয়ার কাছে দুর্গার চুল বাঁধার দৃশ্যে কী কর্কশ সাদাকালো আলোকপাত, একটানা ঝিল্লির ডাক আর দূরে ট্রেনের আওয়াজের সঙ্গে মিশে তাতে সমস্ত দৃশ্যকে যেন ভয়াবহ করে তোলে। তারই মধ্যে যখন অপু দুর্গাকে প্রশ্ন করে, 'দিদি তুই রেলগাড়ি দেখেছিস ?' আর সর্বজয়া দুর্গার চুলে এক টান দিয়ে বলে, 'ফের মিথ্যে কথা !' তখন সেই কর্কশ আলোছায়াই যেন তাকে আরো জীবন্ত করে তোলে। এই হচ্ছে আজকের মন্তব্যহীন, নিস্পৃহপ্রায় গভীর বাস্তবতা যা কেবল নীরবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে যায়। আবেগ বা মন্তব্যকে তুলে রাখে দর্শকের জন্য। এই জন্যই 'পথের পাঁচালী' ছবির শেষে কোনো সমাধান নেই বলে আক্ষেপ শোনা যায়নি। শিল্পে যখন মানুষের অস্তিত্বকে পুরোপুরি প্রকাশ করা যায়, তখন সমাধান চর্চার প্রয়োজনও চলে যায়। 'একটি লোক আছে'—এই কথাটুকু শিল্পে পুরোপুরি প্রকাশ করা অতি কঠিন, কিন্তু যদি প্রকাশ করা যায় তবে দর্শকের মনে জীবনের অস্তিত্ববোধ এত নিবিড়ভাবে জাগে যে সমাধানের দায়িত্ব তার আপনার হয়ে যায়। যেখানে দর্শক বা পাঠক চরিত্রের সঙ্গে এই একাত্মতা বোধ করে না, কেবল শিল্পীর অনুরোধে তার অস্তিত্বকে মেনে নেয়, সেখানেই সমাধান-সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কারণ সেখানে সমাধানের দায়িত্ব শিল্পীরই থেকে যায়। সেই শিল্পই সার্থক যাতে এই দায়িত্বকে দর্শক বা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারে। তাই 'একটি লোক আছে' এই দিয়ে গল্পের আরম্ভ শুধু নয়, আগাগোড়া গল্পের মধ্য দিয়ে এই কথাটা বলার জন্যই গল্পকারের সমস্ত আকুতি। ঘটনা আছে এটা শিল্পের প্রধান বক্তব্য নয়, মানুষ আছে, এটাই প্রধান বক্তব্য।

কার্যক্ষেত্রে এই বাস্তবতাকে পরিণত করে তোলার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক আছে। একটি হচ্ছে প্রধান ঘটনার চারিদিকে অন্যান্য ঘটনাকে শুধু চলিষ্ণু রাখা নয়, কখনো কখনো প্রধান ঘটনা থেকে বিযুক্ত বা বিরোধীভাবে রাখা। যেমন সর্বজয়া ও ইন্দিরে যখন কলহ বেধেছে তখন অপু ও দুর্গা কাশবনের কাছে আখ খেতে ব্যস্ত ; মৃত্যুমুখে ইন্দিরকে যখন দুর্গা আবিষ্কার করে তখন অপু বাছুরকে নিয়ে টানাটানি করে, বাছুরের গলার ঘণ্টা বাজে ; হরিহর যখন প্রবাসে চলেছে তখন অপু আর দুর্গা দিল্লি দেখবার জন্য উন্মত্ত ; গভীর দুর্যোগের রাতে যখন দুর্গার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন অপু ঘুমে অচেতন ; হরিহর ফিরে আসার পর যখন সর্বজয়ার রুদ্ধ শোক ফেটে পড়ে তখন অপু রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে। চিত্রনাট্যের এই কৌশল একটি সময় একটি অবস্থা বা ঘটনার গোটা চেহারাটি পরিস্ফুট করে, তার প্রধান ভাবকে আরো ঘনীভূত করে। চিত্রনাট্যের নৈপুণ্য আরো দেখা যায় বড় অপুর প্রথম পরিচয়ে, দুর্গার মৃত্যুর পর থেকে

হরিহরের ফেরা পর্যন্ত সর্বজয়ার কান্নাকে ধরে রাখার মধ্যে। বিপরীত ভাবের সাহায্যে দর্শকের মনোযোগকে ধরে রাখার কৌশলও কম বিচিত্র নয়। যেমন হঠাৎ নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের মাঝখানে It's a long way to Tipperary বেজে ওঠা দিয়ে রাণুর বিয়ের পর্যায়ের আরম্ভ। বাস্তবিক এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে যাওয়ার কায়দা এই ছবির চিত্রনাট্য ও সম্পাদনার একটি অভিনব দিক। এক পর্যায় থেকে কেটে সোজা অন্য পর্যায়ে চলে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে শান্ত থেকে চঞ্চল, চঞ্চল থেকে রৌদ্র রসের, তাছাড়া বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ের খেলা দর্শকের মনোযোগকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয় না। একমাত্র বড় অপুর আত্মপ্রকাশের আগে অল্প কিছুটা অংশে এই পরিবর্তনশীলতার অভাব দেখা যায়। সম্পাদনার ব্যাপারে দূর, মধ্য ও নিকটদৃষ্টির সমস্ত আইনকে সত্যজিৎ ও দুলাল মিলে বানচাল করেছেন।

চিত্রনাট্য ও সম্পাদনার বাস্তব ধর্মের সঙ্গে ক্যামেরাও যোগ দিয়েছে। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা অতি সন্ধানী কিন্তু তারও 'সুন্দর করে তোলার' কোন চেষ্টা নেই। যা সত্য, তাই সুন্দর। দুপুরের পোড়া রোদ, যাতে শুধু সাদা কালোর তীব্রতা টোনের সহজলভ্য সৌন্দর্য নেই বলে যাকে সাধারণত নিকৃষ্ট ক্যামেরা শিল্প বলে মনে করা হত। আবার একটি কোণ-এর আলো নিয়ে কড়া সাদাকালোর বুনোটে তৈরি রাত্রি। যেখানে টোনের প্রয়োজন সেখানে তাও পরিপূর্ণ, যেমন জলের মধ্যে কলমিলতার উপর ফড়িঙের দৃশ্যে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকাল, বিকেল—সবেরই সত্যকার রূপ। সবচেয়ে বড় কথা সর্বত্র ক্যামেরার ঠিক অনিবার্য দৃষ্টিকোণের নির্বাচন। ঠিক যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দৃশ্যের উদ্দেশ্য সবচেয়ে ভালো প্রকাশ পাবে তাকে সহস্র সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া যে কী কঠিন তা সবিশেষ চর্চা ছাড়া ধারণা করা যায় না। 'পথের পাঁচালী'তে দৃষ্টিকোণের এই যাথার্থ্য বিস্ময়জনক, নতুন ক্যামেরা-শিল্পীর পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। দুর্গার জ্বরের দৃশ্যে শুধু দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার পরিবর্তন হতে থাকে। খুব নিচু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা তার অল্প ঘামে-ভেজা মুখ, কান, নাক যেন স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়, জ্বরের উত্তাপ যেন ক্যামেরায় দেখা যায়। তবুও বলতেই হবে যে, এখানে ক্যামেরার বিশেষ নৈপুণ্য থাকলেও সমগ্রভাবে দুর্যোগের রাত্রির পর্যায়টির মধ্যে সমস্ত ছবির ভিতরে প্রথম একটু স্টুডিও-বদ্ধ কৃত্রিমতার ভাব এসে গিয়েছে। উদ্বেগ সৃষ্টির রীতি এখানে বাকি ছবির তুলনায় যেন একটু সেকেলে, স্টাইলের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মিশ খায় না। একটু যেন ক্লাইম্যাক্স-সচেতন হতে হয়, অন্য সমস্ত দৃশ্যে এক ফোঁটা জলের মতো যে স্বচ্ছতা, তা এখানে নেই বলে মনে হয়।

'পথের পাঁচালী'তে সঙ্গীতের ব্যবহার অতুলনীয়। বিশেষ করে সর্বজয়ার কান্নার আওয়াজের বদলে হঠাৎ তার সানাই-এর তীব্র আর্তনাদ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়

হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়াও স্মরণীয় বড় অপুর আত্মপ্রকাশের সময় একটি চোখের ওপর সেতারের হঠাৎ জোরদার স্ট্রোক, এবং কাঁথা ফেলে দিয়ে উঠে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে মুখ ধোওয়া ইত্যাদি অনেকগুলি দৃশ্যকে সুরে গেঁথে দ্রুত-গতিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, ভ্রমর গুঞ্জনের মতো দ্বিপ্রাহরিক সঙ্গীত; মেঠো বাঁশির সুর; ইন্দিরের ভাঙা গলায় গাওয়া 'হরি দিন তো গেল' গানের সুর তার মৃত্যুর পর যন্ত্রসঙ্গীতে বার বার ফিরে আসা; হঠাৎ It's a long way to Tipperary বেজে ওঠা এমন কি পিয়ানোর তার দিয়ে টেলিগ্রাফ সঙ্গীত বাজানোও কম চমকপ্রদ নয়। কেবল রবিশংকরের খরজের গভীর কাজ একটু বেশি দরবারী লাগে। আর সর্বজয়ার দুর্গাকে মারার দৃশ্যে ঢাক ও ঢোলের আওয়াজ একটু বেশি সচেতন প্রয়োগ বলে মনে হয়। এই সূত্রে 'দি রিভার'-এ আকাশে উড়ন্ত ঘুড়ির সঙ্গে দক্ষিণী তানের কথা মনে পড়ে। সে যেন খামখেয়ালি শিল্পীর চমকপ্রদ রঙে ঝলমল একটি সতেজ টান; গল্পের দিকে সেখানে পরিচালকের কোন হুঁস নেই। কাজে যেতে গিয়ে পথ ছেড়ে প্রজাপতি ধরার মতো। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে জলের ওপর ফড়িঙের নাচের দৃশ্যে সেতার কাহিনীর মর্মস্থলে বাজে তাতে হরিহরের চিঠি এসে পৌঁছানোর আনন্দ, শ্বাসরোধী বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের চারিদিকে প্রকৃতির লীলার প্রকাশ। উদয়শঙ্করের 'কল্পনা'তে ও রেনোয়ার 'দি রিভার'-এ চলচ্চিত্রে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবহারের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। 'পথের পাঁচালী'তে তার পরিপূর্ণ প্রকাশে আমাদের চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে, অন্তত যাওয়া উচিত।

ভারতীয় ছবির ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম চলচ্চিত্রের বহু আলোচিত detail-এর বিস্তৃত এবং সার্থক ব্যবহার হল। দুর্গার মৃত্যুর পরদিন সকালে জলে মরা ব্যাঙ, বৃষ্টি আসার পরে দাওয়ায় উঠে কুকুরের গা-ঝাড়া দেওয়া ইত্যাদি খুঁটিনাটির ব্যঞ্জনা বহু দর্শককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু শুধু এতেই নয়, আরো নানা দিক দিয়ে পরিচালনার অভিনবত্ব চোখে পড়ে। এক হচ্ছে অভিনয় ও পরিচালনার যোগাযোগ। দুর্গার হাতে পরিচালক যতখানি ভার ছেড়ে দিয়েছেন ততখানি অপুর ওপর নয়; অর্থাৎ দুর্গাকে নিজে অভিনয় করতে হয়েছে বেশি, অপুর বেলা চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তেমনি ইন্দির ঠাকরুণের ওপর যতখানি ভার দেওয়া হয়েছে সর্বজয়ার ওপর ততখানি নয়; হরিহর ফেরবার পর কান্নার দৃশ্যে সর্বজয়া যতক্ষণ ক্যামেরার দিকে ফিরে থাকে ততক্ষণ তার অভিনয় অসামান্য। কিন্তু বেশীর ভাগটাই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাঁপুনি। বোঝা যায় যে এখানে পরিচালক অভিনয়কে পুরোপুরি অভিনেত্রীর হাতে ছাড়তে রাজী নন। এই দৃশ্যে হরিহরের অভিনয়ও মনে হয় একেবারে পরিচালকের হাতে তৈরি— ধীরে ধীরে উঠে

দাঁড়ানো, হাত দুটিকে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে দেওয়া, তারপর আবার ধীরে ধীরে নিচু হতে হতে ধপ করে বসে পড়া, তারপর মুখ হাঁ করে ক্যামেরার দিকে চেয়ে থাকা —সমস্ত দৃশ্যটাই নিদারুণভাবে দর্শকের মনকে আঘাত করে, কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় কতগুলি বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির পরম্পরার ওপর এই দৃশ্য তৈরি, এবং সেই পরম্পরা পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের মধ্য থেকে এসেছে। অভিনয় সম্বন্ধে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দুটি মনোভাব দেখা যায়—এক, অভিনেতা কিছু নয়, পরিচালকের হাতের পুতুল মাত্র ; দুই, অভিনেতাকে অবলম্বন করেই পরিচালনা। সত্যজিৎ রায় এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ ধরেছেন এবং 'পথের পাঁচালী'তে তার পন্থা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে কোথাও কোথাও যেমন দুর্গাকে বাড়ি থেকে বার করে দিলে সর্বজয়ার দরজার গোড়ায় বসে পড়া বা দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়ার মাথা কোলে টেনে নিয়ে নীলমণির বৌ-এর নীরবে বসে থাকা হয়তো একটু পশ্চিমী ঢঙের। কিন্তু এতে ছবির সাফল্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি, বরঞ্চ দুর্গাকে তাড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য ও তার পরের সমস্ত পর্যায়টির মধ্যে আশ্চর্য অনিবার্যতা আছে।

গ্রাম-জীবন নিয়ে দেশ-বিদেশের যত ছবি দেখেছি তার মধ্যে 'পথের পাঁচালী'র তুলনা দেওয়া শক্ত। অস্পষ্টভাবে দনস্কয়-এর 'ম্যাকসিম গোর্কির শৈশব'-এর কথা মনে আসে। আর চরিত্রের প্রতি মনোভাব ডি সিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে-মিলটুকু আধুনিক বাস্তববোধের ক্ষেত্রে অন্তরের মিল। 'মিরাকল অব মিলান'-এ বিস্তীর্ণ বরফের ক্ষেত্রের ওপর রোদের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য লোকের ছুটোছুটি, ভোরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে ট্রেনের নিঃশব্দ গতি—এ সমস্তের মধ্যে জীবনের যে নীরব পর্যবেক্ষণ আছে তার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র জীবনবোধের কিছু মিল হয়তো আছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বাঙালী হয়ে যাওয়ার ফলে সে মিল ধরা পড়ে না, মন মানতেও চায় না।

কারণ, 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি হলেও তাতে কি রুশ, কি ইতালীয়, ফরাসি, জাপানি, ইংরেজি কোনো বিশিষ্ট প্রভাবের ছাপ নেই অথচ বিস্তৃত চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় চলচ্চিত্রের কাছেই সত্যজিতের ঋণ সবচেয়ে কম। আমাদের চলচ্চিত্র হলিউডের ছাঁচে তৈরি, অথচ কূপমণ্ডুক। ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র-উৎসবের আগে পৃথিবীর চলচ্চিত্রের সঙ্গে কোনো ব্যাপক সংযোগ এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভাগ্যে ঘটেনি, কারণ কর্মকর্তাদের কোনোদিন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। অনেকে প্রশ্ন করেছেন সত্যজিৎ রায় কী করে বাংলার গ্রাম জীবনের এমন যথাযথ রূপ ফোটালেন ? তার উত্তর এই যে পশ্চিমী শিল্প ব্যাপারে সত্যজিতের দখল অসাধারণ, বিশেষত পৃথিবীব্যাপী সার্থক চলচ্চিত্রের ইতিহাস তার নখদর্পণে।

১৩৬২

মৃণাল সেনের "জেনেসিস"

উৎপল দত্ত

নামটা বাইবেলীয়। 'জেনেসিস' অর্থে উৎপত্তি বা জন্ম। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্তের বাইবেল-ভাষ্যের শিরোনাম জেনেসিস। মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে আপাতদৃষ্টে মনে হয় পৃথিবীর জন্মলগ্নেই বোধ হয় পৌঁছে গেছি। ধ্বংসস্তূপের মাঝে দুটি পুরুষ ও একটি নারীর বেঁচে থাকার আপসহীন সংগ্রাম। ক্রমে আমরা বুঝতে পারি এ 'জেনেসিস' পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত নয়। এ জন্মকাহিনী অর্থলোভ ও প্রভুত্বের জন্মকাহিনী, এক কথায় পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের একটি রূপক। গোড়ায় যে লোকটি উটে চড়ে বার বার এসে মরুভূমির মধ্যে এ ছবির নায়কদের খাদ্য সরবরাহ ক'রে পরিবর্তে সস্তায় তাদের শ্রমের ফসল কিনে নিচ্ছিল সে ছিল বণিক। ছবির শেষে সে আত্মপ্রকাশ করে বৃহৎ পুঁজিপতি সংস্থার বর্শাগ্র হিসেবে ; খনিজ পদার্থের খোঁজে চলতে থাকে বুলডোজার, প্রবল বিস্ফোরণে উড়ে যায় অতীতাশ্রয়ী জগৎ। ছবির দুই শ্রমজীবী নায়ক তাদের অলীক শান্তির প্রান্তর রক্ষা করতে গিয়ে কোম্পানির লোকেদের হাতে বন্দী হয়। এটা পৃথিবীর ইতিহাসেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—বাণিজ্যপুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে উত্তরণ এবং শ্রমজীবীদের ওপর শতগুণ শোষণ বৃদ্ধি।

বহুদিন বাদে মৃণালবাবু বাঙালী মধ্যবিত্তের রক্তশূন্য চৌহদ্দি থেকে সরে গেছেন, এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যক্ষ আবেগকে ছবির উপজীব্য করার প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। মধ্যবিত্তের জীবন ছবির বিষয় হতে পারে না সেকথা আমরা বলছি না। বলছি মধ্যবিত্তকে ছবিতে আনতে হলে তাকে ধরতে হবে তার সংগ্রাম-সমেত। নইলে বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে এতই অকিঞ্চিৎকর যে আমরা শুধু দেখি নানাবিধ কাপুরুষতার কাহিনী, পলায়নের উপাখ্যান, আত্মসমর্পণের ক্লান্তিকর ফিরিস্তি। যেমন দেখেছি এক আধুরি কহানীতে, ইণ্টারভিউতে, খারিজে, চালচিত্রে। সমাজের উত্থান-পতনের বিশাল পটভূমিতে ব্যাপারগুলি এতই সামান্য যে আমরা বুঝতে পারি নি কেন মৃণাল সেনের মতো শিল্পী এইসব অপ্রয়োজনীয় ঘটনা নিয়ে কালক্ষেপ করছেন। 'জেনেসিস' মৃণাল সেনের সগর্ব প্রত্যাবর্তন সমাজ-বিবর্তনের মূলস্রোতে। সমরেশ বসুর মূল কাহিনীর খোলনলচে পালটে সর্বহারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এ ছবি। সত্যজিৎ রায়ের সদ্গতির ধারায়। সর্বহারা বলেই ওদের আবেগ-প্রকাশ এত নগ্ন, এত বলিষ্ঠ, এত প্রকট। ঈর্ষাতাড়িত দুই পুরুষ এক প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধূলিময় রাজপথে হিংস্র মল্লযুদ্ধে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করছে। এই আদিমতা অসম্ভব হতো মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাটে। সেখানে দুই মার্জিত কাপুরুষ নীরবে কয়েক হাজার ফুট ধরে পরস্পরকে

নিরীক্ষণ করতো। তাতে মানবচরিত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়তো না একটুও।

এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে—এ ছবির নায়করা, একজন তাঁতি ও একজন কৃষক—সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে যে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় নেয়, সেই নির্জনতাকে কেন আশ্রয় করলেন মৃণালবাবু? লোকালয় মধ্যে তাদের কর্মজীবন-সমেত কেন তারা বিধৃত হলো না? বন্যায় সব হারিয়ে যে মেয়েটি এসে এদের কাছে আশ্রয় পায় তাকেই বা অন্য সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধু তিনজনের একান্ত নৈকট্য কেন এই চিত্রনাট্যের মূল কাঠামো?

স্পষ্টই বোঝা যায় কাহিনীটিকে মৃণালবাবু দিতে চেয়েছেন এক আদিম সংঘর্ষের মাত্রা, যা কোলাহলময় গ্রাম্য জীবনে হারিয়ে যেতো। তাঁতি ও কৃষকের জীবনযাত্রায় ফুটে উঠছে আদিম মানবসমাজের শ্রমবিভাগ ও সবিশ্বাস সহযোগিতা, যেখানে লোভের হাত বাড়িয়েছে বাণিজ্য। উটের পিঠে আসে এক ব্যবসায়ী, সুতো জোগায় তাঁতিকে, তেল-নুন-আটা দিয়ে যায় নিয়মিত। পরিবর্তে সে তাঁতির হাতে-বোনা কম্বলাদি নিয়ে চলে যায় হাটে বেচবে বলে। একদিন তাঁতি ও চাষী বুঝলো, নিজেদের জন্যে একটা গামছা বুনবার অধিকারও তাদের নেই। তাদের শ্রমশক্তি সম্পূর্ণ বিক্রিত। বণিক, তাঁতি ও চাষী—এই তিন প্রতিরূপস্থানীয় চরিত্রের মধ্যে গল্পের ছকটা সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলেই parable-এর আমেজ পাওয়া যায়। রূপকথার তীক্ষ্ণ সারল্য অনুভব করা যায়। একটি জটিল ঐতিহাসিক যুগের সারাংশ চিত্রিত হয় চোখের সামনে।

এই কাহিনীর মধ্যে যখন শ্রমিক-রমণী প্রবেশ করে তখন বেঁচে থাকার তাগিদেই তিনজনে যেভাবে শ্রম ভাগ ক'রে নেয় তাতে মনেই হয় না আগন্তুক যে নারী সে-বিষয়ে পুরুষ দু'জন সচেতন। এটাই ঘটেছিল ইতিহাসে। প্রকৃতি যখন ছিল কৃপণ তখন কোনো নারীর একজোড়া কর্মঠ হাত এসে সমবেত শ্রমে যোগ দিলে সেটুকুই হতো বড় পাওয়া। তাই দেখি তিনজন শ্রমজীবী মানুষ নারী-পুরুষ বিভেদ ভুলে খাটছে এবং বাঁচছে।

কিন্তু মানুষ উৎপাদনী যন্ত্র নয়। সে শুধুই তার শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, সে ব্যক্তিও। মরুভূমির মাঝখানে কোনো নারীর মুখদর্শনের সুযোগ নেই। আজ এত কাছে একজন নারীকে পেয়ে অবশেষে অনিবার্যভাবে দুই পুরুষ সচেতন হলো—যে এসেছে সে নারী। এবং পারিপার্শ্বিক এমনভাবে রচিত হয়েছে এ ছবিতে—এক মৃত, বিধ্বস্ত নগরী-চরিত্রগুলি এমনভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে—অকপট, সরল, মনের ভাব গোপনে অপারগ—যে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়। কিন্তু সে বলতে পারে না গর্ভস্থ সন্তানটি কার। সে ভেবেও পায় না কেন এটা এত জরুরী প্রশ্ন। আর একটি মানুষের জেনেসিস হয়েছে, তাইতো যথেষ্ট।

কিন্তু পুরুষ দু'জনকে জানতেই হবে—কে পিতা, কার 'হক' থাকবে, অধিকার থাকবে আসন্ন সন্তানের ওপর।

তখন শ্রমিক-নারী স্পষ্ট বলে দেয়—তোমরা দুজনেই মালিক হতে চাইছ। অর্থাৎ অনাগত শিশুটির ওপর পিতৃত্বের অধিকার কায়েম করাটা যাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ তাদের মনের মধ্যে প্রভুত্বের বিষ রয়ে গেছে। তারা সর্বহারা চরিত্র হারাতে বসেছে মনের কন্দরে সঞ্চিত সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের চাপে।

তাই মেয়েটি সোজা জানিয়ে দেয়—সন্তান তোমাদের মধ্যে কার বলতে পারবো না, তবে এটা জানি সে আমার।

এভাবে তিনজন ক্ষুধার্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে মৃণাল সেন অতি সূক্ষ্মভাবে গিয়ে পৌঁছান সারা পৃথিবীর সব সমাজের আদি কথায়। সত্যি সব সমাজই এক সময়ে ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সন্তানের পিতা কে কারোর জানার দরকার হতো না। লোকে জিজ্ঞাসা করতো মাতা কে?

সত্যিই ভারতের সর্বহারা যদি সব ফিউদাল ঐতিহ্যের ভার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতো, মাথা উঁচু করতে পারতো বিশুদ্ধ প্রোলেতারীয় চিন্তার আলোকে তবে ইতিহাসের পথ হতো মসৃণ। কিন্তু তা তো হবার নয়। উৎপাদনী-সম্পর্কের মধ্যে যেখানে জোতদার-জমিদার-ভূমিদাস-বণ্ডেড লেবার সব বিরাজ করছে যেখানে সর্বহারার চিন্তায় পশ্চাদপদ সব ধ্যান-ধারণা থাকবে না, তা তো হয় না। তাই 'জেনেসিস' ছবির গোড়ায় যে দুই পুরুষকে আমরা দেখেছিলাম যৌথ শ্রমে ঐক্যবদ্ধ, ছবির শেষে দেখি তারা যুক্তিহীন ঘৃণায় পরস্পরকে আঘাত করছে।

আর সেই সুযোগে ঢুকে আসে কোম্পানীর বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর অনৈক্যের সুযোগ ব্যতীত কবে কোথায় আক্রমণ চালাতে পেরেছে শোষক? মেশিনের তাণ্ডবে ছবি শেষ হয়।

একটি কথাই হয়তো বলার আছে। ঐ যে মৃতের শহরটি—ঐ যে নেক্রোপলিস—যেখানে আশ্রয় খুঁজেছে উচ্ছিন্ন কৃষক, তাঁতি ও শ্রমিক-রমণী—শেষকালে আধুনিক পুঁজিপতি সংস্থার ডিনামাইটে যখন তা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে উড়ে যাচ্ছিল, আমি তখন ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করছিলাম আনন্দ। যাক, উড়ে যাক ওদের মিথ্যা আশ্রয়। মেশিনের অনিবার্য অভিযানে একদিন না একদিন যেতোই সেটা। মৃণালবাবুর তিন সর্বহারা আশ্রয় খুঁজেছে অতীতের মৃতদেহের মধ্যে। পদে পদে সেখানে কুড়িয়ে পায় ওরা মড়ার খুলি। ডিনামাইটের বজ্রনির্ঘোষে সেখানে নতুন জীবন শুরু হলো বলা যায়। মৃত অতীতের চেয়ে অবশ্য পুঁজিপতি সংস্থার মেশিন ভাল। কিন্তু মৃণালবাবুর সব অনুকম্পা মনে হলো ঐ দুই বিভ্রান্ত সর্বহারার প্রতি, যারা খালি হাতে রুখতে এলো

সশস্ত্র বাহিনীকে। আমার মনে হচ্ছিল শেষ দৃশ্যে ওরা দন কুইকসোট। ইতিহাসের গতি রোধ ক'রে দাঁড়াতে চাইছে।

ফরাসি কলা-কুশলীদের সহায়তায় মৃণালবাবু আশ্চর্য চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ করেছেন। অভিনয়ে শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শা এবং ওম পুরী ভারতীয় সর্বহারাকে সব ব্যথাবেদনা সহ উপস্থিত করেছেন। তবে বণিকের ভূমিকায় এম কে রায়না দিল্লি দূরদর্শনের হিন্দি সংবাদপাঠকদের ঢঙে সংলাপ বলে পার্টটা ডুবিয়েছেন।

বার্গম্যান : ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ এবং…

কিরণময় রাহা

সুইডিশ চলচ্চিত্র উৎসবের চারদিনই প্রথমে দেখানো হয় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্র। ওই রঙীন দৃষ্টিনন্দন ছবিগুলো কতটা Swedenএর যথাযথ ও প্রামাণ্য প্রতিচ্ছবি জানি না তবে দেখতে দেখতে এ কথা মনে এসেছিল—কী সুন্দর দেশ, কী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুখী, ভাগ্যবান সব লোকজন। একই সঙ্গে আবার দুটো প্রশ্নও মনে এসেছিল : এমন সমৃদ্ধ ও প্রকৃতির অকৃপণ উপহারধন্য দেশে আত্মহত্যার হার এত বেশী কেন? এবং এ দেশে কেন ও কেমন করে Ingmar Bergman ?

বার্গম্যানের মাত্র চারটি ছবি দেখেছি। বলা বাহুল্য তা থেকে জগতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র স্রষ্টা সম্পর্কে কোন সামগ্রিক ধারণা বা মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তা সত্বেও এবং সে চেষ্টা না করেও ওই চারটে মাত্র দেখা ছবির ভিত্তিতে Bergmanএর প্রতিভা সম্পর্কে কিছু বলা এই কারণে সম্ভব যে ঐ চারটে ছবির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাযুজ্য ও ভাবগত ঐক্য সহজেই লক্ষণীয়। Bergman-এর চিন্তাধারার অন্ততঃ একটা স্রোতের পরিচয় তা থেকে পাওয়া যায়।

প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় তা হ'ল Bergmanএর জীবনান্বেষী অথচ একই সঙ্গে মৃত্যুকেন্দ্রিক জীবনবেদ। মৃত্যুকে কিছুতেই যেন তিনি ভুলতে পারেন না। জীবনে মৃত্যুর উপস্থিতিবোধ তাঁর কাছে কত তীব্র ও অনুভবগ্রাহ্য তার প্রকাশ শুধু Seventh Sealএ নয়, অন্য তিনটি ছবিতেও সমভাবে বিদ্যমান। Wild Strawberriesএ প্রথম স্বপ্নে দেখি একটি সময়হীন, প্রাণহীন, জনহীন রাস্তায় গাড়ী থেকে একটি শবাধার পড়ে গেল; আর ছবির যে বৃদ্ধ, অনুসন্ধানী নায়ক সে দেখল যে তারই শব তাতে আছে আর হাত বাড়িয়ে তাকে টানছে। The Magicianএর প্রথম দৃশ্যেই আবার শবাধার মৃত্যু। The Virgin Springএর কেন্দ্রবিন্দুই হল জীবনের প্রতীক, সাদা

উজ্জ্বল আলোয় ধৌত Karinএর বিনাশ ও হত্যা। শুধু কি মৃত্যুর সোজাসুজি উল্লেখ? অলক্ষ্য ও নেপথ্য মৃত্যুর উপস্থিতিও Bergman বারবার রচনা করেছেন নানা মৃত্যু-প্রতীকী চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনায়—দুঃস্বপ্ন, অন্ধকার, প্রদোষ, ছায়া, কালো রং। এই জন্যই বলছিলাম প্রামাণ্য চিত্রের অমন প্রাণোচ্ছল সঙ্গীতমুখর Swedenএ Bergman কেন?

বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের উত্তর এতোই সহজ যে প্রশ্নটা মনে আসাই উচিত হয়নি। Swedenএর আর্থিক সাচ্ছল্য, উচ্চ জীবনমান ও বহুদিনের সংকটমুক্ত ইতিহাস যে সমাজ আজ তৈরী করেছে তার শূন্যগর্ভতা বহুবিদিত। কোন গভীর মূল্যবোধেই বর্তমান সুইডিশ জীবন চিহ্নিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও প্রাচুর্য সমাজকে সেখানে করে তুলেছে অন্তঃসারশূন্য। জীবনোচ্ছল বহিরঙ্গের নীচেই সেখানে নাস্তির কালো গহ্বর। তাই সেখানে যিনি জীবনসন্ধানী তাঁর পক্ষে মৃত্যু-সচেতন না হয়ে বোধহয় উপায় নেই। সঙ্গত কারণেই তাই Bergmanএর মৃত্যুচিন্তা।

Bergmanএর মৃত্যুকেন্দ্রিক মন কিন্তু মৃত্যুর প্রতি কোন "শ্যামসমান" অনুরাগে রঞ্জিত নয়। সে মন যদি মৃত্যু অভিমুখী হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছে জীবন অনুসন্ধানেরই ফলে, যে অনুসন্ধানের অপর ফল হল সমকালীন আপাতসমৃদ্ধ সুইডিশ জীবনযাত্রার প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতি। জীবনের প্রতি বিরাগ বা মৃত্যুর প্রতি অনুরাগে Bergmanএর এই অস্বীকৃতি নয়। বরঞ্চ জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগই তাঁকে মৃত্যু সম্বন্ধে এত সচেতন করেছে। তাঁর ছবিতে মৃত্যু যেমন একদিকে বিস্তৃত ছায়া ফেলেছে, জীবনও তেমনি অন্যদিকে আলো কম ফেলে নি। জীবন ও প্রেমের প্রতি আস্থা বারবারই এই তিনটি ছবিতে ঘোষিত। বাস্তবিক, জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্য যে অপূর্ব রীতি-বৈদগ্ধ্যে এ তিনটি ছবিতে অঙ্কিত তার নিদর্শন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল। Wild Strawberriesএ Borgএর আত্মিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি বারবার দেখানো হয়েছে আত্মিক ঐশ্বর্য: সাদা Strawberries গুচ্ছ, তিনটি ক্ষণিকের সহযাত্রীর সারল্য, ছেলেবেলার সহজ সম্পর্ক, Petrol Pumpএ নবজীবন বন্দনা। Virgin Springএ শেষ দৃশ্যে ঝরণার আবির্ভাব জীবনেরই প্রতীক, মানুষের ঐশ্বরিক বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

Bergmanএর সত্যানুসন্ধানী মন মানবিক মূল্য ও জীবনের পুনরাবিষ্কারেই শুধু ব্যস্ত নয়, O'neillএর মত তাঁর অন্বেষা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়েও। সমকালীন সামাজিক জীবনের অস্বীকৃতি Bergmanকে একদিকে যদি মৃত্যু-সচেতন করে থাকে তাহলে সেই অস্বীকৃতির অপর ফলস্বরূপ হল অতীতে ও স্মৃতিতে তাঁর ডুবে যাওয়ার প্রবণতা। কোন ক্রীশ্চিয়ানের পক্ষে ধর্ম (religion) ও সঙ্ঘ (church) ব্যতিরেকে ঈশ্বর তথা জীবনকে জানতে, বুঝতে ও খুঁজতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এবং যেহেতু

ধর্ম ও সঙ্ঘের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই হল অতীত ও যৌথ স্মৃতি, সেহেতু Bergmanএর অনুসন্ধান যে তাঁকে নিয়ে যাবে এই দুই পথের পরিক্রমায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আশ্চর্য শুধু হতে হয় কিভাবে এই পরিক্রমায় তিনি এগিয়েছেন তাই দেখে; বিশেষ করে Wild Strawberriesএ।

স্মৃতির গহন চলচ্চিত্রকারদের অনধিগম্য বলে একটি ধারণা আছে। এ ধারণার কিছু কারণও আছে। চলচ্চিত্র বড় বেশী বাস্তব বড় বেশী বর্তমান : উপায় নেই এখানে নিরবয়ব ভাবরাজ্য ও বিমূর্ত শিল্পকৃতির রূপায়ণের। যান্ত্রিক Camera যার লেখনী সে কি করে যাবে Kierkagardএর যন্ত্রণায়, Kafkaর দুঃস্বপ্নে বা Joyceএর নিমজ্জিত চেতনা-প্রবাহে? কি করে যে যাবে, অন্ততঃ যেতে হলে কি করে যে এগোতে হবে তার সার্থক নিদর্শন Wild Strawberries. চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় স্বপ্ন, স্মৃতি এবং বর্তমান ও অতীতের মিশ্রণ যে কত সার্থকভাবে রূপান্বিত হতে পারে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য এই রচনা বহন করে। প্রবহমান সময়ের স্রোত যে একমুখী না হতেও পারে, বহুমুখী ও প্রতিমুখী স্রোতানুসরণ করেও যে সময়ের সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব—এই চিন্তার রূপায়ণেও Wild Strawberries, Hiroshima Mon Amourএর চেয়ে কোন মতেই কম সফল নয়। চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প উদ্ভাবনে ও সৃজনে Bergman এই মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে দেখিয়েছেন উপরোক্ত দুষ্প্রবেশ্য ভূমিতে চলচ্চিত্রকারদের বিচরণের পথ।

Virgin Springএ অতীত Wild Strawberriesএর ব্যক্তিঅতীত নয়, জাতীয় অতীত। এখানেও কিন্তু অতীত এমন একটা কালে বিধৃত যা জাতীয় স্মৃতির একটা প্রদোষান্ধকার যুগ, যখন Pagan বিশ্বাস আর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস জড়াজড়ি করে মিশে আছে, প্রাক্-খ্রীষ্টীয় দেবদেবীরা সহাবস্থান করছে খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরের সঙ্গে। ছবির প্রথমে Odinএর কাছে Ingeriর আকুল প্রার্থনা ফিরে এসেছে ছবির শেষে Herr Toreএর আকুল প্রার্থনায়। এবং Bergman এই দুই দৃশ্য কল্পনায় এমন কোনও ঘোষণা করেন নি যা থেকে বলা চলে যে Herr Toreএর প্রার্থনাই কেবল ঈশ্বরের শ্রুতিগম্য। বাস্তবিক Virgin Springএ—ঝরণার আবির্ভাব সত্বেও—অন্তর্লীন যে দর্শন লক্ষণীয় তা হল ঈশ্বর, মানুষ, ধর্ম, পাপ ও বিশ্বাসের সম্পর্কজনিত কোনও স্থিরনিশ্চয় মতবাদের অনুপস্থিতি। মনে হয় Bergman যেন প্রশ্ন ও বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন, সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে তিনি নারাজ; যেন তিনি নিজেই অনিশ্চিত।

নিজের এই অনিশ্চয়তার প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গ The Magicianএ সুস্পষ্ট। যুক্তি ও বিশ্বাসের তর্কে Bergman এখানে কার স্বপক্ষে রায় দিলেন, বা "শিল্পী ও তার সৃষ্টি" এই সমস্যার কি সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন, তা আমি অন্ততঃ বুঝতে পারিনি। ছবির নায়ক Voglerকে বলা হয়েছে Magician, অর্থাৎ চাতুরীই যার ইন্দ্রজালের

ভিত্তি। কিন্তু সেই Magicianই মাঝে মাঝে কি যেন এক অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী হয়ে যায় যার কাছে Mrs Egerman হয়ে পড়ে বশীভূত ও সাহায্যপ্রার্থী। যুক্তিবাদী Dr. Vergerusকে চরম অপদস্থ করার পরই Voglerকে দেখি তারই হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে। এবং যখন মনে হল পরাজিত ও হৃতসর্বস্ব Voglerএর নির্বাসনেই ছবির শেষ তখনই এল রাজার আমন্ত্রণ। Virgin Springএ Herr Toreএর আকাশের দিকে দুহাত তুলে গির্জা নির্মাণের শপথের শেষ দৃশ্যেও Bergman একটা নিরুচ্চার আত্মজিজ্ঞাসার সুর এনেছেন যেটা আবার অলৌকিক ঝরণার আবির্ভাব-দৃশ্যে অনুপস্থিত। বস্তুত, তাঁর ছবি থেকে এই অনুমান এড়ানো শক্ত যে Bergman এখনও অনুসন্ধানেই নিবিষ্ট, এবং তাঁর অস্তিত্ববাদী বক্তব্য এখনও অবধি পরীক্ষামূলক। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এ নয় যে তাঁর অনুসন্ধান অপ্রসবী বা তাঁর বক্তব্য সারশূন্য। এবং তা নয় বলেই Bergmanএর চলচ্চিত্র চিরায়ত সৃষ্টির গৌরবের অধিকারী।

চিরায়ত সৃষ্টি অবশ্য শুধু বক্তব্য দিয়ে হয় না। একই সঙ্গে প্রয়োজন রচনাশৈলীর প্রসাদগুণ। যে কটি ছবি দেখার সুযোগ হয়েছে তা থেকে এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, সে প্রসাদগুণ থেকে Bergman বঞ্চিত নন। চিত্রকল্প রচনা, অভিনয়ের উৎকর্ষ—(Max Von Sydow-র Vogler বা Herr Tore অথবা Sjostromএর Borgএর তুল্য অভিনয় চলচ্চিত্রে কবার দেখা গেছে?), ক্যামেরার নিখুঁত কাজ, অল্প সময়ের মধ্যে মেজাজ রচনা (Magicianএ establishing shots যা দিয়ে প্রথমেই দর্শকের মনে কৌতূহল, রহস্য, ভয় উদ্রেক করে দর্শককে তৈরী করা হয়েছে তার সঙ্গে Hitchcockএর যে কোন ছবির সমতুল্য establishing shots তুলনা করলেই বোঝা যাবে Bergman-এর রচনাশৈলী কত নির্বাহুল্যে কত বেশী কাজ করে), চিত্রকল্পের গতিময়তা—এ সবেরই নিদর্শন এই তিনটি ছবিতে এতো ছড়িয়ে আছে যে তাদের পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মাত্র তিনটি বা চারটি ছবির ভিত্তিতে কোনও চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়ন অবশ্যই সম্ভব নয়, তবু যে কটি ছবি দেখেছি শিল্পবৈভবে ও বক্তব্যের উপস্থাপনায় তারা এত সমুজ্জ্বল যে এটা বোধ হয় সাহস করে বলা যায় যে এই কটি ছবি Bergman-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। Wild Strawberriesএ মৃত্যুচেতনা ও জীবনবোধের ঘন-সন্নিবদ্ধ সমাবেশ, দৃশ্যকল্পনা, শব্দ ও সঙ্গীত যোজনায় economy; Virgin Springএ সারল্যের (innocence) রূপায়ণ (Karin ও Herdsmanদের ছোট ভাই the boy), এবং সেই সারল্যের হাড়মজ্জা কাঁপানো অপমৃত্যু; The Magicianএ ইঙ্গিতময়, চাপা হাসি প্রতিধ্বনিত জগৎ সৃষ্টি—এ সবই শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির পরিচায়ক। বিচিত্র ও একান্ত নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেন বলে Bergmanএর যে খ্যাতি তার পরিচয়েও এ কটি ছবি চিহ্নিত।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এ কথাটাও বলা প্রয়োজন যে ওই জগতে সহজ ও সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার আমাদের নেই। এটা রসগ্রাহিতার ক্ষমতার বা উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবের কথা নয়, এটা দেশজ ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্যের কথা। ক্রীশ্চিয়ান রূপকথা, তত্ত্ব, কিংবদন্তী ও ধর্মীয় ইতিহাসে যথেষ্ট জ্ঞান ও অনুপ্রবেশ ক্ষমতা না থাকলে, আমার ধারণা, Bergmanএর চলচ্চিত্রের কিছু অর্থ, কিছু দ্যোতনা, কিছু স্বাদ এড়িয়ে যাবেই। সে জ্ঞান যদিই বা আমাদের মধ্যে কেউ অর্জন করে থাকেন, যুগ যুগ ধরে ধমনীবাহিত যে দেশজ স্মৃতির সঞ্চয় সেটা কি করে পাওয়া যাবে? Virgin Spring বা The Magicianএ এমন অনেক ক্রীশ্চিয়ান প্রতীকী চিত্রকল্পের ব্যবহার আছে যা আমাদের চোখে পড়লেও মনে অনুরণন আনতে পারে বলে মনে হয় না।

এই বাধা সত্বেও যদি Ingmar Bergmanএর ছবি আমরা বিস্মিত আনন্দে উপভোগ করে থাকি তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে মহৎ সৃষ্টি দেশকালের গণ্ডী পেরিয়েও কোনও এক স্তরে এক সার্বজনীন চিরন্তনী আবেদন বহন করে। তা না হলে বিদেশী শিল্পসৃষ্টির চর্চা বা উপভোগ প্রয়াসের কোন অর্থই হতো না।

আকাশ কুসুম

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বিগত কয়েক বছর হল বাংলা ছবির জগতে ভাল ছবির এতই অভাব যে কেউ নতুন ধরনের কিছু করছেন শুনতে পেলেই দর্শকমন উৎসুক হয়ে ওঠে। ঔৎসুক্যের অন্যতম কারণ বোধ হয় আধুনিক দর্শকমনের সময়োপযোগী ছবি দেখার বাসনা। সমাজে ও জাতীয় জীবনে আজ যে-সব সমস্যা মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তের প্রতিদিনের অস্তিত্বকে দুর্বিষহ করে তুলেছে তারই শিল্পধর্মী সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপনার প্রয়াস কোন চলচ্চিত্রশিল্পী করছেন কিনা এ কথা জানবার জন্যে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষীই আগ্রহী।

বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই আকাশ কুসুম-এর প্রযোজক পরিচালক সমস্যাসঙ্কুল মধ্যবিত্ত জীবনের একটা প্রতিবিম্ব আমাদের সমক্ষে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

বক্তব্য আজকের জীবনে অর্থকৌলীন্যই হল যথার্থ কৌলীন্য এবং তারই কল্যাণে মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রেমের সার্থকতা এমন কি চারিত্রিক মাহাত্ম্য নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়।

সামাজিক সমস্যা হিসাবে 'আকাশ কুসুমের' এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু অন্যান্য যে কোন শিল্পের মতো চলচ্চিত্রেরও বক্তব্য বিষয় এবং বাচনভঙ্গীর মধ্যে একটা অনস্বীকার্য পারম্পর্য না থাকলে শিল্প হিসেবে তার মূল্য নিঃসন্দেহে কমে যায়। 'আকাশ কুসুমে' পরিচালকের বক্তব্য যদি একটি অত্যন্ত গুরুতর সামাজিক ব্যাধির প্রতি দর্শকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তবে ছবির Styleএ এবং প্রয়োগপদ্ধতিতে সেই বক্তব্যের গম্ভীরতা নানা স্থানে বিশেষভাবে আহত হয়েছে। ছবিটিতে মৃণাল সেন বহুবার Freeze ও Still ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে নায়ক নায়িকার জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তের চিত্রায়ণে এই পদ্ধতি সহায়ক হয়েছে, অবশ্য এর আরও একটু মিতব্যবহার ছবিটির শিল্প সৌকর্য অক্ষুণ্ন রাখত। ক্রুফো ও সত্যজিতের Freeze ব্যবহারে অসাধারণ সংযম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আকাশ কুসুমে বক্তব্যের গভীরতা বা সময়োপযোগিতার সঙ্গে প্রয়োগগত গভীরতা এখানে রক্ষিত হয় নি। নায়কের হাবভাব, কথাবার্তা এবং আচার আচরণে এমন কিছু নেই যার দ্বারা দর্শকমনে এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয় যে সে একটা কঠোর, নির্মম এবং আদর্শহীন সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। তার চরিত্রের কল্পনাতেই বোধহয় ছবিটির মূল ত্রুটি নিহিত। কোন্ জীবনাদর্শের প্রতি তার আনুগত্য সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার আমাদের দিতে পারেন নি। আজকের সমাজে Happy-go-lucky বা Eat drink and be merry ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তরুণের অভাব নেই—তারা যে ছোটখাট টাটা বিড়লা হবার স্বপ্ন দেখে তাও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে তাদের ব্যর্থ প্রণয়ে বা অর্থনৈতিক অসাফল্যে আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে এ-দাবী মেনে চলা সুস্থ চিন্তায় সম্ভবপর নয়। যদি পরিচালকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোন আদর্শের প্রতি দর্শক চিত্তকে আকৃষ্ট না করে কেবল-মাত্র আধুনিক সমাজের রূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটন করা, তা হলেও ছবিটির প্রকাশ ভঙ্গীতে, অভিনয়ে এবং উপস্থাপনায় সেই রূঢ় সত্যের পরিচয় দুর্লভ।

সাহিত্য, নাটক, বা চলচ্চিত্রে নায়কত্বলাভে সেই উপযুক্ত যে তার জীবন সংগ্রামের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু আকাশ কুসুমের নায়কের মধ্যে যেমন নেই কোন উচ্চতর আদর্শের প্রতি আস্থা, তেমনি নেই জীবন সম্বন্ধে কোন দুর্বলতামুক্ত, পরিপূর্ণ cynical এবং বেপরোয়া মনোভাব। শেষ দৃশ্যে নায়িকার বাবার কাছে নায়কের স্বীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের মধ্যে আছে শুধু স্বার্থচিন্তা। যদি পরিচালকের বক্তব্য এই হয় যে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে কোন সেতুবন্ধন সম্ভব নয় তবে তার উপস্থাপনা এমন দুর্বল এবং প্রত্যয়-বিহীন যে তা দর্শকচিত্তে কোন প্রকার অনুভূতির উদ্রেক করে না।

বক্তব্যের দিক থেকে আকাশ কুসুমের একমাত্র সম্পদ নায়ক-বন্ধুর চরিত্রটি। বিবেক-

হীন ও সমাজচিন্তাবিমুখ নায়কের পাশে এই সুস্থ স্বাভাবিক চরিত্রটি বেশ কিছুটা মাধুর্য বিকীরণ করে। কিন্তু চরিত্রটির মূল্য অনেকাংশে অপূর্ণ থেকেছে নায়ক চরিত্রের ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থার জন্তে।

'মুক্তির' পুনর্মুক্তি উপলক্ষে

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ দেখলুম, 'ভারতী' চিত্রগৃহে বড়ুয়াসাহেবের (প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া যখন বেঁচে ছিলেন, তখন স্টুডিও মহলে তিনি হয় বড়ুয়াসাহেব, নয় পি-সি-বি নামেই পরিচিত ছিলেন) 'মুক্তি' ছবির পুনর্মুক্তি ঘটেছে এবং ছবিখানি দেখতে ভীড় হচ্ছে প্রচুর। ছবিখানি প্রথম মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৩৭ সালে এবং সেই সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। 'মুক্তি' ছবির প্রতিটি গান সে-যুগে হিট করেছিল। রেকর্ডে এবং লোকের মুখে মুখে শোনা যেত : সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে, আমি কান পেতে রই, আকাশে চাঁদ ছিল রে, ওগো সুন্দর এবং দিনের শেষে ঘুমের দেশে।

প্রমথেশ বড়ুয়া বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র জগতে একটি রূপকথার মানুষ—লিজেণ্ডারী ফিগার। পরিচালক এবং নায়ক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। বর্তমান যুগের চলচ্চিত্রের দর্শকরা প্রাচীন লোকদের মুখ থেকে এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানা লেখা থেকে তাঁর সম্বন্ধে একটি রোমাণ্টিক ভাবমূর্তি রচনা ক'রে রেখেছিলেন তাঁদের মনের ভিতরে। প্রায় তিন যুগ পরে তাঁরই অভিনীত ও পরিচালিত 'মুক্তি' ছবির ব্যবসায়িক মুক্তি তাঁদের তাই একান্তভাবে উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলেছিল তাঁদের মনের মণিকোঠায়-রাখা সেই ভাবমূর্তির সঙ্গে পরিচালক এবং অভিনেতারূপে তাঁর আসল মূর্তিটিকে মিলিয়ে দেখবার জন্যে। ছবিটি দেখবার পরে তাঁদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা লিখিতভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। মৌখিক ভাবে যে দু' তিনটি অভিমত জানতে পেরেছি, তাদের মধ্যে বেশ মিল আছে। প্রথমেই যে-কথাটা সোচ্চার ভাবে তাঁরা বলেছেন, সে হচ্ছে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে। তাঁরা বলেছেন, চলচ্চিত্রে এমন আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় যে হ'তে পারে, শ্রীবড়ুয়ার অভিনয় দেখবার আগে তা তাঁরা ভাবতেই পারেন নি। এবং তাঁরা আরও বলেছেন, মাত্র বাঙলা ছবি সম্পর্কেই তাঁরা কথাটা বলছেন না, বলছেন, সারা বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনয়ের কথা মনে রেখেই। কথাটা ভাববার মতো। এমন অনায়াস স্বচ্ছন্দে বন্দুক ধরা বা হাতী চড়াও তাঁরা দেখেন নি। আসাম গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার কৃতবিদ্য সন্তান কুমার

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন বিখ্যাত শিকারী এবং এই ছবিতে যে-হাতীটি তিনি ব্যবহার করেছেন, সেটি তাঁরই একান্ত প্রিয় বাহন—জং বাহাদুর, এ-কথা মনে রাখলে ঐ দুই বিষয়ে অবাক হবার কিছু থাকে না। তাঁর পরিচালনা সম্পর্কেও এঁরা বেশ উচ্ছ্বসিত দেখলুম। বিশেষ ক'রে, ছবির গোড়াতেই দরজার পরে দরজা খুলে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত শেষ দরজাটি খুলল না—এর মধ্যেই ওঁরা নানা রকম প্রতীকের নিদর্শন দেখেছেন; কেউ দেখেছেন, ওর মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মত ও পথের পার্থক্য, আবার কেউ লক্ষ্য করেছেন, দার্শনিক জিজ্ঞাস্য 'অতঃকিম্'-এর চিত্রায়ণ। মূল কাহিনীর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক লঘু পরিস্থিতির সংমিশ্রণ করারও তাঁরা যথেষ্ট তারিফ করেছেন, যেমন করেছেন ছবির বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী গানের সুপ্রযুক্ত ব্যবহার। তবে সবাই এ-বিষয়ে একমত যে, চিত্রটির সামগ্রিক গতি কিছু মন্থর; সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ-কথাও বলেছেন, ৩৭ বছর আগে এই গতিই হয়ত' অত্যন্ত দ্রুত ব'লে বিবেচিত হ'ত।

৩৭ বছর আগে দেখা ছবিটি এতকাল বাদে আমার নিজের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা পরখ ক'রে দেখবার জন্যে একেবারে শেষ দিনটিতে—১ আগস্ট তারিখে—ছবিটি দেখেছিলুম। আমার মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সংক্ষেপে ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলুম। সেটি হুবহু এখানে তুলে দিচ্ছি: শব্দানুলেখনে—রেকর্ডিং-এ—বেশ দৈন্য মনে হ'ল। মিঃ বড়ুয়ার অভিনয়কে বাদ দিয়ে অধিকাংশ অভিনয়ই—শ্রীমতী কানন সমেত—অস্বাভাবিক ও কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট; মাত্র চিত্রার (নায়িকার) পাণিপ্রার্থী 'খোকা'-রূপী ইন্দু মুখোপাধ্যায়কে উপভোগ্য মনে হ'ল (যদিও গৃহীত ভূমিকার তুলনায় তাঁকে বয়স্কই মনে হয়েছিল)। এমন কি, ঝর্ণার ভূমিকায় মেনকাকেও ভালো লাগল না। ১৯৩৭ সালে গানগুলিকে যতখানি আবেদনপূর্ণ মনে হয়েছিল, এখন আর ততখানি মনে হ'ল না। ফোটোগ্রাফী ও মেক্‌আপ আজকের তুলনায় নিরেস, ম্যাড়মেড়ে।

এইবার এই 'মুক্তি' ছবি সম্পর্কে কিছু অজানা এবং কিছুবা মজার কথা শোনাব। এই ছবির কাহিনীটি তৈরী হয়েছিল, স্যাপার-এর 'ডিনার ক্লাব' বইয়ের অন্তর্গত দু'টি ছোট গল্পের সংমিশ্রণে। একটি গল্পের নাম আমার এখনও মনে আছে; সেটি হচ্ছে: দি ম্যান হু কুড নেভার গেট ড্রাঙ্ক। দ্বিতীয় গল্পটির নাম ভুলে গেছি। বইটাকেও আমার লাইব্রেরীতে খুঁজে পাচ্ছি না; পেলে নামটা বলে দিতে পারতুম। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পঙ্কজকুমার মল্লিক এই ছবিতেই প্রথম স্বাধীনভাবে সঙ্গীত পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ লাভ করেন মিঃ বড়ুয়ার দৌলতে। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র 'নটীর পূজা' ও 'চিরকুমার সভা'র কথা বাদ দিলে (কারণ, এ দুটিই রবীন্দ্র-রচনা নির্ভর) 'মুক্তি' ছবিতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়। এইখানে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য পরিবেশণ করব। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের

সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। তিনি প্রত্যহ বৈকালে ঐ বিদ্যালয়ে গিয়ে বসতেন কিছুটা গল্পগুজব এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করবার জন্য। তাঁর সামনে বিদ্যালয়ের বিস্তৃত চত্বরে স্কুলেরই ছেলেরা খেলাধুলো করত। এ-ছাড়া তাঁর চেয়ারের সামনে ওপাশে যে দু' তিনখানি বেঞ্চি পাতা থাকত, তাতে এসে বসতেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের ছোট ছেলে কালোদা' এবং আরো কোনো কোনো পল্লীবাসী। এবং বসতুম আমরা—তাঁর গণেশের দল। নাট্যাচার্য নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, কবিতা—যাই রচনা করুন না কেন, নিজে হাতে খুব কমই লিখতেন। তিনি তামাক খেতে খেতে মুখে ব'লে যেতেন, আর কেউ-না-কেউ তা কাগজের ওপর লিপিবদ্ধ করত। হস্তাক্ষর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল ব'লে এই লেখার অধিকাংশই করতে হ'ত আমাকে এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও দাদা-স্থানীয় হ'লেও বন্ধু অমিয়কুমার সান্যালকে (তিনি আমার দু' শ্রেণী উপরে পড়তেন এবং উত্তরকালে একজন আইনজীবী হয়েছিলেন)। অমৃতলালের এই বৈকালিক বৈঠকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন ঐ বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র অশোকনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী জীবনে যিনি পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী রূপে খ্যাত হন), প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁরই সহাধ্যায়ী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী কালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাণীকুমার নামে পরিচিত), আমার সহাধ্যায়ী ফণীন্দ্রনাথ বসু (পরবর্তীকালে ডাক্তার) এবং আরও কেউ কেউ। কলেজে পড়া আমরা যে ক'জন ছিলুম, তাদের হঠাৎ মনে হ'ল একটা ক্লাব গড়লে কেমন হয়। যে কথা, সেই কাজ। চটপট ক্লাব তৈরী হ'ল ; অশোকনাথ নাম দিল—'চিত্রাসংসদ'। আমার জানাশোনা এক বিরাট বাড়ী ছিল আমারই বাড়ীর কাছাকাছি। তারই একটি ঘর আমাদের আস্তানা হ'ল। আমাদের ক্লাবের সভ্য হিসেবে যোগ দিল সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী যুগে লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীর স্পীকারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট), সে যুগের বিখ্যাত বেহালা বাদক অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সত্যচরণ দত্ত, পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং আরও অনেকে। যতদুর মনে পড়ে, সত্যচরণ দত্তই পঙ্কজকুমারকে আমাদের ক্লাবে নিয়ে এসেছিল আমাদের হঠাৎ একজন গাইয়ে সভ্যের প্রয়োজন পড়ায়। আমরা তখন শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ করবার কথা চিন্তা করছিলুম। 'ষোড়শী'তে 'ওমন, পাওয়ার সময় ছিল যখন' ও 'পূজা ক'রে তোরে তারা'—এই দু'টি একক গান ছাড়াও একেবারে শেষ দৃশ্যের আগে একটি গ্রাম্যপথের দৃশ্য যোগ ক'রে তাতে পথিকের মুখে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতাটির চারটি স্তবক গান হিসেবে গাওয়াবার কথা ভেবেছিলুম। একদিন বিকেলে বৈদ্যনাথ ও বীরেনের উপস্থিতিতে পঙ্কজকে বললুম, ঐ চারটি স্তবকে উপযোগী সুর যোজনা করতে। বললুম, জীবানন্দের উদাসী বেদনার্ত মন, সে নিজেকে সংসারে

সবচেয়ে বঞ্চিত ব'লে বোধ করছে ; তার ওপর সে শীঘ্রই ভূমিজ প্রজাদের দ্বারা এমনই-ভাবে প্রহৃত হবে (মূল নাটকের সাঁকো থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর বোধ হয়েছিল) যে, সে কিছু সময়ের মধ্যেই পরপারের যাত্রী হবে—এই পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে একটা সুর রচনা করতে হবে। পঙ্কজ তো প্রথমেই গররাজি হ'ল এই ব'লে যে, একটা কবিতার স্তবকে সুরযোজনা করবার চিন্তাটাই তার কাছে বাতুলতা ব'লে বোধ হচ্ছে। সে বলল—এটা অ্যাবসার্ড, ইম-প্র্যাক্টিকেব্‌ল্। আমাদের ছিল একটা টেবিল-হার্মোনিয়ম। বীরেন এগিয়ে এসে বললে—কেন হবে না ? তুই সর্।—ব'লেই সে টেবিল-হার্মোনিয়ম বাজিয়ে ঐ স্তবকগুলি গেয়ে ফেললে। পঙ্কজ শুনল এবং বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, এই স্তবক চারটেকে গান হিসাবে ব্যবহার করতেই হবে। ঠিক আছে। তখন বীরেন স'রে গেল এবং পঙ্কজ তার দরদভরা কণ্ঠে গেয়ে গেয়ে সুরকে তৈরী করল নানারকম বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে। এটা হচ্ছে ১৯২৮-২৯ সালের কথা। দুঃখের বিষয়, নানা কারণে শেষ পর্যন্ত আমাদের 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ হয় নি। শুনেছি, এর কয়েক বছর পরে 'আনন্দ পরিষদ' যখন 'গৃহদাহ' মঞ্চস্থ করে তখন পঙ্কজ সেই নাট্যাভিনয়ে 'দিনের শেষে' গানখানি গেয়ে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। এরও কয়েক বছর পরে ১৯৩৭ সালে 'মুক্তি' যখন মুক্তি লাভ করেছিল, তখন-কার কথা আর নতুন ক'রে নাই বললুম। এখানে উল্লেখ্য যে, 'মুক্তি'তে আমারই নির্বাচিত চারটি স্তবক ব্যবহৃত হ'লেও কয়েকটি কথায় কিছু হেরফের করা হয়েছিল ; অবশ্য, কি কারণে তা জানিনা।

এই 'মুক্তি' ছবিতে নায়িকা চিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যেই শ্রীমতী কাননকে রাধা ফিল্মস্ কোম্পানী থেকে ছাড়িয়ে এনে নিউ থিয়েটার্সের বেতনভুক শিল্পী-দলে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই বিশেষ ঘটনাটি আজও আমি ভুলতে পারিনি। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর ট্রেড-শো দেখে আমরা সকলে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে ফিরলুম। অমর মল্লিক মশাই তখন স্টুডিও ম্যানেজার। এক নম্বর ফ্লোরের লাগোয়া নীচের তলাতেই তাঁর ঘর। সেই ঘরে ঢুকে দেখলুম, মল্লিকমশাই ছাড়া সে ঘরে রয়েছেন বড়ুয়াসাহেব, জলু বড়াল এবং আরও কয়েকজন। বেশ সরগরমভাবেই কিসের যেন আলোচনা চলছিল। আমি ঐ ঘরে ঢুকতেই বড়ুয়াসাহেব বললেন, এই যে পশুপতি, আচ্ছা, তুমি বলো, কাননের অভিনয় কেমন লাগল ?—এইখানে জানিয়ে রাখা দরকার, মাস-মাইনে-পাওয়া সহকারী পরিচালকরূপে আমি তখন একদিকে যেমন নিউ থিয়েটার্সের কর্মী, অপর দিকে তেমনি আমি তখনকার দিনের নাম-করা সাপ্তাহিক 'নাচঘর'-এর ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক এবং নাট্য ও চিত্র সমালোচক। কাজেই আমার মতামত শোনবার জন্যে বড়ুয়া সাহেবের আগ্রহ ছিল। আমি একটু ভেবে নিয়ে বললুম,

নীহারিকার ভূমিকায় কানন আমাকে এমন কিছু ইম্প্রেস করতে পারেনি। বড়ুয়াসাহেব তখনই মল্লিক মশাইয়ের টেবিল থেকে লাইন টানবার জন্যে ব্যবহৃত গোল কালো রুলারটি তুলে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন এবং বললেন—আমার মাথায় মার। আমি এ-রকম একটা পরিস্থিতির জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না; একেবারে হকচকিয়ে গেলুম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কেন? হ'ল কি? মিঃ বড়ুয়া বললেন—আমি যে কাননের প্রশংসা করেছি; বলেছি, ও হচ্ছে চমৎকার শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব হ'ল: ও যে চমৎকার শিল্পী নয়, এমন কথা তো আমি বলিনি। ভালো পরিচালকের হাতে পড়লে ও যে চমৎকার কাজ করতে পারে, এর প্রমাণ তো আমরা আগেই পেয়েছি। 'শ্রীগৌরাঙ্গ'-এ ওর বিষ্ণুপ্রিয়া দেখেন নি? আমি বলেছি, এই নীহারিকার ভূমিকায় ওকে তেমন-কিছু মনে হয়নি, এই মাত্র। এবং আরও যোগ ক'রে দিচ্ছি, এর জন্যে দায়ী পরিচালক জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কথা শুনে বড়ুয়া সাহেবের যেন ধড়ে প্রাণ এল। তিনি বললেন, ওঃ! আমায় বাঁচালে। আমি যে আমার একটা ছবিতে ওকে নামাতে চাইছি; মল্লিক মশাইকে বলেছি, যে-কোনো উপায়ে কাননকে এখানে এনে হাজির করতেই হবে।—এবং, বলা বাহুল্য, অনেক কৌশল ক'রেই শ্রীমতী কাননকে রাধা ফিল্মস-এর আওতা থেকে বের ক'রে আনা হয়েছিল।

'মুক্তি' ছবির দ্বিতীয়ার্ধ হচ্ছে আসামের বহির্দৃশ্যপ্রধান।—বেশ অনেক দিন—বোধ করি, মাসখানেকেরও ওপর—ধ'রে এই বহির্দৃশ্য তোলবার পরে বড়ুয়া সাহেব সদলবলে কলকাতায় ফিরে এসে হরিদাস মহলানবীশকে নিয়ে লেগে গেলেন সম্পাদনার কাজে। ছবিটি যখন সাধারণ্যে দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল, তখন মাত্র নিউ থিয়েটার্সের কর্মীদের (কিংবা এও হ'তে পারে, মাত্র 'মুক্তি'র ইউনিটের কর্মীদের) দেখবার জন্যে 'চিত্রা'য় একটি প্রোজেকসানের (প্রদর্শনীর) ব্যবস্থা করা হ'ল। ঐ বিশেষ প্রদর্শনীতে আমিও উপস্থিত ছিলুম। ছবি দেখানোর পরে আমার মত জিজ্ঞাসা করাতে আমি খুব আস্থার সঙ্গেই রায় দিয়েছিলুম, এ-ছবি একদিনও চলবে না। বলা বাহুল্য, বেশ কয়েক-জনের কাছে আমার মতের সমর্থনও পেয়েছিলুম। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমর্থক হয়েছিলেন, মিঃ বড়ুয়া নিজে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল, এ-ছবি আদৌ লোকে নেবে না। এবং মাত্র সেই কারণেই তিনি যা করেছিলেন, তা শুনলে সকলেই চমকে যাবেন। তিনি চেষ্টা চরিত্র ক'রে লণ্ডনে যাবার একটি টিকিট সংগ্রহ ক'রে 'মুক্তি'র মুক্তিলাভের আগেই হাওয়াই জাহাজ যোগে লণ্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন।

এর পরে 'মুক্তি'র মুক্তি ঘটল। এবং পেল অগণিত জনসাধারণের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বড়ুয়া সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ও সহকারী-সচিব ফণী মজুমদার টেলি-গ্রাম করে জানালেন তাঁকে 'মুক্তি'র অভাবিত সাফল্যের কথা। কিন্তু লণ্ডনে বসে বড়ুয়া

সাহেবের তা বিশ্বাস হ'ল না। 'মুক্তি'র জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কণীর কাছ থেকে আবার টেলিগ্রাম গেল ; এবার ১ম ও ২য় সপ্তাহের টিকিট বিক্রয়ের টাকার অঙ্ক পর্যন্ত দেখিয়ে ; যা থেকে দেখা যায়, ১ম হপ্তা থেকে ২য় হপ্তার বিক্রী কয়েকশো টাকা বেশী,—হ্যাঁ, এবার মিঃ বড়ুয়ার বিশ্বাস হ'ল এবং দিন দুয়েকের মধ্যেই তিনি উন্নত শির ও উজ্জ্বল মুখ নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা শহরে সকলের দ্বারা অভ্যর্থিত হবার জন্য।

নিম অন্নপূর্ণা

সেবাব্রত গুপ্ত

ফিল্ম বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর হাতে বাস্তবিকই ফিল্ম হয়েছে, "নিম অন্নপূর্ণা"-য়। কমলকুমার মজুমদারের গল্পের ভীষণ অথচ বাস্তব বস্তু তিনি দেখিয়েছেন নিরেট সিনেমার শর্তে। দারিদ্র্যের সাঙ্ঘাতিক চেহারা দেখাতে গিয়ে পরিচালক একটু-আধটু স্বস্তির মুহূর্তও কিন্তু ঘুষ দিতে চাননি। এক্ষেত্রে তিনি কঠোর, আপসহীন। হয়ত এই ছবি দেখার সার্থকতা তাঁরাই বেশি অনুভব করবেন যাঁদের কাছে সৎ সিনেমা সতত আদরণীয়, এবং যাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফিল্মের কাজটুকুই মুখ্যত দেখেন। নতুবা অভুক্তের কষ্ট ও কিছুটা ন্যায্য লোভ এবং দুমুঠো চালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে নতুন দেখবার আর কী আছে। নিম অন্নপূর্ণা-য় কিন্তু তাও আছে। এই ছবির অন্নপূর্ণা, অভাবের সংসারের কর্ত্রী, বুড়ো ভিখারির ঝুলি থেকে যোগাড় করা চাল দিয়ে স্বামী-কন্যাদের ক্ষুধা মেটাতে পারলেও নিজে সেটা গিলতে পারল না। সেটা তার গলা দিয়ে বমি হয়ে বেরিয়ে আসে। নায়িকার মনে ও শরীরে গরম ভাতের এই তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া (নাকি বিষ-ক্রিয়া) দেখিয়ে পরিচালক মূল গল্পবস্তুকে শিল্পশর্তাধীন অস্পষ্টতা ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন। গল্পের কিংবা পরিচালকের অন্নপূর্ণা ভিখারির ঝুলি ভরে দিতে পারেনি। ভিখারি মরে যাবার পর তার থলি সরিয়ে নিয়েছে, আগেই সেটা সে চুরি করতে বা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ধস্তাধস্তিতে বুড়ো মারা যেতেই বুঝি অপরাধবোধে আক্রান্ত হয় মহিলা।

গল্পটা নিয়ে বুদ্ধদেব নাটক তৈরি করতে পারতেন। তিনি সে প্রলোভনের রাশ টেনে ধরেছেন, অথচ একটা দুঃখের অনুভূতি তিনি সঞ্চার করে দিয়েছেন অতি সহজেই। তিনি আগেই বদ্ধপরিকর ছিলেন কোনরকম ভাবালুতার প্রশ্রয় দেবেন না। সেটা বিন্দুবিসর্গও

নেই। কিন্তু তবু যেন অতীতের সুখ ও স্বপ্নের কিছুটা আভাস নায়িকার দীর্ঘশ্বাসে মিশে থাকে। পাশের ঘরে 'যদি আপনার মনে মাধুরী' বেসুরো গান শুনে তার অতীত বুঝি উঁকি দিয়ে যায়। শুধু ক্লেশ আর কষ্ট নয়, তার মাঝখানে বিফল স্বপ্ন ও অপূর্ণ সাধের ঝিলিক দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেছে। ছোট মেয়েটি কালো চশমা পরা লোকটির স্বপ্ন অনুভব করে তার কল্পনায়। তার গায়ে খাবারের গন্ধ। নির্মম পরিবেশে, ভাতের গন্ধ খুঁজে বেড়ায় সকলে। কমনীয়তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে কঠিন বাস্তবে ফিরে আসেন পরিচালক সঙ্গে সঙ্গে। তবু শুধু তাদের দারিদ্র্য নয়, পুরো মানুষগুলোকেই দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক। এইখানেই নিম অন্নপূর্ণা একটা হিউম্যান ডকুমেন্ট-এর রূপ নেয়।

অন্যদিকে অতি সুঠাম ও সুসমঞ্জস চিত্রনাট্যে, যেখানে কোন দৃশ্যই অবান্তর বা অর্থহীন মনে হয় না, বিশেষ পরিবেশের চিত্রটি নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন পরিচালক। সেই সঙ্গে সেখানকার জীবনধারা ও লোকজনের স্বভাব-চরিত্রের ছবিও ক্ষুদ্র আঁচড়ে এঁকে দিয়েছেন। আবার নোংরা পরিবেশ থেকে কখনও-সখনও সরে গিয়ে ছবির ক্যামেরা (কমল নায়েকের কাজ অসাধারণ) ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যও খুঁজে নিয়েছে। এই গল্পের স্বভাব ও বক্তব্য অনুযায়ী প্রত্যেক শিল্পীই—মণিদীপা রায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, জয়িতা সরকার, ভাস্বতী দাশগুপ্ত, মনোজিৎ লাহিড়ি—বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছেন। অভাবের সংসারে মণিদীপার স্বাস্থ্য একটু ভাল দেখালেও অভিনয়ের গুণে সেটা চাপা পড়ে। পরিচালনায় যে সংযম ও পরিমিতিবোধ সেটা শিল্পীদেরও স্পর্শ করেছে, সঙ্গীতকেও (দেবাশিস দাশগুপ্ত-কৃত)। ছবিটি দেখে কখনও মনে হয় না পরিচালক কিছু বলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। অথচ বক্তব্য সাবলীল হয়ে উঠেছে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। ব্যঙ্গ অতি সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে নেপথ্যে 'সারা জঁহা সে আচ্ছা' গানের সুরে। শিল্পগুণে নিম অন্নপূর্ণা একালের নতুন ধারার ছবির তালিকায় উপরের দিকে বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে রইল।

ব্রেসোঁর দি ট্রায়াল অফ্ যোয়ান অফ্ আর্ক

ধীরেশ ঘোষ

ব্রেসোঁ বলেছেন—"As soon as one tries to express oneself through mimicry, through gestures, through vocal effects, what one gets, ceases to be cinema, and it becomes photographic theatre."

প্রথমেই ধরা যাক তাঁর ছবির পাত্রপাত্রীগুলি। অভিনয় অর্থে তারা কেউ অভিনয় করে না। অভিনয় জিনিসটা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে তাঁর ছবিতে—কোন রকম চোখ মুখের প্রকাশভঙ্গী থাকে না, না থাকে কোন বাচনভঙ্গী কিংবা কোন অঙ্গ-ভঙ্গী। অভিনেতাদের কোন নাটকীয় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে দেওয়া হয় না। মনে হয় অভিনেতারা শুধু কথা বলে যান।

সংলাপ বলার ব্যাপারে ব্রেসোঁ তাঁর পাত্রপাত্রীদের এই উপদেশ দেন—"Forget about tone and meaning, just speak the words automatically. Playing nothing and explaining nothing." ফলে সংলাপ বলার মধ্যে একটা একঘেঁয়েমির সুর কানে বাজে। তাঁর ছবিতে পাত্রপাত্রীর ক্ষুব্ধ ভাবের প্রকাশ কিংবা উচ্চ হাসির উল্লাস একেবারেই দেখা যায় না। কিন্তু যে পরিবেশ ও বস্তু চরিত্রগুলির আশেপাশে দেখা যায়—অর্থাৎ যে পরিস্থিতির মধ্যে তারা চলাফেরা করে তাতে কিন্তু চরিত্রগুলিকে অমানব অথবা অতিমানব বলে মনে হয় না।

এখানে ড্রেয়ারের সঙ্গে ব্রেসোঁর কিছুটা সামঞ্জস্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাঁরা বলেন ড্রেয়ারের প্যাশন্ অফ্ যোয়ান অফ্ আর্ক ছবিতে চরিত্রের অবয়বের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া ও প্রতি-ক্রিয়া কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর কোন জোর না দিয়ে, চরিত্রের বাহ্যিক চেহারাকে মুখ্যত প্রকাশ করার প্রচেষ্টা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে বলা যেতে পারে। ব্রেসোঁর প্রধান চরিত্রগুলিতেও এই ধরণটা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। অত্যন্ত ধীরগতিতে কথা বলা প্রায় অপ্রকাশ্য ভঙ্গী—এক কথায় বিশেষ কোন ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না। এ চরিত্রগুলির জীবনে কোন নাটকীয় ঘটনা ঘটে না—প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের জীবনধারার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। এই জীবনধারার ওপর একটা স্পষ্ট ছাপ পড়েছে দেখা যায় যেটাকে বলা যেতে পারে এক ধরণের ঐশ্বরিক মহিমাতে বিশ্বাস। সমালোচকেরা বলেন এটা জ্যানসেনেজিম-এর প্রভাব।

জ্যানসেনিষ্টরা বিশ্বাস করেন পুরুষানুক্রমিক রোগ হল মানুষের আদি পাপ, তাঁদের মতে মানুষের আত্মা সমস্ত জাগতিক অসুবিধার সঙ্গে অনবরত লড়াই করে থাকে। এই সম্প্রদায় গীর্জার কর্তৃত্ব এবং গীর্জার আরোপিত নিয়মকানুনের বিরোধী। কিন্তু এই সম্প্রদায় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও মহিমাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। ব্রেসোঁ ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—যা কিছু তাঁর সংশয় এই পৃথিবীকে ঘিরে। এখানে বার্গম্যানের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে বার্গম্যানের বিশেষ সন্দেহ আছে।

ব্রেসোঁর ছবিতে কোন রকমের নোংরামি দেখা যায় না। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটিত ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করেন না। তেমনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সোজাসুজি

চিহ্নিত করেন না। তাঁর সব কটা ছবির প্রধান বক্তব্য একটা "It is always souls that one finds."

চিরাচরিত অর্থে যে প্লট ও গঠন আমরা বুঝি, সেরকম প্লট কিংবা নাটকীয় প্রস্তুতি ও পরিসমাপ্তি ব্রেসোঁর ছবিতে দেখা যায় না। তিনি মনে করেন প্লট হচ্ছে ঔপন্যাসিক ঢং। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন একটা চরিত্রকে ঘিরে তাঁর প্রতিটি ছবি গড়ে উঠেছে। (বালথাজারকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।) একটি ছবিতে একটি মাত্র থিমকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। প্লটের সঙ্গে সাব প্লটকেও বিসর্জন দিয়েছেন, যা কিছু অপ্রধান চরিত্র কিংবা থিমের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, সেগুলি বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছেন। কোন রকমের নাটকীয় মুহূর্তের ওপর এতটুকু জোর দেননি বরং যথা সম্ভব চেপে রাখবার প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে দেখা গেছে। ঘটনাগুলি একটার পর একটা ঘটে যায় সত্যি, কিন্তু সর্বতোভাবে মনস্তাত্ত্বিক এবং নাটকীয় বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করার ফলে কোন অস্বাভাবিক নাটকীয় মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করে না। এক কথায় নাটকীয়তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

চরিত্রের কোন অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ যেমন দেখা যায় না তেমনি তাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাইরে প্রকাশ পায় না। আমরা কেবল চোখে দেখতে পাই তাদের অসহায় ভাব ও দুঃখ যন্ত্রণা। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে দি ট্রায়াল অফ্ যোয়ান অফ্ আর্ক ছবিকে। এটি তৈরি হয় ১৯২২ সালে। ছবির প্রথম শটে আমরা দেখতে পাই যোয়ানের মা দুই ছেলের সাহায্যে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে। আমরা কেবল তাদের পা দেখতে পাই মুখ একবারও দেখা যায় না। পরে ক্যামেরা প্যান করলে দেখা যায় জনকয়েক ধর্মযাজক অপেক্ষা করছে। তারপরে দেখা যায় তিন-জনকে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় এবং যোয়ানের মা বলতে থাকে তারা যোয়ানের নামে মিথ্যে অপরাধের অভিযোগ এনেছে…এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে ইত্যাদি। দুটি শটেই ছবির পরিবেশ যেমন পরিষ্কার ধরা পড়ে তেমনি মনে হয় একটা অসহায় মেয়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশীল প্রভুত্বের ষড়যন্ত্র। এখানে একটা ড্রামের শব্দ শোনা যায়। অন্য কোন সঙ্গীত কিংবা কোন অর্থবহ শব্দ নেই। শুধু একটি ড্রামের শব্দ থেকে মনে হয় একটা ট্র্যাজেডীর ইঙ্গিত।

ছবির টাইটেল যোয়ানের মায়ের পিঠের ওপর শেষ হয়। ড্রামের শব্দ আবার শোনা যায়। যোয়ানের জেরা শুরু হবার আগে আর একবার ড্রামের শব্দ ও সেই সঙ্গে ট্রাম্পেটের শব্দও শোনা যায় এবং একমাত্র এটাই ছবির মিউজিক।

কোন মিউজিক না থাকলেও ছবির মধ্যে এমন একটা ছন্দ পাওয়া যায় যেটা মিউজিকের মতই অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী। প্রশ্নের ছন্দ ও উত্তরের ছন্দ দুই মিলিয়ে একটা

ছন্দোবদ্ধ রূপের সৃষ্টি হয়েছে। এক ধরণের ছন্দ যেন ছবিটির প্রতি শটে শটে ছড়িয়ে আছে। ক্যামেরা প্রায় সর্বক্ষণ যোয়ানের মুখের ওপর ধরে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে প্রশ্ন ও উত্তরের মারপ্যাঁচ, মাঝে মাঝে কচিৎ দু'একবার প্রশ্নকর্তাদের মুখ দেখা গেছে। এই প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে একটা ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। ক্যামেরা বারবার যোয়ানের মুখ থেকে প্রশ্নকর্তাদের মুখে ফিরে আসে। জেলের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, দরজা খোলা ও বন্ধ, তালাতে চাবি ঘোরানোর ফলে যে শব্দ, বন্দী যোয়ানের চেনের শব্দ, মাঝে মাঝে দূর থেকে কুকুরের ডাক—সব মিলিয়ে একটা সঙ্গীতের ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ও জবাব এটাই হল ছবির গঠন পদ্ধতি। জেরা শুরু হতেই আমরা দেখতে পাই যোয়ানের একটা হাত বই-এর ওপর এবং যোয়ান সত্যি বলবে বলে অঙ্গীকার করছে। তারপরে ক্যামেরা তাকে মিড্ শটে ধরে রাখে। প্রশ্নকর্তা পরপর অনেকগুলি প্রশ্ন করে, সে উত্তর দেয়। কিন্তু ক্যামেরা সর্বক্ষণ যোয়ানের ওপর এবং সেটাও মিড শট। পরবর্তী-কালে জেরার সময় এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটা উল্লিখিত ছন্দ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এখানে ইমেজের চেয়ে সংলাপের প্রাধান্যই বেশী। ব্রের্সো বলেছেন—"আমার ছবি সংলাপ থেকেই উদ্ভূত···সংলাপভিত্তিক-এর গঠন পদ্ধতি।" প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে এই ছবির আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে। সংলাপকে ঘিরেই ছবির গঠন, সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু হল যোয়ানের সংলাপ। সংলাপ থেকেই বোঝা যায় মেয়েটির মনের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস। একজন সমালোচক বলেছেন শব্দগুলি যেন একটা নির্দিষ্ট যুগের নয় এগুলির অর্থ অনন্তকালের।

জেরার দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরা একেবারে স্থির। অন্যান্য সময় ক্যামেরা মুভ করেছে। এ সকল ক্ষেত্রে ক্যামেরা বস্তুকে প্রায় অনুসরণ করে চলেছে যেমন বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কিংবা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় ক্যামেরা পাত্র-পাত্রীকে অনুসরণ করে এসেছে। আরো গোটা কয়েক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন ক্যামেরা টিল্ট ডাউন ও মুভ করে প্রথমে যোয়ানের পা, পরে সৈন্য কিংবা সন্ন্যাসীদের পা দেখান হয়েছে। একবার সেলের মধ্যে ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে দেখান হয়েছে চেনের ওপর। আর একবার ক্যামেরা যোয়ানের হাতকে অনুসরণ করেছে যখন সে ভূমি থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নেয়—যে পাথরটা জানলা দিয়ে যোয়ানের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। তারপরেই ক্যামেরা টিল্ট আপ করা হয়েছে যখন যোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে। এই মুভমেন্ট-গুলি মিলে একটা ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

ছবিটির প্রতিটি দৃশ্যে সময় ও দূরত্বকে যেন টুকরো টুকরো করে দেখান হয়েছে। আমরা কখনো বিচারকক্ষকে বা যোয়ানের সেলকে পুরো দেখি না। ক্যামেরা এক-বারও যোয়ানের সেলের চারদিকে দেখে না। বিচার দৃশ্যে কেবল তাদেরই মুখ দেখি

যাদের মুখে সংলাপ শুনেছি। অন্যান্য লোকের উপস্থিতি বোঝা যায় কিন্তু তাদের বিশেষ দেখা যায় না। কচিৎ যোয়ানের পেছনে উপবিষ্ট কিংবা প্রশ্নকারীদের পাশে কাউকে দেখা যায় তাদের মুখগুলি সম্পূর্ণ ভাবহীন। মানুষের মুখে যে সাধারণ স্বাভাবিক রেখা থাকে তাও দেখা যায় না। মনে হয় সকলে যেন একটা মুখোশ দিয়ে নিজেদের মন ও মুখ উভয়কে ঢেকে রেখেছে।

ছবিটিকে বলা যেতে পারে একদিকে গীর্জার কর্তৃত্ব ও অন্যদিকে ভগবানের মহিমা—এ দুয়েরই দ্বন্দ্ব। বিচারের শেষের দিকে বিশপের প্রশ্নের উত্তরে যোয়ান বলে—"What is church ? I will not submit myself to you or to your judgement," এখানে গীর্জার কর্তৃত্বকেও ভৎর্সনা করা হয়েছে। এক জায়গায় ব্রেসোঁ বলেছেন—"I see Joan with the eyes of a believer. I believe in the mysterious world upon which she opens the door and closes it.…"

যোয়ানের বিচারটা একটা চরম বাস্তব অবস্থা। কিন্তু এর অন্তরালে ঈশ্বরের মহিমা কি ভাবে কাজ করছে সেটাই প্রধান বিষয় হয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ চরম বাস্তবতা থেকে রসোত্তীর্ণ বিমূর্ত রূপান্তর করাটাই যেন ব্রেসোঁর উদ্দেশ্য। আরো দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

যোয়ানকে যে সেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে তারই দেওয়ালের গর্তের ভিতর দিয়ে চোখ রেখে তার ওপর স্পাইং করার দৃশ্য ধরা যাক। ক্যামেরা গর্তের মুখে রেখে অর্থাৎ যারা স্পাইং করছে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শটটি নেওয়া হয়েছে। ফল দাঁড়িয়েছে যোয়ানের অতি ক্ষুদ্র ইমেজ আর আশেপাশে পর্দা জুড়ে সমস্ত পরিবেশটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। শটটির এই অর্থ করা যেতে পারে যে যোয়ান কেবল শারীরিকভাবে বন্দী নয়, তার আত্মাও বন্দী। আর গর্তের মধ্য দিয়ে শটটি নেওয়া হয়েছে বলে যারা স্পাইং করছে তাদের মনের ভাবটিও ফুটে উঠেছে। একটা যেন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। এই ষড়যন্ত্র যেন শুধু যোয়ানের বিরুদ্ধে নয়—এটা যেন ঈশ্বরের মহিমার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। যোয়ান ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাসী আর গীর্জা তার ক্ষমতা ও প্রভুত্বে বিশ্বাসী।

ছবিতে ভারী জুতো ও চেনবদ্ধ যোয়ানের পা বারবার দেখান হয়েছে, ভারী জুতো ও চেনের ভারে যোয়ানের পা দুটো চলতে পারে না, হাঁটার মধ্যে যে কষ্ট বেশ বোঝা যায়—যদিও মুখে তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু ছবির শেষ দৃশ্যে আগুনে পুড়িয়ে মারবার আগে আমরা দেখতে পাই যোয়ানের পা ভারী জুতো ও চেন থেকে মুক্ত তারপরে তার মৃত্যু অর্থাৎ মুক্তি—আত্মার মুক্তি। পা, জুতো, চেন, কষ্টসাধ্য হাঁটাচলা, আগুনে পুড়িয়ে মারা—সব কিছু কঠিন বাস্তব, কিন্তু আত্মার মুক্তি হল—বিমূর্ততা যেটা বাস্তব ঘটনা থেকে জন্ম নিয়েছে।

এই ছবিকে রিয়ালিষ্টিক ছবির দলে ফেলা যায় না। কারণ এখানে বাস্তবতা (যেমন ইমেজ ও শব্দ) এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে—যেটা আমরা দেখি বা শুনি সেটা শুধু কতকগুলি বাস্তব ঘটনা নয়—সেটা যেন কেবল দেখা শোনার যোগফল নয়—তারও অতিরিক্ত কিছু অর্থাৎ একটা নতুন অর্থ। যেমন সৈনিক ও সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখান হয়েছে কেবল তাদের পা দেখিয়ে। আবার শুধু একটা শব্দ ব্যবহার করে ইমেজের রূপ দেওয়া হয়েছে। একটা গলা চীৎকার করে বলেছে—"ডাইনীকে পুড়িয়ে মারো" কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এটা একক শব্দ নয়—এটা জনতার দাবী। সাউণ্ড ট্র্যাকে-এর অর্থপূর্ণ আর একটি উদাহরণ—একেবারে শেষ দৃশ্যে আগুনের শিখার শব্দ।

এখানে ক্যামেরা কোণের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। জেরার দৃশ্য-গুলিতে বিশপকে সোজাসুজি কোণ থেকে ধরা হয়েছে। প্রতিটি শট একই দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। ইমেজের সাইজও একই ধরণের। যোয়ানকে কিন্তু বিভিন্ন কোণ থেকে ফটোগ্রাফ করা হয়েছে। সোজাসুজি কোণগুলি বুঝিয়ে দেয় বিশপ ও অন্যান্য প্রশ্নকারীরা (এখানে ষড়যন্ত্রকারী!) একপ্রকার দৃঢ়বদ্ধ ও তাদের সংকল্পে অটুট। আর ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যোয়ানকে দেখানোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যোয়ানের সংশয়পূর্ণ মন। এক এক সময় তার নিজের ওপর সংশয় জেগেছে সে কি সত্যি সত্যি ঈশ্বরের বাণী শুনেছে—না যা শুনেছে তা একটা স্বপ্ন। প্রশ্নকারীদের শটগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট ক্ষণস্থায়ী অথচ যোয়ানের ওপর ক্যামেরা অতি দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখা হয়েছে। ফলে যোয়ানের প্রতিটি খুঁটিনাটি অভিব্যক্তি যেমন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শোনা, প্রশ্নের জবাব, আবার প্রশ্ন, কিছুটা যতি, একবার চোখ তুলে তাকানো, একটু ঘাড় কাত করা, মাথা নীচু করা, আবার চোখ তুলে দেখা ইত্যাদি দারুণ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

জেরার দৃশ্যগুলিকে বস্তুতঃ ছবির প্রধান অংশ ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর এই অংশটিতে কেবল মিড্ শট ব্যবহার করা হয়েছে। যোয়ান প্রশ্নকারীদের মধ্যে ক্রশ কাটিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও ক্যামেরা কোণ প্রায় একই ধরণের। শটগুলিকে সুন্দর করার চেষ্টা একবারও দেখা যায় না। শটগুলিকে সুন্দর করলে হয়ত সংলাপগুলির গুরুত্ব কমে যেত অথবা সংলাপের দিকে দর্শকের মনকে আকৃষ্ট না করে ইমেজের সৌন্দর্যের দিকে বেশী আকর্ষণ করত। এখানে ওজুর সাথে ব্রেসোঁর কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলা যেতে পারে।

ছবিতে তিনটি প্রধান ঘটনাস্থল : (১) যোয়ানের সেল (২) বিচার কক্ষ (৩) পুড়িয়ে মারার দৃশ্য। সেল ও বিচার কক্ষটির একটা দারুণ ভূমিকা আছে—দুটো ঘটনাস্থলকেই দুটো চরিত্র হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে—ঘটনাস্থল দুইটি যেন এক একটা

অভিনেতা। দুটোই চার দেওয়ালে বন্ধ জায়গা। একটা থেকে অন্যটাতে কেউ সোজাসুজি যাতায়াত করে না—কোন না কোন মধ্যপথ এদের প্রতিমুহূর্তে পার হয়ে যেতে হয়েছে। যেমন যোয়ানের সেলে আসা যাওয়ার সময় একটা সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠা করতে হয়েছে। বিচার কক্ষে যাবার পথে একটা বারান্দা পার হতে হয়েছে। যাওয়া আসার একটা মুভমেণ্টও সোজা নয়—অনেকটা এঁকে বেঁকে যাওয়ার মত। ঘরগুলির দরজা জানলা একবারও সোজাসুজি ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা পড়েনি অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে রাখা হয়নি। দরজার একটা অংশ অথবা একটুখানি আভাস ফ্রেমের মধ্যে দেখা গেছে। এতে বন্দীর আত্মা যে মুক্তির জন্য ছটফট করছে সেটাই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাস্থলটি একটি খোলা জায়গা। খোলা জায়গা বুঝিয়ে দিচ্ছে মুক্তির ইঙ্গিত। শেষ দৃশ্যে ক্রশ চিহ্নের ব্যবহার। ঈশ্বরের মহিমা যে শেষ কথা এটা বুঝিয়ে দেয়। এই মহিমাতে হতাশা থাকে না, থাকে আশা, শাস্তি নয় পুরস্কার এবং শেষ কথা মৃত্যু নয় জীবন। সর্বশেষ শটটিতে দেখা গেছে অর্ধদগ্ধ কাঠের গুঁড়িটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নীচের দিকে চেনের অংশ দুটি দেখা যাচ্ছে। অর্ধদগ্ধ কাঠের গুঁড়িকে জড়িয়ে আছে চেন—যেন পার্থিব কোন ক্ষয়িষ্ণু কায়াকে চেন (প্রভুত্ব) জোর করে ধরে আছে কিন্তু কায়া অপার্থিব বস্তুতে বহু আগে লীন হয়ে গেছে। এই দৃশ্যের সঙ্গে আওয়াজ শোনা যায় আগুনের শিখা ও পোড়া কাঠের আওয়াজ। এই আওয়াজ দর্শককে দারুণভাবে অভিভূত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য কাণ্ট্রি প্রিস্টের শেষ শটটিও। ক্রশ চিহ্নের একটি দীর্ঘস্থায়ী শট।

অন্য দর্শন, অন্য সিনেমা : চোখ

গাস্তঁ রোবের্জ

ঠক, ঠক, ঠক, ঠক শব্দ শোনা যায়…

বিরামহীন কাল। এক পুলিশ অফিসার ধীর মন্থর পায়ে জেলখানার বিশেষ এক গারদের সামনে পাহারারত। ঠক, ঠক, ঠক, ঠক…অন্ধকারে একটা মুখ দেখা যায়, মানুষের মুখ (যদুনাথ, ওম পুরী অভিনীত)। একটি কঠোর মুখ, কাটাচেরার গভীর দাগ আর তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। লোকটি জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে একটা চিঠি লিখছে। ছবির পরিচয়লিপি ভেসে ওঠে : কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা—উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। ঠক, ঠক, ঠক, ঠক…কাল, পায়ের শব্দ, চোখ, গারদ, চিঠি। পরে বোঝা যায়,

ছবির গোটা নাটকীয় বিকাশকে ধরে রেখেছে এই কয়টি চিত্রপ্রতিমা। এই সংক্ষিপ্ত ও অভিঘাতী ভূমিকার মধ্যে এক অনবদ্য প্রতীকী ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। কিন্তু এই কাজে প্রবৃত্ত হবার আগেই উৎপলেন্দু এক বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে আমাদের টেনে নিয়ে যান কঠোর বাস্তবের ভেতর। যে চোখের কথা তিনি বলেন তা তখনও বিমূর্ত ও প্রতীকী হয়ে ওঠে নি, তা নিছক বাস্তবের। জনৈক ডাক্তার তাঁর ছাত্রদের বলছেন, 'প্রতি বছর ভারতে ১০,০০০ শিশু অপুষ্টি জনিত কারণে অন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন এ-র ঘাটতি।'

একই নিরাসক্ত বাস্তবতায় যে-গল্প এরপর কথিত হয় তা এক সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। ১৯৬০-এর ডিসেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশে দুজন রাজনৈতিক কর্মী শ্রীকাকুলাম ও ভূমাইয়ার (যথাক্রমে কৃষক ও স্কুল শিক্ষক) ফাঁসি হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তাঁরা তাঁদের চোখগুলো সহকর্মীদের দান করে দিয়ে গেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর চোখগুলো আর পাওয়া যায় নি। উৎপলেন্দুর গল্পেও যদুনাথের দান করে যাওয়া চোখদুটো যার পাওয়ার কথা সে পাবে না, ওগুলো নষ্ট করে ফেলা হবে। একজন তথাকথিত অপরাধীর (আসলে বিপ্লবীর) চোখকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়া যায় না, যদি তার চোখের সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গিও টিকে থাকে। কিন্তু যদুনাথের চোখ কী দেখে? যা দেখে তাই এই ছবির বিষয়বস্তু। সমালোচকরা অবিসম্বাদিত ভাবে এই ছবির যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন, 'বর্তমান সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে এক সুকঠোর মন্তব্য' বা 'মানুষের মৌলিক সৌভ্রাত্রের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের মরিয়া সংঘাতের এক সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত চিত্রণ', তা নিয়ে আমি কোন পর্যালোচনা করছি না। 'চোখ' যে প্রস্তাবিত 'অন্য' সিনেমার একটা সম্ভাব্য নমুনা হতে পারে এটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। শুধু যে প্রথাগত মাপকাঠিতেই 'চোখ' একটা অসাধারণ ছবি তা নয়, অন্য দর্শনের (ভৌত ও আদর্শগত উভয়ত) দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ছবির ভিন্ন আঙ্গিক, এ হল এক ভিন্ন সিনেমা। কয়েকজন সংবেদনশীল সমালোচক এই ছবির এক আধটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই ছবির ত্রুটি বলে ধরেছেন। আমি দেখাবো এগুলো মোটেই কোন ত্রুটি নয়, তা 'অন্য' সিনেমার বিশেষ গুণ বা ধর্ম।

'চোখ'-য়ের সূচনা ও সমাপ্তির দুটো ছোট খণ্ডাংশ গুণ বা ধর্মের দিক দিয়ে সমস্ত ছবি থেকে আলাদা। সূচক দৃশ্যটি তার সমস্ত বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ উপাদান নিয়ে বিমূর্তধর্মী ও তা প্রতীকী ব্যাখ্যার দাবী রাখে। যেন ব্রেসঁর রীতি। সমাপ্তি দৃশ্যটি কাব্যিক ও অধিবাস্তববাদী, যা ইয়াঙ্কোর কোন কোন দৃশ্যকে ও অবশ্যই সত্যজিতের 'অশনি সংকেত'-এর সমাপ্তিকে মনে পড়িয়ে দেয়। সূচক দৃশ্যটিতে কালোর প্রাধান্য, সমাপ্তি দৃশ্যটিতে সাদার। সূচনার একঘেয়ে ঠক ঠক ঠক ঠক ধ্বনি ভৌত স্তর থেকে আদর্শগত স্তরে নান্দনিক উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তির আবহসঙ্গীতে রূপান্তরিত। এই উল্লম্ফন অনায়াসে

ও বিনা ব্যয়ে ঘটে নি। অজস্র বেহালা যোগে এক ঐকতান সৃষ্টি করতে হয়েছে। এই সঙ্গীতও এক ভিন্ন মাত্রার : তা বেটোফেনের ষষ্ঠ সিম্ফনি দ্বারা অনুপ্রাণিত। গোটা ছবি জুড়ে সঙ্গীতের বিদেশী অনুপ্রেরণার আরো উদাহরণ আছে। যেমন, ডঃ মুখার্জীর (অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত) অন্তর্চিন্তার অংশে যে আবহসঙ্গীত (বাঁশির সুর) তা মোজার্টের কিছু টুকরো নকশার সাথে মিশে যায়। কিন্তু উৎপলেন্দুর ছবির সমাপ্তি, যার একদিকে অধিবাস্তব চিত্রপ্রতিমা : একদল শ্রমিক পুলিশের সাথে সংঘাতে উদ্যত, আর অন্যদিকে ষষ্ঠ সিম্ফনির মতো আবহসঙ্গীত, সমগ্র ছবিটিকে এক আন্তর্জাতিকতার স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে শোষিত শ্রমিকদের সৌভ্রাত্র দৃশ্যটির ফ্রেম ছাড়িয়ে, ছবির গল্পস্থল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

এই দুই খণ্ডাংশ এই তথ্যমূলক গল্পটিকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ দেয়—তা হল গল্পটির উৎপলেন্দু-ইয় ব্যাখ্যা। আর এই দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী সময় জুড়ে ছবিটি কঠোর বাস্তবের নিষ্করুণ চিত্রপ্রতিমায় দর্শকের দৃষ্টিতে আঘাত করতে থাকে। বন্দী যদুনাথের চোখদুটিকে বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও বস্তুগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর, তবেই, উৎপলেন্দু ওই চোখের পেছনে যে দর্শন ক্রিয়াশীল তাকে উদ্‌ঘাটিত করেন। তারপর চোখ দুটোকে আক্ষরিক অর্থেই ফেলে দেওয়া হয়। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য তখন সাধিত হয়ে গেছে, যে উদ্দেশ্য হল ছবির সমাপ্তিতে যে আশার আলো তাকে একটা বস্তুগত ভিত্তি দেওয়া। ছবির গল্প ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, শ্রমিকদের প্রত্যাশিত বিদ্রোহ এবার দেখা যায়। তখন আমরা আর চোখ বা কর্নিয়ার স্তরে পড়ে নেই, দর্শন বা দৃষ্টির স্তরে চলে এসেছি। এই দৃষ্টিকোণ বক্তৃতা বা উন্মত্ততার স্তরে নেমে আসবে এমন কোন আশংকা নেই। কেননা তার শিকড় বস্তুসত্যের খুব গভীরে চলে গেছে।

সিনেমা হলে বসে মৎস্যচাষে ভারতের সাফল্য সম্পর্কে ফিল্মস ডিভিশনের একটা তথ্যচিত্রের সঙ্গে 'চোখ' দেখা চলে। এই তথ্যচিত্রে দেখা যায়, মৎস্যচাষে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলনের ফলে ভারত এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধনী দেশে সুস্বাদু সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি করছে। প্রায় এক ডজন দেশে সম্পন্ন ব্যক্তিদের পার্টিতে মহার্ঘ ভারতীয় চিংড়ির খানা খেতে দেখা যায়। ধারাবিবরণীতে বলা হয়, ভারত এইভাবে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করছে। এরপর, 'চোখ' ছবিতে দেখা যায়, ভারতীয় শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে। তাদের অনেকেই অপুষ্টির শিকার। ওদিকে গলদা চিংড়ি রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা…১৯১৫ সন নাগাদ জারশাসিত রাশিয়ার অবস্থার কথা মনে আসে। ছবির সমাপ্তি-দৃশ্যের আশাপ্রদ সঙ্গীতের মধ্যে দর্শক সূচক দৃশ্যের ঠক ঠক, ঠক ঠক ধ্বনি শুনে যেতে থাকেন। প্রকৃতই এক অপ্রতিরোধ্য পদ্ধতিকে এই ছবিতে কাজে লাগানো হয়।

অন্ত সিনেমা শুধুই সেই সিনেমা নয় যা অন্ত সমাজের কথা বলে। তা শুধুই সেই সিনেমা নয় যা কোন নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার নিন্দা করে। অন্ত সিনেমা হল ভিন্ন কিছু। অন্ত সিনেমার যথেষ্ট উদাহরণ না থাকায়, যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম কোন একটা বিশেষ ছবিকে ছবি হিসেবে ভিন্ন করে তোলে আপাতত শুধু সেগুলোকেই চিহ্নিত করা যায়। কেননা, নতুন সিনেমা কেমন হওয়া উচিত তা আগে থেকে নির্ধারণ করার মতো কোন সূত্র নেই। তা ছাড়া আমরা কোন নজিরবিহীন অন্ত সিনেমার সন্ধানে ব্রতী নই। তাহলে, 'চোখ'-য়ের মধ্যে অন্ত সিনেমার কী কী লক্ষণ রয়েছে?

প্রথমত 'চোখ' হল আশার ছবি। আশা বলতে এই আশ্চর্য নিশ্চয়তা যে, জীবনের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, যা উত্তম তার জয় হবে। যে কোন মহান ছবি জীবনের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার বিরোধী যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে দেখিয়েও এই বাধাবিপত্তি যে কোন সমাজের নর-নারী ও শিশুর অপরাজেয় সত্তাকে পরাস্ত করতে পারবে না—উত্তরণের এই সুনিশ্চয়তা রেখে যায়। যদিও সাম্প্রতিক সিনেমায় নিরাশার-ই প্রাধান্য, কখনো কখনো সেখানে আশার দেখা মেলে, কিন্তু হয় এই আশা অন্যের মুখাপেক্ষী (যেমন ভগবান) নয় এই আশা পূরণের সম্ভাবনা কোন অজানা ভবিষ্যতে নিহিত। 'চোখ' ছবিতে যে আশা তা ভিন্ন ধরনের : এই আশা বর্তমান ও তা জনগণের হৃদয়ে বর্তমান। এই আশাকে এখনই বাস্তবায়িত করে মানুষ তার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক অধিকাংশ ভাববাদী ছবির তুলনায় 'চোখ'-য়ের একটা বিশিষ্ট বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ রয়েছে। বস্তুবাদী সিনেমা পর্দায় ফিল্ম ও বাস্তবতাকে এমন ভাবে মেশাতে চায় না যেন পর্দা এক জাগতিক জানালা। কোন বস্তুবাদী সিনেমা নির্দিষ্ট এক সমাজ সম্পর্কে বিশেষ এক বক্তব্য হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে। 'চোখ' ঠিক তাই করেছে।

তৃতীয়ত 'চোখ' হিংসাকে শৈল্পিক বা নান্দনিক করে উপস্থাপিত করে না। হিংসাকে গ্ল্যামারাস, মনোরম, জরুরি ও এমন কি কাম্য করে তোলা হল এক ফ্যাসিবাদী নীতি এবং অধিকাংশ প্রচলিত ছবি এ-কাজে খুবই পটু। যেমন 'প্যাটন', 'ম্যাশ', 'শোলে' ও 'গান্ধী'। 'চোখ' কিন্তু হিংসাকে মনোরম করে তোলে না, বরং অযৌক্তিক ও অসাংগঠনিক হিংসার বিরোধিতা-ই করে।

চতুর্থত 'চোখ' ব্যক্তিমানসের কোন ছবি নয়। সম্ভবত এটাই এ-ছবির সবচেয়ে স্পষ্ট লক্ষণ এবং অদীক্ষিত দর্শককে এটাই সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ফেলে। কেননা, বুর্জোয়া সিনেমার ধারণায় লালিত কোন দর্শক যখন যদুনাথের কাহিনীর মতো মর্মস্পর্শী কোন গল্পের মুখোমুখি হন তখন তিনি ওই গল্পের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন 'চোখ'-য়ে কাহিনীর বিকাশ সেইভাবে হয় নি। ফলে দর্শকের ধারণা হয়, পরিচালক তাঁর ছবির

বিভিন্ন সম্পর্ক ও আবেগের সূত্রকে ঠিকমতো ধরিয়ে দেন না, এবং তা নিশ্চয়ই ছবির একটা বিশেষ ত্রুটি : যদুনাথের মৃত্যুকে ঘিরে যে আবেগগত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে যথেষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হল না, যদুনাথের চোখ নষ্ট করার মধ্যে যে আবেগগত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল তাকেও সংযত রাখা হল। আমি বলি, এটা ছবির কোন ত্রুটি নয়, এই মনোভাব পরিচালকের দর্শনের অন্তর্গত। কেননা, উৎপলেন্দুর বিষয়বস্তু তো যদুনাথের মৃত্যু বা তার চোখ নষ্ট করা নয়, দুর্নীতিপরায়ণ (ব্যতিক্রম আছে) শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে দরিদ্র, শোষিত শ্রমিকদের সংঘাত হল তাঁর বিষয়বস্তু। ছবি শেষ হয়ে যাবার পর এই বিষয়ের রেশ-ই দর্শকের মনে লেগে থাকা উচিত। অধিকাংশ বুর্জোয়া ছবি দর্শকের জন্য এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, দর্শক যদি ওই ছবির জগতের বিভিন্ন দৃশ্যের (যার সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছুই করার নেই) প্রতি গভীর প্রতিক্রিয়া দেখান তাহলেই তিনি যথেষ্ট করলেন। ছবি শেষ হওয়ার সাথে সাথে দর্শকের দায়িত্বও শেষ। যেমন : 'বাইসিকল থীভ্‌স'। 'চোখ' কিন্তু দর্শককে অন্য দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

পঞ্চমত 'চোখ' একটা শিক্ষামূলক ছবি। এই ছবি সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে শুধু সেই সমস্যার কয়েকটা প্রত্যক্ষ দিককে উগ্র ভাবে তুলে ধরার জন্য নয়, এইসব সামাজিক সমস্যার পেছনে ক্রিয়াশীল কারণকে বুঝে ওঠা ও ব্যাখ্যা করাই তার উদ্দেশ্য।

'চোখ'-য়ের বিনোদনমূল্য আরো বেশি হলে ভালো হত। সম্ভবত ছবিতে বিনোদনের প্রসঙ্গে উৎপলেন্দু এখনও আগ্রহী নন। 'অন্য' সিনেমাকে বিনোদনকর হতে হবে। 'চোখ'-য়ের পরিচালকের এইরকম আশংকা করার কারণ নেই যে, বিনোদন তাঁর ছবিতে বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ ছবিতে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থেকে দর্শকের মনোযোগকে সরিয়ে নিতে পারে। এ-রকম ঘটবে না, কেননা তিনি যথেষ্ট সচেতন ও পরিমিত এক চলচ্চিত্রকার। সুগভীর বিনোদন প্রাপ্তির প্রয়োজন প্রচলিত সিনেমার চাইতে অন্য সিনেমায় সম্ভবত আরো বেশি কেননা অন্য সিনেমা অনেক বেশি পরিপূর্ণতার দাবিদার।

অন্য সিনেমা, তা যত ভিন্ন-ই হোক না কেন, স্বয়ম্ভু হতে পারে না। তা চলচ্চিত্রের প্রচলিত ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ থেকে গ্রহণ করে, যা গ্রহণ করে তার গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে অন্য দর্শনে জারিত করে মৃণাল সেনের রাজনৈতিক সিনেমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থেকে উৎপলেন্দু অবশ্যই উপকৃত। এবং উৎপলেন্দুর সিনেমার সঙ্গে সত্যজিতের সিনেমার (তাও অন্য সিনেমার এক উদাহরণ) একটা সম্পর্কও লক্ষণীয়। নান্দনিক পরিমিতি, বাহুল্যবর্জিত শৈলী, ব্যবহৃত চিত্রপ্রতিমা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস (বিশেষত মুখমণ্ডলের সুনিপুণ ব্যবহার), আবহসঙ্গীতে আবেগ ও উষ্ণতা প্রভৃতি কয়েকটি সাদৃশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এমনকি এই ছবির পরিচয়লিপিও যেভাবে লেখা

হয়েছে তা সত্যজিতের বিশিষ্ট অক্ষরাঙ্কনকে মনে পড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, সত্যজিত-ই এই ছবির পরিচয়লিপি এঁকেছেন। ছবিটি কিন্তু পুরোপুরি উৎপলেন্দুর।

উগেৎসু ॥ দর্শন ও আঙ্গিক

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

> "The best of silks, of choicest hue
> May change and fade away,
> As would my life, Beloved One,
> If thou shouldst prove untrue..."

জাপানী পুরাণে ছয় স্বর্গ আর এক মর্ত্য নিয়ে একক ভুবনের এক কল্পনা আছে। যার নাম 'কামনার ভুবন'। এর শীর্ষে অবস্থান করে মার। আরো উপরে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করে সন্ধান মেলে বুদ্ধের। বুদ্ধ আর মারের 'ভুল-কামনা'র দ্বন্দ্ব আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত জাপানের সামগ্রিক অবচেতনে কোন রেখাপাত করে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু, কেন্‌জি মিজোগুচি তাঁর 'উগেৎসু মনোগাতারি' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যুদ্ধোত্তর আধুনিক কালে। তাঁর চলচ্চিত্রের মূল বুনোন তৈরী হয় ঐ দ্বন্দ্বের মধ্যে। তিনি তাঁর কাহিনীকেও ফিরিয়ে নেন নির্মম সামুরাইদের বিচরণভূমি ষোড়শ শতকের অরাজক অস্থির জাপানে। যখন নোবুনাগা বা শিবাতার মতো যুদ্ধোন্মাদদের হাতে বিপন্ন মানবিক অস্তিত্ব। 'উগেৎসু'র সারা অংশ ছেয়ে থাকে দুঃস্বপ্নের অস্বস্তিকর তামসিকতা। চলচ্চিত্রের বহিরঙ্গে জাপানের সুপ্রাচীন নো-নাটকের বস্তুবাদী 'যুগেন' বা রহস্যময় তিমিরের অনুসৃতি। চলচ্চিত্রের শুরুতে নো-নাটকের প্রোলোগের মতো অন্ধকার থেকে এক সন্ত্রস্ত কণ্ঠ আগত পরিবেশের পূর্বাভাস জানিয়ে যায়।

'উগেৎসু' চলচ্চিত্রে দুই কল্পকাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন মিজোগুচি। 'আসাজি গা যাডো' ও 'যাসেই নো ইন'। কিন্তু, এ চলচ্চিত্রে মানবিক গভীরতা ও চিরন্তন দ্বন্দ্বকে মূর্ত করে যে সূক্ষ্ম আন্তর বাস্তবের প্রবাহ তা মিজোগুচির আপন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর। জীবনকে সাধারণ নিয়মাধীন দেখার বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর চলচ্চিত্র বৈচিত্র্যে ও বৈপরীত্যে জীবন রহস্যের পর্যবেক্ষণ। মানুষের লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, ভালবাসা, ত্যাগ বা

উৎসর্গ সব কিছু থেকেই জীবনের তাপউত্তাপ গ্রহণ করেছেন মিজোগুচি। হয়তো কোথাও আয়রনির এক প্রচ্ছন্ন আভাসে। জাপানী নন্দনতত্ত্বের 'মর‍্যাল জিওমেট্রি'র মতো মিজোগুচি তাঁর দৃষ্টিকোণের দূরত্ব গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ক্যামেরা লং-শট থেকে ছুটে এসে মিড-ক্লোজের গণ্ডী পার হয়েছে এমন নজীর খুব বেশি পাওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সত্যজিৎ রায়ের মতো তিনিও মিড-ক্লোজের ধ্রুপদী শিল্পী। 'উগেৎসু'-র শিল্পকর্ম সেই আঙ্গিক ও দর্শনের অন্বিত প্রকাশ। প্রাচীন জাপানের প্রতি এক গভীর মমত্ববোধে মিজোগুচি বহুবার অতীতকে জাগ্রত করেন তাঁর চলচ্চিত্রে। হয়তো শ্রেষ্ঠ দক্ষতায়। কিন্তু, অতীত যেভাবে তাঁর সমকালের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা আরো বিস্ময়কর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী স্মৃতিতে কুরোসাওয়ার মতো তাঁরও চিন্তারাজ্য আন্দোলিত ছিল। তিনি সভ্যতার পতন দেখেছিলেন। নীতি-বিবেক বর্জিত মানুষের মূল্যবোধের ভাঙন। শিকড়হীন সত্তার অসহায়ত্ব। কিন্তু, এই অবক্ষয়ের কাছে তাঁর শিল্পের নতি-স্বীকার ছিল না। জাপানের প্রাচীন প্রাজ্ঞ মনীষী কোবোদাইশির মতো ঐ দুই মহান চলচ্চিত্রকার জানতেন পরিবর্তনই শুধু চিরন্তন। প্রবহমান জীবন। জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দ। এর মধ্যেই মানবিক গভীরতা মেপেছেন মিজোগুচি। 'উগেৎসু' চলচ্চিত্রে সামন্ততান্ত্রিক যুগের মূল্যবোধ, গ্রামের গোষ্ঠিজীবন, পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব, বিশ্বাস ও সততা, আনুগত্য ইত্যাদির পাশাপাশি উচ্চাশার জন্য তীব্র অসহিষ্ণুতা, মূল্যবোধ বিকিয়ে দেওয়া, বাধা অতিক্রমের আনন্দ, প্রলোভনের কাছে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ, নতুন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অবিকৃত সত্যে কালান্তরিত হয়। এ যেন পুরনো হোকুসাই scroll আলগা করে আধুনিক ব্যক্তিমানস দেখে নেওয়া।

'চিকামাৎসু' অথবা 'ওহারু'-র মতো 'উগেৎসু'তেও ভয় অথবা অনিশ্চিতির প্রেক্ষাপটে মূল চরিত্রগুলি ধরা পড়ে একটা transition-এর মধ্যে। দুটি সমান্তরাল বৃত্ত তৈরী হয় কাহিনীর নক্শায়। গ্রাম থেকে শুরু, গ্রামেই ফিরে আসা। দরিদ্র দুই কুমোর গেঞ্জুরো আর তোবেই সামুরাই লুণ্ঠিত নিরাপত্তাহীন গ্রাম ছেড়ে সপরিবারে পাড়ি দেয় শহরের দিকে। তৃণভূমি, অরণ্য, কুয়াশায় আচ্ছন্ন হ্রদ পেরিয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথ। আলো আঁধারি দেখে মনে হয় 'উকিওয়ে'র কাঠখোদাই শিল্পীদের রচনা। যাত্রা শেষে শহরের লং-শটটিকে মিজোগুচি আলোয় চুবিয়ে মরীচিকা করে দেন। দুই বন্ধু প্রলোভনের হাতছানিতে শহরে আসে। গেঞ্জুরো ভাবে তার চিনামাটির পাত্রের বিনিময়ে বড়রকম আর্থিক লাভের কথা। ক্ষমতার জন্য হন্যে হয়ে তোবেই আপন জীবিকা বর্জন করে সামুরাই হতে চায় (কুরোসাওয়ার 'সেভেন সামুরাই' চলচ্চিত্রে মিফুনের চরিত্রটিও আসলে রুটির জন্য এক গ্রামবাসীর সামুরাই হয়ে যাওয়া)। এখানে being এবং becoming-এর প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু, নারীচরিত্র দুটি তার জন্য চূড়ান্ত মূল্য দেয়।

গেঞ্জুরোর বৌ মিয়াগি দস্যুভয়ে গ্রামের পথে ফিরে যায়। দুর্ভিক্ষে তার নিষ্ঠুর মৃত্যু হয় এক টুকরো খাবারের জন্য। সামুরাই হবার উদগ্র নেশায় তোবেই তার বৌ ওহামাকেও ত্যাগ করে। নির্জন অরণ্যে লুব্ধ শকুনের মতো নিঃশব্দে ছোঁ মেরে হাজির হয় কয়েকজন সামুরাই ওহামার কাছে। দুটি মাত্র চিত্রকল্পের প্রয়োগসীমায় দুঃসহ এক নির্যাতন বিধৃত হয়ে যায়। এরপরে ওহামা শহরে গিয়ে বেশ্যাপল্লীতে জায়গা করে নেয়। আপন স্বার্থে তোবেই যুদ্ধরত দুই পক্ষের অন্যতম নায়ককে চোরের মতো গিয়ে খুন করে। বিহ্যাভিয়রিস্টিক ডিটেলের এক অনন্য প্রয়োগে সে তার মেরুদণ্ডকে মাটিতে মিশিয়ে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে অপর পক্ষের নায়কের পদলুণ্ঠিত হয়। পুরস্কার স্বরূপ গ্রামের মৃৎশিল্পী সামুরাই-সর্দারের শিরোস্ত্রাণ পরে। এই শাণিত শ্লেষ পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত চেহারা নেয় যখন শহরের বেশ্যাপল্লীতে সদলবলে বিজয়োৎসবে মত্ত তোবেই শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীর ঘরে পৌঁছয়। আলোচ্য কয়েন্সিডেন্স আধুনিক কোন চলচ্চিত্রকার গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এরই অমোঘ প্রয়োগ একেবারে নিরাবরণ করে দেয় শিকড়হীন সত্তাকে। becoming-এর বিপজ্জনক ভূমিকাকে। তবে এটাই মিজোগুচির চলচ্চিত্রে শেষ কথা হতে পারে না। অদ্ভুত এক মানবিক প্রত্যয়ে তোবেই আর ওহামা নতুন করে শুরু করতে চায়। ওহামা তোবেইকে বলে "আমাদের এ লাঞ্ছনা বৃথা যায় নি।" গ্রামের পথে রওনা দেয় ওরা। পিছনে ফেলে আসে সামুরাইয়ের খোলস। এ চলচ্চিত্রের এটা একটা বৃহৎ অর্জন। এর সমান্তরাল গেঞ্জুরোকে আনা হয় মেটা-ফিজিক্যাল স্তরে। তাকে ঘিরে এ চলচ্চিত্রে দুই অলৌকিকতার প্রয়োগ। শহরের কেনাবেচার হাটে তাকে আমন্ত্রণ জানায় অতৃপ্ত রাজ-কুমারীর প্রেত। গেঞ্জুরো পৌঁছে যায় বাজার থেকে প্রাসাদে। রাজকুমারী ওয়াকাসার আতিথ্য ও প্রেমের সম্মোহনে সে মগ্ন হয়। কাগজ লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ছায়া ঘেরা প্রাসাদ কক্ষে গেঞ্জুরো বিষণ্ণ রাজকুমারীর সঙ্গীত শোনে। কুমোর তার মাটি ফেলে রেখে শহরের অভিজাত কৃষ্টির সহবত নেয়। চলচ্চিত্রে becoming-এর অপর প্রসঙ্গ এইখানে। ওয়াকাসা যখন গেঞ্জুরোকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন দেয়ালে একটা ভয়ঙ্কর সামুরাই-মুখোস হেসে ওঠে। কিন্তু ভুল ভেঙে দেয় এক বৌদ্ধ শ্রমণ। অরণ্যপথে সে গেঞ্জুরোকে জানায় ওয়াকাসা অন্য পৃথিবীর। অন্য বাস্তব। গেঞ্জুরো তার সারা দেহে বুদ্ধের নাম লেখে। তরবারি নিয়ে প্রেতের মুখোমুখি হয়। সমগ্র সিকোয়েন্সের প্রয়োগকলা মনে করিয়ে দেয় জেন কবি রিকিয়ু-র বুদ্ধ স্মরণে শেষ কবিতার 'sword of eternity'-র কথা। সেই চিরন্তন এসে অতীতের মায়াকে আঘাত করে। ওয়াকাসার সঙ্গীতের 'সেরা রেশম, বাছাই রঙ' জীবনের মতোই পরিবর্তিত হয়, হারায়। গেঞ্জুরো জেগে উঠে অতীতের ভগ্নস্তূপ দেখে। সে-ও ফিরে আসে গ্রামে। তখন মিয়াগির প্রেত দীপ হাতে দরজা খোলে উষ্ণ অভ্যর্থনায়। স্বামীপুত্রের জন্য গৃহের আরাম সযত্নে প্রস্তুত করে। কিন্তু,

ভোরের আলো এসে সেই ছবিকেও মুছে দেয়। যে আলো চিরন্তন। তাঁর প্রিয় চিত্রকর উতামারোর অনুপ্রেরণায় প্রথম জীবনে রেশমের পটে গেইশার ছবি এঁকেছেন মিজোগুচি। চলচ্চিত্রের ক্যানভাসে নারী মনস্তত্বের রহস্য তাঁর জরুরী অনুসন্ধান ছিল। 'উগেৎসু' চলচ্চিত্রে প্রাসাদের কর্ত্রী সুন্দরী অভিজাত ওয়াকাসা এবং দরিদ্র ঘরের সাধারণ মিয়াগি—প্রেমিকা ও স্ত্রী—দুটি প্রান্তিক চরিত্র একই বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার আর্তিতে এবং ভালবাসার কারণে একই বিনাশে সমান্তরাল হয়ে যায়। চিরন্তন জীবন লুকিয়ে থাকে এই আয়রনিতে। মিজোগুচির চোখে জীবনের গতিপ্রকৃতি এই। 'লাইফ অব ওহারু'তে পুরুষশাসিত সমাজে সর্বস্ব খোয়ানো জরাগ্রস্ত বেশ্যা জীবনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে উপাসনা মন্দিরে গিয়ে হাজার বুদ্ধের হাসি দেখে।

২

চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পকে মিজোগুচি তুলনা করতেন ম্যাজিক লণ্ঠনের কম্পিত আলোক-শিখার সঙ্গে। আধুনিক metaphor তাঁর খুব বেশি প্রয়োজন হয়নি। 'উগেৎসু'র দৃশ্যগুলিকে রচনা করে যে বিশুদ্ধ আঙ্গিক ও নিটোল সৌন্দর্যচেতনা তার মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় জাপানের সুপ্রাচীন চা-উৎসব, উদ্যান রচনা, পুষ্পবিন্যাস বা হাইকু কবিতার নান্দনিক সংযমে। ওজুর মতো এক দৃশ্য—এক শট তিনি মেনে নিয়েছিলেন। জীবনকে দেখেছেন স্থির ক্যামেরার সম্ভ্রমে। কিন্তু, পরিবেশ যেখানে চূড়ান্ত দাবি করে সেখানে ক্যামেরাকে জায়গা বদল করে অথবা ছুটিয়ে অসাধারণ প্রয়োগফলে পৌঁছে যান মিজোগুচি। 'উগেৎসু' চলচ্চিত্রে গোড়ার দিকে সামুরাইদের আক্রমণে ভয়ে পালানো বিশৃঙ্খল কুমোর পাড়ায় শুধু একা গেঞ্জুরো কাঁচা মাটির পাত্রগুলোকে বাঁচানোর জন্য ছটফট করে। সারাক্ষণ মিড্-ক্লোজে রাখা এই দৃশ্যে ক্যামেরা শুধু একবার লাফ দিয়ে গেঞ্জুরোর মুখের কাছে সরে এসে তার গলার অস্থির ধমনীর ওঠানামা দেখায়। অর্গানিক ইউনিটির দিক দিয়ে এতখানি চলে আসা একটি সামাজিক নিগ্রহের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। যেখানে রুটির প্রশ্নে একটা দরিদ্র পরিবারের গভীর উদ্বেগ জড়িত। তবে আলোচ্য প্রয়োগবিধির সম্ভবত সেরা নিদর্শন ওয়াকাসা ও গেঞ্জুরোর প্রণয়ের বহির্দৃশ্য। মিজোগুচি সিকোয়েন্সকে সাজান এইভাবে :

মিড্-লং শট—প্রস্তর-উদ্যানের নিভৃত জলাধার। জলের ধূমায়িত বাষ্পরাশির মধ্যে প্রণয়ীযুগল পরস্পরের কাছে ভেসে আসে।

লং-শট— চন্দ্রালোকিত উদ্যানের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। দূরে শুভ্র রেশমের গালিচার উপর ওরা একে অপরকে তাড়া করে। কিমোনোর ঋজু প্রান্তদেশ চক্রাকারে ওদের চারপাশে ঘোরে।

টিল্ট ক্লোজ-আপ—ওদের উত্তেজিত মুখ আকাশের পটভূমিতে।
লং-শট—   তৃণভূমির দূরপ্রান্তে ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখা যায়।

এখানে লং ও ক্লোজের প্রয়োগসৌন্দর্য এমনভাবে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে অনেকেই ভুলে যান যুদ্ধোত্তর আধুনিক চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাকিং রয়েছে এই সিকোয়েন্সেই। মিজোগুচির ক্যামেরা প্রায় বিরল দৃষ্টান্তে প্রস্তর-উদ্যানের মিড্-লং শট থেকে উদ্যানের তৃণভূমির লং শট পর্যন্ত দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে আসে। দেখে মনে হয় চলচ্চিত্রের এক দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যে নয়, চিত্রকলার পাশাপাশি দুটি পটে মধ্যেকার সীমারেখা সমেত ক্যামেরা ট্র্যাক করে যায়। চলচ্চিত্রের দক্ষ ভাষায় scroll বা কাকেমোনোর সম্পূর্ণ প্রতিভাস নির্মাণ করে নেন মিজোগুচি। চলচ্চিত্রে আলো এবং ছায়াকে তিনি বিন্যাস করেন চিত্রকলার আয়তনিক বেধে। তাঁর ফেলে আসা রঙ তুলির অভাব পূরণ হয়ে গিয়েছিল এইভাবে। পরিবেশ রচনার মধ্যে চলচ্চিত্রের আত্মাকে খুঁজেছিলেন তিনি। সেখানেও চলচ্চিত্রকার মিজোগুচি ঋণী হয়েছেন চিত্রকর মিজোগুচির কাছে। আর কারো চলচ্চিত্রে প্রকৃতি এমন ঐকতানিক হয়ে ওঠেনি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে। রেনোয়াকে মনে রেখেও একথা বলা যায়। 'উগেৎসু'তে দীর্ঘপত্র ঘাসের বনের কোলে মিয়াগির বিদায়গ্রহণ দৃশ্যে প্রকৃতির বিষণ্ণতা অথবা হ্রদের উপরে ভেসে আসা নৌকা থেকে আহত চাষীর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বলার পর আগ্রাসী কুয়াশার বিপদ-সংকেত রচিত হয় জাপানী চিত্রকলার নিজস্ব মেজাজে। 'ওহারু'র মতো 'উগেৎসু'তেও আলোর সূক্ষ্মতা ও বস্তু সন্নিবেশের ভারসাম্য কখনও ওয়াশ ছবির পর্যায়ে পৌঁছয়। এটাই মিজোগুচির মাধ্যমের অনায়াসত্ব। 'উগেৎসু'-তে দুটি আলাদা বাস্তব প্রকাশিত হয় একই চলচ্চিত্রের কাঠামোয়। (আলোর অন্য টোনালিটি নিয়ে এ চলচ্চিত্রে কাজ করেন 'রাশোমন'-এর আলোকচিত্রী মিয়াগাওয়া)। অলৌকিকতার পর্বকে এক বাস্তবের সমতলে রেখে মিজোগুচি প্রয়োগরীতি পাল্টে দেন। রহস্যের জগৎ গড়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিত অন্ধকারে, নো-নাটকের মতো ছান্দিক চলাফেরায়, নেপথ্যে নো-বাঁশির শিউরে ওঠা সুরে এবং ওয়াকাসার নীরব যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে। আমাদের গগন ঠাকুরের আঁকা মৃত্যুর মতো ওয়াকাসার ললাট ও চোখ ছাড়া সারা মুখ অবগুণ্ঠিত থাকে হালকা রেশমে কিংবা অন্ধকারে। ম্যাচিকো কিয়োর চোখের বিষাদ মিজোগুচির কাজে লাগে। প্রাসাদকক্ষের আভ্যন্তরীণ শটগুলিতে ক্যামেরা প্রায় সিলিং-এর সমান উচ্চতা থেকে নীচে গেঞ্জুরো ও ওয়াকাসাকে দেখে। আশ্চর্যজনকভাবে সিলিং-এরও কিছু অংশ ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইটুকু পরিপ্রেক্ষিত হারানো মিজোগুচির পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিজোগুচি তাঁর মহত্তম ক্রেন-শটটি প্রয়োগ করেন একেবারে চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে মিয়াগির সমাধিতে যখন তার শিশুপুত্র ফুল সাজিয়ে দেয়। মৃত্যু ও নতুন জীবনকে পাশাপাশি রেখে মিজোগুচির

ক্যামেরা কিছুটা ওপরে ওঠে। প্রসারিত দৃশ্য দূর প্রান্তরে কর্মরত দুটি মানুষকে দেখায়। জীবন এগিয়ে চলে। মিজোগুচি তাঁর চলচ্চিত্রের বর্তমানকে সেই প্রবাহে সামিল করেন। তাও দর্শন বলে 'The present is the moving infinity'।

জনতা যখন নায়ক : ব্যাটলশিপ পোটেমকিন এবং…

মৃগাঙ্কশেখর রায়

চলচ্চিত্র তার জন্মমুহূর্তে এমন কয়েকজন প্রতিভার স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছিল, যাঁরা সিনেমা নামে যাদুকরের চোখ ভোলানো খেলনাটিকে পরিণত করেছিলেন গভীর জীবন-সত্য প্রকাশের শিল্পমাধ্যমে। আইজেনস্টাইন এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যখন মস্কোর প্রলেটকালট থিয়েটারের এই বিপ্লবী তরুণ নাট্যনির্দেশক তাঁর প্রয়োগ-শৈলীতে মস্কো আর্ট থিয়েটারের বাস্তবতার তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বাস্তব সত্যের রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাঁর প্রচেষ্টাকে সবাই যৌবনের স্বাভাবিক উৎকেন্দ্রিকতার প্রকাশ বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতার দুর্মর প্রেরণাই আইজেনস্টাইনকে নিয়ে গেল থিয়েটারের কৃত্রিমতার বাঁধন থেকে চলচ্চিত্রের মুক্ত অঙ্গনে, যেখানে ক্যামেরার দৃষ্টিতে চারপাশের জগতের সব কিছুই ধরা পড়ে, পরিবেশের সত্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গের রূপায়ণই আইজেনস্টাইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবনের সমস্ত স্তরগুলি বিশ্লেষণ করেছেন আর তাঁর সদাজাগ্রত শিল্পীমন বাস্তবতার নবতর মাত্রা প্রকাশে নিত্য নতুন শিল্প আঙ্গিক-উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয়েছে। বাইরের আবরণের নিচে যে অন্তঃশীল সত্য লুকিয়ে আছে, সেই গতিশীল বাস্তবের চিত্ররূপায়ণই ছিল আইজেনস্টাইনের প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনের এই অন্তর্মুখিনতাকে উপস্থাপনের প্রয়াসেই তাঁর আঙ্গিকে অনেক সময়ে এসেছে জটিলতা যা গভীর অনুধাবন ব্যতীত অনধিগম্য। স্বদেশে তিনি বারবার নিন্দিত হয়েছেন আঙ্গিক সর্বস্বতা আর বাস্তববিরুদ্ধতার জন্য। কিন্তু কখনও তিনি দেশত্যাগী হন নি, কারণ তিনি জানতেন যে স্বদেশের মাটিতেই তাঁর সৃষ্টিশীলতার শিকড় গাঁথা আর সোভিয়েট সমাজের কাছে সমকালীন বাস্তববোধের শিক্ষার জন্য তিনি ছিলেন চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু জীবনসত্যের সন্ধানে তাঁর অভিযান কোন সময়েই ফর্মুলামাফিক বাঁধা পথে চালিত হয় নি। বিভিন্ন স্তরে গ্রথিত জীবনের বিচিত্র ভঙ্গিমাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে, কখনো সমকালীন বাস্তবের চিত্রায়ণে, কখনো অতীত ইতিহাসের নবতর

ব্যাখ্যায়, কখনো বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের জটিল বিশ্লেষণে, কখনো বা মহাকাব্যের বিস্তৃত পটভূমিকায়। তাঁর সাতটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র, যা তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার ভগ্নাংশমাত্র, এই গভীর জীবনবোধের স্পন্দনে অনুরণিত।

এ-কথা আজ আর নতুন নয় যে আইজেনস্টাইনের "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" (১৯২৫) চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার সাহায্যে। চিত্রটির নির্মাণের পরে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। কিন্তু আজও এ-ছবি আমাদের কাছে পুরনো হয়নি। এ-ছবির আগে নির্মিত "স্ট্রাইক" (১৯২৪) ছবিটি আইজেনস্টাইনের প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াস। "স্ট্রাইক" এদেশে এখনও অ-দৃষ্ট, কিন্তু এ-ছবি প্রসঙ্গে যা শোনা যায় তাতে সন্দেহ থাকে না যে এ-ছবিতেই শিল্পী আইজেনস্টাইনের প্রতিভার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। একটি কারখানার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে নির্মিত এ-ছবি চিত্রকল্পের বিন্যাসে ও সম্পাদনার আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন"-ই প্রথম চলচ্চিত্রশিল্পী আইজেনস্টাইনকে বাইরের পৃথিবীতে পরিচিত করল আর চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে "মন্টাজের" প্রাধান্য স্বীকৃত হল। আইজেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের সুষম শৈল্পিক সমাহারই সিনেমার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" তাঁর এই ধারণাকে দর্শকমনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম দৃশ্যের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা থেকে আরম্ভ করে শেষ দৃশ্যে পর্দা জুড়ে বিজয়ী পোটেমকিনের ক্লোজ-আপ অবাধ সমস্ত ছবিটিই বিভিন্ন ইমেজের সুসংবদ্ধ সমাবেশ। সম্পাদনার সাহায্যে বিভিন্ন শটের সংযোজনে দৃশ্যে গতি সঞ্চারিত হয় আর বিভিন্ন দৃশ্যের পারস্পরিক সম্পর্কটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। আলাদাভাবে একটি দৃশ্য হয়তো মূল্যহীন, কিন্তু আগের বা পরের দৃশ্যের সঙ্গে তার সংযোজন একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থের দ্যোতক যা ঐ দুইটি দৃশ্যের কোনটিতেই পাওয়া যায় না। দুটি বিভিন্ন ধারণার সংঘাতের ফলে এই যে উদ্ভব, এইটেই আইজেনস্টাইনের মন্টাজ-তত্ত্বের মূলসূত্র। এ-প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের প্রেরণার উৎস জাপানী লিপিচিত্র (hieroglyphic writing); এই তত্ত্বকে চলচ্চিত্রজগতে আমদানী করে দর্শকমনে চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্যের উপলব্ধিকে ত্বরান্বিত করা আইজেনস্টাইনের উল্লেখ্য অবদান। ওডেসার সিঁড়ির দৃশ্য যাকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসকার নাম দিয়েছেন "সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ছ-মিনিট" বিশ্লেষণ করলে মন্টাজের সূত্র-সন্ধান সোজা হবে। পোটেমকিন জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকদের অভিনন্দন জানাতে ওডেসার ঘাটে সমবেত জনতার ওপর কসাক সৈন্যদলের আক্রমণ এই দৃশ্যের বিষয়বস্তু। অগণ্য শটের সমাবেশে তৈরি এই দৃশ্যে জনতার মনস্তত্ত্বের বিচিত্র রূপায়ণ আমাদের বিস্মিত করে। মানুষের মুখ এখানে হয়ে

দাঁড়িয়েছে মুখোশ আর বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে মুখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনো জনতা আনন্দে অধীর, কখনো উদ্বেগে ব্যাকুল, কখনো আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস। দৃশ্যের প্রথমেই শ্রেণীবৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট। ভদ্রশ্রেণীর উচুকপালে বাবুদের মধ্যে দেখি পোটেমকিন সম্পর্কে অবজ্ঞা আবার সাধারণ লোক এই বিদ্রোহের মধ্যে লক্ষ্য করে নতুন দিনের আশা। আবার কসাক বাহিনীর আক্রমণের সময় সমস্ত শ্রেণীবিভাগ মুছে যায়। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর জনতা এক সামগ্রিক সত্তা লাভ করে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া খণ্ড খণ্ড ক্ষণস্থায়ী শটের মাধ্যমে সমস্ত দৃশ্যটিতে নাটকীয়তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ক্যামেরার গতি, ক্যামেরাস্থিত বস্তুর গতি আর ঘটনার অন্তর্নিহিত গতি, এই তিনের সংমিশ্রণে "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" সার্থক চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে।

"স্ট্রাইক" "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" আর "অক্টোবর" (১৯২৭) ছবিতে নায়ক ছিলো জনতা। কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ছবিগুলি গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রমশ অগ্রসরমান সোভিয়েট সমাজে "সমাজতান্ত্রিক মানুষ" ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছিল। আইজেনস্টাইনের "দি জেনারেল লাইন" (১৯২৯) ছবিতে আমরা প্রথম ব্যক্তিমানসের সাক্ষাৎ পাই। যদিও ছবিটি যৌথ-খামার নীতিকে জনপ্রিয় করবার জন্য নির্মিত এবং এখানেও জনতাই নায়ক। কিন্তু এর মধ্যে মার্থা ল্যাপ্‌কিনার জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীও অপ্রধান নয়। আর ছবির শিল্পগুণে এর প্রচারধর্মী দিকটি একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে। এ-ছবিতে সমকালীন কৃষক-জীবনের প্রতিফলন আইজেনস্টাইনের গভীর শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। তাছাড়া চরিত্রায়ণ ও দৃশ্যবিন্যাসেও এ-ছবি আইজেনস্টাইনের শিল্পী-মানসের বিবর্তনে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। এ-ছবিতেই আমরা পাই বিভিন্ন শিল্প-প্রকরণের সুষ্ঠু সমন্বয়, আইজেনস্টাইনের মতে যা চলচ্চিত্র-শিল্পের আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এই মতে প্রেরণা আইজেনস্টাইন পেয়েছিলেন রেনেসাঁসের মহান শিল্পসাধক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মধ্যে, যার শিল্প চেতনার সঙ্গে তিনি নিজের আত্মিক সাযুজ্য বোধ করেছিলেন আর সংকল্প করেছিলেন চলচ্চিত্র-শিল্পে তাঁকেই হতে হবে এ-যুগের লিওনার্দো। সঙ্গীতের মূর্ছনা, চিত্রকলার টোন, কবিতার ছন্দ ও নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের চরিত্রবিন্যাস, এদের শৈল্পিক সংমিশ্রণই সিনেমার প্রাণ, আইজেনস্টাইন বারবার এ-কথা ঘোষণা করেছেন। "দি জেনারেল লাইন" ছবিটিতে অনেক জায়গায়ই—বিশেষত ধানকাটার দৃশ্য, কৃষকের বসন্তকাল, শহরের আপিস বাড়ির দৃশ্য—চিত্রকলার ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। "কৃষকের বসন্ত" দৃশ্যটিকে বহু বিশেষজ্ঞই একটি নিখুঁত সেজানচিত্র বলে অভিহিত করেছেন। আবার সম্পাদনার গতির ফলে ক্রীম সেপারেটারের দৃশ্য, ধর্মীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য ও স্বপ্ন দৃশ্যে কবিতার ছন্দ সঞ্চারিত। আবার দৃশ্য যোজনার

লয়বিন্যাসে এই দৃশ্যগুলিতে অশ্রুত সঙ্গীতের ব্যঞ্জনাও মূর্ত (লক্ষণীয় যে ছবিটি নির্বাক হলেও বহু জায়গায়ই চিত্রকল্পের সাঙ্গীতিক কাঠামোটি স্পষ্ট)। এই ছবিতেই আইজেন-স্টাইনের শিল্পভাবনার যে আর একটি দিক আমাদের চোখে পড়ে তা হল ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব। যুক্তি দিয়ে ধর্মের প্রভাবকে তিনি নস্যাৎ করেছেন, ধর্মের ভণ্ডামি ও ধর্মযাজকদের অনাচারকে তিনি বারবার কশাঘাত করেছেন তাঁর শিল্পে ও নানা রচনায়, কিন্তু অন্তরের অবচেতনে সুপ্ত ছিল ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি এক বিচিত্র মোহ আর নানা ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, গ্রীক চার্চের iconoclastic ঐতিহ্য ও বাইজান্টাইন শিল্পকলা ছিল যার উৎস। আর তাছাড়া গির্জার দেওয়ালে বিচিত্র ম্যুরালের শোভাযাত্রা, দেবমূর্তির বিচিত্র ভঙ্গিমা, দৃশ্যশিল্পীর কাছে এর আকর্ষণ প্রচণ্ড; কিংবা সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি যখন জাফরি-কাটা অলিন্দপথে গির্জার গথিক অন্ধকার ভেদ করে আলো-আঁধারির মায়ায় বিচিত্র রেখা জাল সৃষ্টি করে, তখন শিল্পীমনে তার উদ্দীপ্ত প্রেরণা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত ছবিতে নিছক জনতা নয়, সমগ্র মানবাত্মাই ছিল তাঁর ছবির নায়ক। আইজেনস্টাইন রেনেসাঁসের মন্ত্রে দীক্ষিত সম্পূর্ণ মানবাত্মার প্রতীক, তাই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে তিনি অপরিচিত আগন্তুক; আমাদের খণ্ডিত চেতনায় তাঁর কল্পনার ব্যাপ্তি ধরা পড়েনি। তাঁর সারা জীবনের অনলস শিল্পসাধনার সমাপ্তি ঘটেছিল কর্মের মধ্যেই। মৃত্যুমুহূর্তে তাঁর সঙ্গী ছিল চলচ্চিত্রে রং-এর শৈল্পিক প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, আর তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরকালের চলচ্চিত্র সাধকের মূলধন জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ তাঁর প্রতিভাদীপ্ত চিত্রসপ্তক।

১৯৬০

কবি পাসোলিনী ও ইডিপাস রেক্স

পূর্ণেন্দু পত্রী

॥ ১ ॥

কবি পাসোলিনীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অথবা আলাপ ঘটেনি কোন দিন। বাংলা সাহিত্যে ছায়া পড়েনি তাঁর প্রতিভার। আমরা প্রবন্ধ পড়ে জেনেছি তিনি কবি। কবিতা পড়ে নয়। এ পর্যন্ত তাঁর মাত্র একটি কবিতা অনুবাদ হয়েছে বাংলায়। অনুবাদ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর 'অন্য দেশের কবিতা' বইটির জন্যে। ঐ বইয়ে সুনীলের অনুবাদের শিরোভাগে আছে একটি সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি। সেটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি তাঁদের কথা ভেবে, যাঁরা ঐ বইটি পড়েননি।

"ভিড়ের রেস্তোরাঁর মধ্যে হঠাৎ টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে পাসোলিনী চিৎকার করে বলবেন, অনর্থক মানুষ, তোমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছো। শোনো আমার কবিতা, এই কবিতাই তোমাদের বেঁচে থাকতে শেখাবে। এই রকম স্বভাবের কবি। ইতালির তরুণ কবিদের মধ্যে পাসোলিনীই সবচেয়ে প্রবল এবং দুর্দান্ত এবং সবচেয়ে বিতর্কমূলক। এক দিকে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা, অপর দিকে একদল তাঁকে কবি বলেই মানতে চান না। পাসোলিনীর জন্ম ১৯২২-এ। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ধারণা লেখকদের লেখা ছাড়া আর কোন জীবিকা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য পৃথিবীর যে কোনো তরুণ লেখক, বিশেষত কবি, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাসোলিনীকে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়, কখনো কখনো নিজে অভিনয়ও করেছেন। ইদানীং পাসোলিনী চলচ্চিত্র পরিচালনাতেই মুখ্যত আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতালির আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্যতম। তাঁর তোলা যীশুর জীবনী একটি বিতর্কমূলক ছায়াছবি। রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।"

এর পরে আরও পাঁচটি লাইন আছে সুনীলের ঐ লেখায়। পাসোলিনী সেখানে 'নিওরিয়ালিস্ট' গোষ্ঠীর কবি। হয়তো ঠিকই। কিন্তু পরিচালক হিশেবে তিনি কখনো নিজেকে ঐ গোষ্ঠীর লোক বলে স্বীকার করেননি। একবার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—

"হ্যাঁ, আমি সব সময়েই ছোট ছোট শট্ নিয়ে থাকি। আমার সঙ্গে নিওরিয়ালিস্টদের এইখানেই পার্থক্য। নিওরিয়ালিজম-এর প্রধান লক্ষণ, দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্য। ক্যামেরা থাকবে একটা জায়গায় স্থির। চরিত্ররা আসবে, যাবে, কথা বলবে, হাসবে, তাকাবে, ঠিক বাস্তব জীবনে যেমনটা ঘটে। আমি ঐরকম দৃশ্য, কখনোই নিইনি। আমি ন্যাচুরালনেসকে ঘৃণা করি। আমি সব কিছু গড়ে নিই।"

চলচ্চিত্রের আলোচনা থেকে আমরা ফিরে যেতে চাই কবিতায়। না, আসলে কবিতায় নয়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তার কবিসত্তা যতটুকু জড়িয়ে আছে, নিজের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে বারে-বারে কবিতার কাছে ফিরে এসেছেন, সেইটুকুই আমাদের আলোচনার পুঁজি। সেইসব হাতড়েই একজন কবিকে খোঁজা।

যুদ্ধের সময়ে, যখন থাকতেন ফ্রিউলিতে, তখন থেকেই কৃষক জীবনের সঙ্গে তার আঁতের যোগ। সেই সময়েই ধনী জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের লড়াই। পাসোলিনী জড়িয়ে পড়লেন লড়াইয়ে। মার্কসিজমও সেই প্রথম স্পর্শ করল তাঁর ফুটন্ত আবেগকে। প্রথম কবিতা লিখতে বসে সেই সময়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেছে নিলেন 'ফ্রিউলান'। তাঁর নিজের ভাষা নয়। ভাষাটা আঞ্চলিক, স্থানীয় চাষীদের।

"ফ্রিউলান ভাষায় যখন প্রথম কবিতা লিখি, তখন আমার বয়স সতেরো। তার কারণটা ছিল অদ্ভুত। তখন ইতালীতে 'হারমেটিসিজমের' আধিপত্য। এর মূল লক্ষ্য ছিল সিম্বলিজম। এই আন্দোলনের মূলে প্রবল প্রভাব ছিল মালার্মের। কিছুটা রিলকেরও। প্রথম প্রভাবিত হয়েছিলেন উনগারেত্তি। সারা ইতালীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনের প্রভাব। মনতেল-ই একমাত্র কবি যিনি একে ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্যান্য কবি, যেমন এলিয়ট এবং পাউণ্ডকে অনুসরণ করে, হারমেটিসিজমকে চেহারা দিয়েছিলেন খানিকটা সহজ সরল। হারমেটিক কবিতার মূল লক্ষ্য ছিল কবিতার ভাষা হবে শুধুমাত্র কবিতারই ভাষা। এবং এটাকে নিয়ে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন দুর্বোধ্যতার একেবারে প্রান্তসীমায়। যেখানে সব কিছুই অনুভবের বাইরে। সবটাই যেখানে সাড়াহীন। 'an absence of communication'. সেই সময়ে ফ্রিউলান-কে আমি মাথায় তুলে নিলাম কবিতাব একটা বিশেষ ভাষা হিশেবে। বাস্তবতার প্রতি যত রকম ঝোঁক বা প্রবণতা তার একেবারে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী হিশেবে, 'It was the maximum of hermetic obscurity.'

এই আঞ্চলিক ভাষার সান্নিধ্যে পৌঁছেই, যদিও প্রথম দিকে শুধু মাত্র সাহিত্যের জন্যেই হাত পেতেছিলাম এর কাছে, ক্রমশ বুঝতে পারলাম, আমি ছুঁয়ে ফেলেছি এমন একটা জিনিশ যা অত্যন্ত জ্যান্ত এবং ভীষণ বাস্তব। আমি ক্রমশ চিনতে এবং বুঝতে পারলাম, কৃষক জীবনের বাস্তবতাকে। তারপর আমার লেখায় এই ভাষা আর শুধুমাত্র হারমেটিক এস্থেটিক্‌সের কলা-কৌশল হিশেবে ব্যবহার হওয়ার বদলে হয়ে উঠল বাস্তবকে প্রকাশ করার বস্তুনিষ্ঠ অবলম্বন বা উপকরণ। আমার উপন্যাসে সেটা পেল পরিপূর্ণ রূপ। যেখানে আমি রোমান ডায়ালেক্‌টকে ব্যবহার করেছি এমন ভাবে, যা প্রথম দিকের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বাবা অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশধর। মা ফ্রিউলানের কৃষক পরিবারের মেয়ে। বাবা ধার্মিক ছিলেন না। বিশ্বাস করতেন না ঈশ্বরে! কিন্তু যেহেতু ন্যাশনালিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট, প্রতি রবিবারে চার্চে যাওয়ার অভ্যাসটা ছিল নিয়মিত। সেটা শুধুমাত্র সামাজিক কারণে। মা যেহেতু চাষী পরিবারের মেয়ে, ধর্ম তাঁর শরীরের রক্তমাংসে। কিন্তু চার্চে যেতেন না কোনদিন। ধর্ম ছিল তাঁর ভিতরের জিনিশ। কাব্যময় এবং স্বাভাবিক। লোক-দেখানো ছল নয়। এইভাবে ধর্মহীনতার প্রভাব পাসোলিনীর অস্তিত্বে শৈশব থেকে সংক্রামিত। নিজে বলেছেন এইভাবে, 'আই থিংক, আই এ্যাম দা লিস্‌ট ক্যাথলিক অফ অল দা ইটালীয়ানস আই নো।' এমন কি যে স্কুলে পুরোহিতরা শিক্ষক, সে স্কুলে পড়তে যেতেন না তিনি। শৈশব থেকে আরও একটা জিনিশ ছায়া ফেলেছিল অস্তিত্বে। মায়ের প্রতি ভালবাসা। সুগভীর টান।

"বাবা এবং মায়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, সেটা সম্বন্ধে কিছু বলা খুব কঠিন। যেহেতু সাইকো-এ্যানালিসিস সম্বন্ধে কিছু আমি জানি। সেই কারণেই আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, কি ভাবে কথাগুলো বলবো। কবিতার ছাঁদে অর্থাৎ ঘটনাময় স্মৃতিচারণ দিয়ে। না সাইকো-এ্যানালিসিসের ধরনে। সেটাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। কারণ, কাউকে সম্পূর্ণ জেনে ওঠা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় কখনো। আমি শুধু বলতে পারি মায়ের প্রতিই ছিল আমার প্রবল ভালবাসা। প্রমাণ পেতে চাইলে ঘাঁটতে পারেন আমার কবিতা, ১৯৪০ থেকে যার শুরু। আর শেষ, কবিতার বইয়ে। অনেক কাল ধরে আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, আমার জীবনের আবেগময় এবং যৌনপ্রধান গড়নটা বুঝি মায়ের প্রতি অত্যধিক, বলতে গেলে ভয়াবহও, ভালবাসা। কিন্তু সম্প্রতি বুঝেছি, বাবার সঙ্গে সম্পর্কটাও আমার জীবনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমি সব সময়ে ভাবতাম বাবাকে বুঝি ঘৃণা করেছি কেবল। না। আমি যুক্ত ছিলাম এক স্থায়ী সংঘর্ষে, তাঁর সঙ্গে। তার কারণ ছিল অনেক। সবচেয়ে বড় কারণটা হল, তিনি ছিলেন 'ওভার বীয়ারিং ইগোইস্টিক, ইগোসেন্ট্রিক, টিরানিক্যাল এ্যাণ্ড অথরেটেরিয়ান'। আবার সেই সঙ্গে 'একস্ট্রাঅর্ডিনারিলি নাইভ'। এ ছাড়া তিনি ছিলেন আর্মি অফিসার। জাতীয়তাবাদী। এবং ফ্যাসিজিমের সমর্থক। আমার সঙ্গে সংঘর্ষের এগুলোও ছিল কারণ। তার উপরে মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা ছিল বড় জটিল। সেটা এখন বুঝতে পারি। বাবা সম্ভবত মাকে ভালবাসতেন যথেষ্টই। কিন্তু সম্ভবত মায়ের দিক থেকে বিনিময়ে পেয়েছেন কম। সেই না-পাওয়াই বাবাকে সব সময় তীব্র ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় টান টান করে রাখতো। সব শিশুদের মতো, আমিও তখন থাকতাম মায়ের পক্ষেই। আমি সব সময়ে ভাবতাম, বাবাকে বুঝি ঘৃণাই করেছি কেবল সারা জীবন। তা নয়। সম্প্রতি, আমার শেষ কাব্য-নাটকটি লিখবার সময়, যার বিষয় পিতা বনাম পুত্রের সম্পর্ক, বুঝলাম আমার আবেগময় এবং যৌনপ্রধান মানসিক গড়নটার মূলে বাবার প্রতি ঘৃণা নয়, ভালবাসা বোধটাও অনেকখানি কার্যকরী। এই ভালবাসার জন্ম তখন, যখন আমার বয়স দেড় বছর। অথবা হতে পারে দুই কিংবা তিন। সঠিক জানি না। তবে আমি এই ভাবেই জিনিশটাকে খাড়া করেছি। ১৯৫৯-এ বাবা মারা গেলেন; কেনিয়া-র বন্দী শিবির থেকে ফিরে। ১৯৪২-এ লেখা কবিতার বইটা উৎসর্গ করেছিলাম তাঁকে। সে কবিতা ফ্রিউলান ভাষায় লেখা। আমার মায়ের ভাষা। বাবা ছিলেন এই ভাষার বিরুদ্ধে। তার অনেক কারণ। প্রথমত মধ্য ইটালীর মানুষ হিশেবে তিনি ছিলেন জাতিবিদ্বেষী। তাঁদের ধারণা যা কিছু শহরের প্রান্তবর্তী, তা সে ভাষাই হোক আর যাই হোক, নিকৃষ্ট। তার উপরে একজন ফ্যাসিস্ট হিশেবে আঞ্চলিক ভাষার উপর তাঁর ঘৃণা তো ছিলই। সুতরাং বাবাকে সেই কবিতাগুচ্ছ উৎসর্গ করা যথেষ্ট সাহসিকতার লক্ষণ।"

সম্ভবত, 'ইডিপাস রেক্স' গড়ার উৎস রয়ে গেছে এইখানে। ইডিপাস-এর প্রোলোগ-এ। যেখানে দেড় বছরের একটি শিশুর প্রতি তার পিতা ঈর্ষান্বিত। শিশুটিও পিতার মানসিকতার নির্মম অথবা উদাসীন পর্যবেক্ষক।

পাসোলিনী, বলতে গেলে জন্ম থেকেই কবি। যখন থেকে লিখতে শিখেছেন, তখন থেকেই কবিতা লেখা। অবশ্য লিখতে এবং পড়তে শেখার আগে এসেছিল ছবি। তখন বয়েস ছিল চার। কবিতা লেখা সাত বছর বয়েস থেকে। ছোট্ট একটা নোট বইয়ে। শৈশবের যেসব রচনা হারিয়ে গেছে যুদ্ধের সময়। সে কবিতাকে অলঙ্কৃতও করেছিলেন ছবি এঁকে। ছবি আঁকাটাও চলেছিল অনেকদিন। বয়স বেড়েছে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রে বিতর্কমূলক রচনা, এমনি নানা দিকে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছে তাঁর প্রতিভা। কিন্তু কবিতা রয়ে গেছে রক্তস্রোতে, অস্তিত্বের মর্মমূলে।

চলচ্চিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেই জনৈক প্রশ্নকর্তা একবার তুলেছিলেন 'স্যুর-রিয়্যালিজম'-এর কথা। পাসোলিনীর উত্তর—

"স্যুর-রিয়্যালিজম জিনিশটা যে খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা আমার মনে হয় না। আমরা যখন ঐ শব্দটা ব্যবহার করি তখন একই সঙ্গে দুটো দিকের কথা বলি। এর এক দিকে রয়েছে, 'স্যুর-রিয়্যালিস্ট ম্যানিফেস্টো'। মনে পড়ে যায় ব্রেতোঁ আর আরার্গঁকে। মনে পড়ে যায় গোটা ফরাসি পরিমণ্ডল। মনে পড়ে যায় দালি-র ছবি। এই শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা যাঁরা স্যুর-রিয়্যালিস্ট ছিলেন তাঁদের সবাইকে।

এর পরের ধাপে আসে কাফ্‌কা। কাফ্‌কা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আরার্গ এবং এলুয়ার-এর মধ্যে যেমন তুলনা হয় না, তেমনি হয় না তাঁদের উত্তরাধিকারী লুব্রেম্‌-র সঙ্গে কাফ্‌কার। স্যুর-রিয়্যালিস্ট পেন্টিং আর গোড়ার যুগের স্যুর-রিয়্যালিস্ট সিনেমার তুলনা চলে না।

আজকের যুগের যাবতীয় জীবন্ত কবিতা, এমনকি সোস্যালিস্ট বা কমিটেড কবিরাও যা লিখেছেন, সবারই মূল উৎস ঐ স্যুর-রিয়্যালিজম।

আমার ফিল্মে যে স্যুর-রিয়্যালিজম, তার অনেকখানি কাফ্‌কা থেকে নেওয়া। আর খানিকটা নেওয়া স্যুর-রিয়্যালিস্ট পেন্টিং থেকে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্যুর-রিয়্যালিজমের সঙ্গে আমার চলচ্চিত্রের সম্পর্ক কম। এটা হল 'ফেবল্‌'-এর স্যুর-রিয়্যালিজম। যার শিকড় লোক-সাহিত্যের গভীরে। বরং বলা যেতে পারে আমার ছবির মূল নীতিকথাটা ভারতীয় দর্শনের থেকে নেওয়া। 'টু বি ডেড অর এ্যালাইভ ইজ দা সেম থিং', এবং এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।"

চলচ্চিত্র এবং কবিতা পাসোলিনীর কাছে এক। তিনি শুধু কবিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে চলচ্চিত্র গড়েন না, মাপেনও। কোনও একটা ছবি দেখার পর তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এ

ছবিটা কোন্ ভাষায় তোলা? গদ্যের ভাষায়, না পদ্যের ভাষায়। তিনি বিশ্বাসী 'সিনেমা অব পোয়েট্রি'তে। কেন?

"আমার মতে সিনেমা মূলতঃ এবং স্বাভাবিক কারণে কাব্যময়। যেহেতু সিনেমা স্বপ্নের মতো। সে স্বপ্নের সবচেয়ে কাছাকাছি। যেহেতু চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য, অথবা স্মৃতির খানিকটা অংশ অথবা স্বপ্নের, তারা সকলেই, গভীর ভাবে কাব্যময়। ছবিতে তোলা একটা গাছও কাব্যময়। একটা মানুষের মুখের ছবি তুললে, সেটাও কাব্যিক। যেহেতু 'ফিজিসিটি' জিনিশটাই কাব্যিক। যেহেতু এর ভিতরে রয়েছে অলৌকিকত্ব। রয়েছে রহস্য। রয়েছে বহু রকমের অর্থ। যেহেতু দ্ব্যর্থকে মোড়া। এমনকি একটা গাছও ভাষাবিদ্যার প্রতীক। কিন্তু গাছের ভিতর দিয়ে কে কথা বলে? বলেন ঈশ্বর। অথবা বাস্তব জগৎ নিজেই। এইভাবে গাছের মাধ্যমে তার অলৌকিক বক্তার সঙ্গে ভাষার আদান প্রদান চলে আমাদের।

সিনেমা কবিতা হতে বাধ্য, কারণ এটা কবিতারই মত। আমি আবার বলছি, কবিতারই মত। যে কবিতা প্রাগৈতিহাসিক, নির্দিষ্ট আকারহীন এবং অস্বাভাবিক। কেউ যদি আদ্যিকালের একটা শাঁসহীন ফাঁপা, ওয়েস্টার্ন ছবি অথবা কোনো প্রাচীন জনপ্রিয় ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে, তার ভিতরেও কোথাও না কোথাও চোখে পড়বে, স্বপ্নের গড়ন এবং কবিতার স্বভাব। যদিও সে ছবি 'সিনেমা অব পোয়েট্রি' নয়।

চলচ্চিত্রকার হতে গেলে কবি হতে হবে আগে।"

২

বার্নার্দো বার্তুলুচ্চি, ইতালীর একজন খ্যাতনামা কবি। আতিল্লো বার্তুলুচ্চির ছেলে। হঠাৎ এক দিন কবিতা ছেড়ে চলে এলেন চলচ্চিত্রে। হঠাৎ মনে হয়েছে, 'সিনেমা ইজ দা ট্রু পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ'। ২১ বছর বয়সে প্রথম ছবি, 'দি গ্রীম রীপার'। গুরু পাসোলিনীর গল্প। শিষ্য বানিয়েছিলেন নিজের মত সাজিয়ে গুজিয়ে। সেটা ১৯৬২-র ঘটনা। তারপর আরও বদলেছেন। আরো ছবি। বন্ধুত্ব হয়েছে গদারের সঙ্গে। ছবিতে পড়েছে তার ছাপ। লিরিসিজমের সঙ্গে মিশেছে গদারীয়ান পলেমিক। পরে বন্ধুত্ব ভেঙে গেছে। কারণটা রাজনৈতিক মতামতের বৈপরীত্য। তারপরেও ছবি করেছেন। এখন বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক উজ্জ্বল নাম। কিন্তু এখনো গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অকুণ্ঠ। বয়স যখন কুড়ি, তখনই এসেছিল এই দুর্লভ সুযোগ। পাসোলিনীর প্রথম ছবি 'এ্যাকাটোনে'র সহকারী পরিচালকের কাজ। প্রশ্ন করা হয়েছিল, কি ভাবে পেলেন এই কাজ? উত্তরে, জানিয়েছিলেন—

—আমি তাঁকে জানতাম। আমি ছিলাম তাঁর কবিতার পাঠক। তিনিও পড়েছিলেন

আমার কিছু কবিতা। যখন বারো বছর বয়েস, প্রথম দেখি তাঁকে। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। পাসোলিনীর সঙ্গে কাজ করা সত্যিই এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। যখন প্রথম ছবি করছেন তখন সিনেমার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আমারই মত 'ভার্জিন' অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ। তার ফলে অভিজ্ঞতা দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করলাম, সেটা একজন পরিচালকের কাজ নয়। আমি প্রত্যক্ষ করলাম একজন পরিচালকের জন্ম।

—এ্যাকাটোনে করতে করতে কি শিখলেন?

—টেকনিক-ফেকনিকের কিছুই না। শিখেছিলাম মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারটা। স্টাইলের কথা যদি বলতে হয় বলবো অপূর্ব। পাসোলিনী যখন একটা ট্রাকিং শট নেন, মনে হোতো যেন পৃথিবীতে এই প্রথম ট্রাকিং শটের জন্ম হল। তেমনি একটা ক্লোজ-আপ। মনে হোতো এর আগে পৃথিবীতে ক্লোজ-আপ ছিল না। যেন এই প্রথম জন্ম হচ্ছে একটা ভাষার। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল যেন হাত লাগিয়েছি সিনেমাকে জন্ম দেওয়ার কাজে। এ্যাকাটোনে-য় কাজ করে আমার চোখ খুলে গেল সিনেমার বিষয়ে। বুঝলাম, এটাই হল আসল কাব্যময় ভাষা। বুঝলাম, সিনেমা থিয়েটারের চেয়ে কবিতার অনেক কাছের।

পাসোলিনীর সব ছবির চিত্রনাট্যই নিজের কলমে লেখা। সাধারণত চিত্রনাট্যকে আমরা জানি এক ধরনের শুকনো গদ্য। প্যারেডের মাঠের ডাইনে ঘোরো বাঁয়ে তাকাও এবার হাঁটো গোছের নির্দেশনামার নির্ঘোষে কর্কশ। সাহিত্য থেকে সাধারণত সাত মাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এর ভাষা। কথা বেশি। কবিতা কম। চরিত্র থাকে। কিন্তু থাকে না তাদের মন, তাদের ভিতর মহল, জটিল অলিগলি, অন্ধকার ঘর, ঘরের ভিতরের করাঘাত। চিত্রনাট্যে নায়কের প্রবেশ এবং প্রস্থানের মাঝখানে কেবল সংলাপ। থাকে না সংলাপের উৎস। ফলে চিত্রনাট্য পড়ে আমরা কখনো ছুঁতে পারি না সেই রকম একটা জ্যান্ত চরিত্রকে যার পাঁচটা ইন্দ্রিয়, ছটা রিপু এবং একটুকরো বুকে চোদ্দটা ভুবন। তাই চিত্রনাট্য আমরা পড়ি না।

পাসোলিনীর চিত্রনাট্য সাহিত্য নয়, কবিতা। শুধু ভাষা নয়, ভাষ্যও। তিনি মানুষকে দেখান শুধু আপাদমস্তক নয়, আমূল। শিকড়-বাকড়শুদ্ধ। প্রকৃতিকেও দেখান মানুষের আদলে।

'ইডিপাস রেক্স' ছবিতে আমরা দেখেছি ক্যামেরা ক্রমাগত ঘুরে চলেছে সবুজ বনের উপর দিয়ে। যেন একটি শিশু চোখভর্তি বিস্ময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে প্রকৃতিকে। চিত্রনাট্যে সেখানকার বর্ণনা—

Perhaps trees will come spinning into view : ashes, sorghum, and willows—willows above all. Drooping with their long, weeping

leaves over a terrible void, a darkness, something unearthly. And the willows, drenched in that glorious afternoon sun deep in the provinces : a mysterious corner of the world, no north, no south. Just an immense hole where a new life is stirring.

সৈনিকের পোশাক পরা পিতা তাকিয়ে আছে আপন শিশুর দিকে। শিশুটি একটি প্রাম-এর ভিতরে শুয়ে। সেও দেখছে তার পিতাকে। কিভাবে ?

The child looks at him, his limpid little eyes devoid of expression, perhaps he is already pretending indifference. The father looks at him, standing out in his petitbourgeois soldiers uniform against the sky and the song of the swallows. He is listening to his own inner voice. It is loud, and solemn, as in a tragic drama.

কোনও একটি যুবকের বর্ণনায় তাঁর কলম শুধু 'হ্যাণ্ডসাম' বলেই থেমে যায় না। তিনি জানান, এ হচ্ছে সেই যৌবন যা দাসত্ব কি এখনো বুঝতে শেখেনি। অথবা তাকে স্পর্শ করেনি দাসত্বের বোধ। অথবা ক্ষেপিয়ে তোলেনি।

কোনও একটি বাঁশীর সুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান, এ হল সেই সুর যা চিরকালের, পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণের প্রাণের জিনিশ। আবার অন্য জায়গায় এই বাঁশীর সুরকে বলেছেন, নিয়তির চেয়ে বয়সে কিছু ছোট অথবা বড়।

কোনও একটি পথ প্রসঙ্গে, এই পথ যার শেষ নেই। চলে গেছে সেই গভীরতার দিকে, যার সবটাই ভয়াবহ শূন্যতায় ভরাট।

আবার এইরকম পথেই যখন ভেসে আসে দূরাগত কোন অস্পষ্ট সঙ্গীত তিনি সতর্ক করে দেন আমাদের। ঐ গান এগিয়ে আসছে অলৌকিক ভঙ্গীতে, এখুনি দখল করে নেবে এই ভুবনজোড়া দিগন্তকে। ঐ গান প্রাণে প্রথমে জাগায় আনন্দ, পরে আতঙ্ক। এই গান পথকে বাঁকিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির ভিতর দিয়ে এমন দিকে, যেখানে দাঁড়ালে মনে হয় সবটাই সুস্পষ্ট অথচ বিপুল দূর, সবটাই পরিচিত অথচ অমানবিক।

থেবস যাত্রার পথে ইডিপাস যখন হত্যা করেন নিজের পিতাকে এবং আক্রান্ত হন তাঁর রক্ষীদের হাতে, ইডিপাস একে একে হত্যা করেন তাদেরও। পাসোলিনী একবারও বলেন না মৃতদেহগুলি শুয়ে রইল ধুলোর উপরে। মৃত্যুর বদলে তিনি ব্যবহার করেন 'সরলতা'। 'দেয়ার ইনোসেন্‌স লাইস দেয়ার ইন দি ডাস্ট, সোক্‌ড ইন ব্লাড।' আবার কখনো, 'ইনোসেন্স অ্যাণ্ড ইয়ুথ লাই স্কোয়ারমিং ইন দি ডাস্ট।' কবির উপস্থিতি এখানে প্রবলতর। নিজের অজ্ঞাতসারে ইডিপাস নিহত করেছেন তার পিতাকে। তার জীবনে পাপের শুভারম্ভ এই মুহূর্তটি থেকে। ইডিপাসের পাপকে চিনিয়ে দেবার জন্যেই বারবার

প্রতিরোধকারী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে পাপহীন সরলতার উচ্চারণ।

থেবস্‌-এ অভিষিক্ত হওয়ার পর নিজের জননীর সামনে এসে বসেছেন ইডিপাস। এখন জননী নয়, স্ত্রী।

"দুটি নববিবাহিত এখন তাদের শয্যাগৃহের নিজস্ব শান্তির ভিতরে। জানলার বাইরে থেবস্‌-এর অট্টালিকামালা, শহরাঞ্চল এবং চাঁদ। প্রথম দেখা গেল ইয়োকাস্তকে। এখনো উৎসবের পোশাকে। পিছনে ইডিপাস। পরিধানে রাজার পোশাক; মাথায় মুকুট। তাঁরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের চোখ অপরের চোখে গাঁথা। তাঁদের বিবাহ ঘটেছে জনগণের ইচ্ছানুসারে। কিন্তু এও ঠিক যে তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছাটাও ছিল পিছনে, স্বতঃস্ফূর্ত এক লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষা।

সেই আকাঙ্ক্ষার নগ্ন প্রতিবিম্ব এখন তাঁদের চোখে। চরিতার্থতাও প্রতিবিম্ব। তাঁদের ভালবাসা এখন মাংসময়। আত্মার উৎকর্ষতা।

তাঁরা যখন পরস্পর নগ্ন হচ্ছেন, তখন তাঁদের চোখ পরস্পরের চোখে গাঁথা। এই প্রথম, তাঁরা আবিষ্কার করছেন পরস্পরের নগ্নতা। তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম মুহূর্ত। বাইরে, ঝিমধরা গ্রীষ্মের কিছু শব্দাবলী। বাইরে, জলজলে চাঁদ।

ইডিপাস এখন নগ্ন। একই সঙ্গে রাজা এবং স্বামীর অধিকারবোধে তাঁর ব্যক্তিত্ব এখন উজ্জ্বল। তিনি দেখছেন নিজের স্ত্রীকে। স্ত্রীর মাথা এখন অলঙ্কারহীন। চুল বিস্রস্ত। পা দুটি নগ্ন। কিন্তু কাঁধ থেকে তখনো ঝুলছে পোশাক, যা কোমরের কাছে একটি সোনার আংটায় দৃঢ় আঁটা। আংটাটি যেন প্রকাণ্ড এবং ধারালো কাঁটার মতো। এইভাবে তিনি বসে আছেন বিছানার প্রান্তে। সলজ্জ। কিন্তু এই লজ্জা শিহরিত কুমারীদের মতো নয়। কারণ, কিভাবে শিশুরা জন্ম নেয়, ইতিপূর্বেই তা জানা হয়ে গেছে তাঁর। তিনি তো জননী। তবুও যে লজ্জার নম্র ভঙ্গি, সেটা সম্ভবত কৃত্রিম, প্রণয়ের ছলাকলা। অথবা হতে পারে এই দৃঢ় অথচ কোমল অভিব্যক্তি তাঁর নারীত্বেরই স্বাভাবিক সংযম। ইডিপাসের চোখে যেন খানিকটা ব্যঙ্গ, কিছু ঈর্ষা, ইডিপাস ভালবাসার জন্যে প্রস্তুত। ধৈর্যহীন তিনি এগিয়ে গেলেন ইয়োকাস্তর কাছে। খুলে দিলেন কোমর বন্ধনীর সোনার আংটাটি। বুকের বসন লুটিয়ে পড়ল পায়ের নিচে।

অস্থির ইডিপাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন ইয়োকাস্তর শরীর, প্রায় বন্যের ভঙ্গিতে। বিছানায় শুইয়ে দিলেন তাঁকে। আর ঠিক সেই সময়ে তাঁকে নিবৃত্ত করল, পেছনে টেনে আনল একটা কিছু।

তিনি উঠে বসে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর স্ত্রীকে, মনে পড়তে লাগল জননীকে।

রাত্রির গভীরে, দূরে কোথাও বেজে উঠল বাঁশী। বেজে মিলিয়ে গেল। এ সেই টাইরেসিয়াসের বাঁশীর রহস্যময় সুর। এই সুর যেন নিয়তির আঁকা ছকের মধ্যেকার

জিনিশ। নিয়তি—রহস্য—তাকে ছাড়িয়ে—একটি মা।

ধীরে, অতি সন্তর্পণে, আর সেই প্রভুত্বের বন্যতায় নয়, যথার্থ প্রেমিকের মত কাঁপা আবেগে, ইডিপাস কাছে টেনে নিলেন তাঁর জননীকে। জননীর শরীরকে তিনি আচ্ছাদিত করলেন নিজের শরীর ঢেলে।"

কবিতার গভীর ভাষায় লেখা হয়েছে এমন চিত্রনাট্যের সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কবি। পাসোলিনী তাঁদের মধ্যে একজন। হয়তো তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এবং সম্ভবত সর্বশেষ।

মেফিসটো

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

'মেফিসটো' যখন প্রথমবার দেখি, তখন কোনো প্রস্তুতি ছিল না, প্রত্যাশাও ছিল না। নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিতরিত অনুষ্ঠানপত্রে উদ্ধৃত বিবৃতিতে ইস্ত্‌ভান জাবো বলেছিলেন, 'আমাদের ছবির কাহিনী এমন একজন মানুষকে নিয়ে যার মানিয়ে নেবার ক্ষমতা চমকপ্রদ। এই কাহিনী এমন একজনের কাহিনী যার বিবেচনায় তার জীবনের একমাত্র সম্ভাবনা অন্যদের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্যে।···সে সিনিক্ না, দুর্জনও নয়। সে বরং সেন্‌টিমেনটাল, কর্তৃত্বের কাছে সে মাথা নত করে কারণ তাতে সে তার অনুভবে এক গভীর নিরাপত্তা বোধ লাভ করে। হঠাৎ দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেলে সে অসাড় হয়ে যায়, কিন্তু তাও মুহূর্তের জন্য। তার সজাগ মন সঙ্গে সঙ্গেই পথ খুঁজে নেয় কেমন করে সে আবার নিজেকে গ্রহণীয় করে তুলবে। সে স্পষ্টই জানে যে সে যা করছে তা বিশ্বাসঘাতকতা। তারপর এই বিশ্বাসঘাতকতাই হয়ে দাঁড়ায় তার নতুন ভূমিকা। তার নিজের জীবন, তার নিয়তি, সবটাই সে অভিনয় করে যায়। নিজের পতনের পরও বেঁচে থাকবার লোভে সে তার পতনকেও অভিনয়ের অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে পারে। ফ্যাশিবাদের মতো সুতীব্র ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এমনি চরিত্রের একটি মানুষের কীর্তিকলাপ লক্ষ করা নিঃসন্দেহেই আমাদের পক্ষে শিক্ষণীয় হবে।' ছবি দেখবার প্রাক্‌মুহূর্তে এই কথাগুলিও তেমন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ছবি শুরু হতেই তার একাধিক পরস্পরসম্পৃক্ত কাঠামোর বিন্যাস এক আশ্চর্য বুনট রচনা করে। একটি স্তরে থিয়েটারের ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল। জাবো বড় হিসেব করেই বেছে নেন তাঁর ছবিতে থিয়েটারের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রূপে ইতালীয়

অপেরা, ব্রেশ্‌ট্‌-এর 'দ ত্রেভশপ', গ্যোয়টে-র 'ফাউস্ট' এবং শেক্‌সপীয়রের 'হ্যামলেট', মাত্র এই চারটিই, কারণ এই চারটিতেই আঁকা হয়ে যায় তৎকালীন পশ্চিম ইয়োরোপিয় থিয়েটারের পরম্পরার মানচিত্রের বহিরে খচিত্র। পেশাদার থিয়েটারের চর্চার মধ্যেই রয়ে গেছে এক ধরনের আত্মহননের বীজ। নিজেকে মিথ্যা ভানের প্রবল আড়ম্বরে জনসমাদরের মুখে দাঁড় করাবার যে প্রবণতা পেশাদার থিয়েটারের মজ্জাগত, বস্তুত থিয়েটারের প্রাণস্বরূপ, তা ই হয়ত অভিনেতাকে একটু বেশি সাবধানী, একটু বেশি স্বার্থসন্ধানী, একটু বেশি স্বীকৃতিকাতর করে তোলে। দৃশ্যের স্তরে স্পটলাইটের উচ্চকিত লাঞ্ছন যা আলোর অত্যুজ্জ্বল বৃত্তের মধ্যে অভিনেতাকে বেঁধে রাখে বাইরের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সমস্ত দর্শকের দৃষ্টিকেও বেঁধে রাখে তার উপর ; আর অন্যদিকে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক করতালির সেই তাৎক্ষণিক মায়াবি সম্মোহন—এই দুয়েই যেন ধরা পড়ে যায় অভিনেতার হুব্রিস তথা হামারতিয়া তথা অনিবার্য নিয়তি। তাই দৃশ্যধ্বনির ঐ সমাহারেই 'মেফিসটো'র প্রথম সীকৃওয়েন্‌স্‌-এ অভিনয়সন্ধ্যাশেষে শেষ যবনিকাপাতের পূর্ব মুহূর্তে জাবোর অভিনেতৃ-অভিজ্ঞতার অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণের পটভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর পুরো ছবি জুড়েই ঐ একই পরিস্থিতি বারবার ফিরে আসে—অভিনয়ের প্রবল আত্মময় আত্মপ্রকাশের শেষে জনসমাদর, সেই জনসমাদরের আদল বিচিত্র, সামূহিক থেকে ব্যক্তিক, আবেগ, ভদ্রতা কিংবা তীক্ষ্ণ সমালোচনার সীমায় গ্রথিত। সমাদরের প্রাপক একই থাকে, পালটে যায় কর্তারা—কখনও মুগ্ধা রমণী, কখনও ফ্যাশিস্ট জেনেরাল, কখনও জনমণ্ডলী, কখনও বিচক্ষণ বহুদর্শী নাট্যসমালোচক। 'নাটক' বা 'থিয়েটার'-এর চেয়ে 'পারফরমান্‌স্‌' কথাটার মধ্যে অভিনয়ের এই অন্তর্গত দ্বৈত বা দ্বান্দ্বিকতার ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর। অভিনেতার অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দুটি লড়াই মুখ্য। এক, নিজের শরীরের সঙ্গে লড়াই যাতে সেই শরীর বিপুল বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, যাতে তার প্রতিটি তন্ত্রী অর্থবহ হয়, প্রকাশক্ষম হয়। দুই, দর্শকের সঙ্গে প্রাত্যহিক লড়াই, তাকে জয় করে নিয়ে অন্ধ ভক্তে পরিণত করার লড়াই। এই দুই লড়াই বারবারই জড়িয়ে যায়, একমুখী হয়ে যায়। যেমন দেখা যায় ছবির দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ সীকৃওয়েন্‌স্‌-এ, যেখানে হেনড্রিক হোফ্‌গেন-এর শরীরচর্চায় অনিবার্যভাবে জড়িয়ে যায় নিজের শরীরের স্বাদে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হবার নারসিসিস্‌টিক সাধ। নিজের শরীর, কেবল নিজের শরীব নিয়ে এই মগ্নতার মধ্যে একটা অবিবেচক বন্যতা আছে যা এই সীকৃওয়েন্‌স্‌-এ জুলিয়েট মারটেন্‌স্‌-রূপিণী কারিন বয়েড-এর সঙ্গে হোফ্‌গেনের প্রণয়দৃশ্যে স্পষ্ট। লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই সমগ্র সীকৃওয়েন্‌স্‌-এর ছন্দ তৈরি হয়ে যায় হোফ্‌গেন ও জুলিয়েটের প্রথম নৃত্যনির্ভর শরীরচর্চার ছন্দ থেকেই। এই ছন্দের মধ্যেই রয়েছে পরস্পরকে নিয়ে যৌনতার বন্য একটি খেলা—বিভিন্ন পশুযুগলের

'মেটিং গেম'-এর আদলেই যেন। জাবোর অসামান্য বাঁধুনির গুণে সমগ্র সীকুওয়েন্স জুড়েই যা বোঝা যায়, হোফ্‌গেন এই খেলার আনন্দে নিজের শরীরের অবাধ মুক্তি ও আরেকটি শরীরের উপর এই শরীরের অধিকারের তৃপ্তির স্বাদই লাভ করে, এর মধ্যে প্রেমের আত্মদান বা আত্মসমর্পণের কোনো মাত্রাই নেই। এই দৃশ্য যে শটটিতে একটি কাইম্যাক্স্-এ পৌঁছয়, তাতে কারিন বয়েডের চিৎ হয়ে শোয়া শরীরের উপর, সেই শরীরের নরম উষ্ণ আশ্রয়ে ও নিশ্চিন্ত আরামে শায়িত ব্রানডাউআর-এর চিৎ হয়ে শোয়া শরীর, যৌনতা যেখানে আত্মতৃপ্তির তীব্র সুখে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। হোফ্‌গেন ও জুলিয়েটের এই সম্পর্কের এই প্রথম উদ্‌ঘাটনেই দেখা যায়, জুলিয়েট উপলক্ষ্য, জুলিয়েট হোফ্‌গেন দ্বারা ব্যবহৃত। পরে তার প্রতি হোফ্‌গেনের বিশ্বাসঘাতকতার অমোঘ সম্ভাবনা এই দৃশ্যেই নিহিত। অথচ জাবো যখন অভিনেতায় নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা থেকেই এই সম্পর্ক ও তার বিশেষ চারিত্র্যের সূত্রপাত ঘটান, এবং ঘটান ঐ দৃশ্যের বিবর্তনের অন্তর্নিহিত যুক্তি ধরেই, তখনই যেন তিনি ধরিয়ে দেন যে এই মানবসম্পর্কের মধ্যে এক-জনের প্রবল স্বার্থপরতার যে ভূমিকা বর্তমান, সে-ভূমিকা পশ্চিমি পেশাদার থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার চরিত্রগত মানসিকতা থেকেই উদ্‌গত, কোনো এক বিশেষ হেন্‌ড্রিক হোফ্‌গেনের চরিত্রগত ততটা নয়।

২

পেশাদার থিয়েটারের এই স্বভাবগত একমাত্রিকতা জাবো সংলাপের মাধ্যমেই ধরিয়ে দেন বারবার। হোফ্‌গেন যখন বিপ্লবী থিয়েটারের কথা বলে, তখনও তার কথা : 'বিপ্লবের জন্যও পেশাদার দরকার !' ('Even revolutions need professionals !') জর্মানিতে যখন প্রতিক্রিয়া ছড়াচ্ছে তখন তার কথা : জর্মানিতে যা-ই ঘটুক না কেন, থিয়েটার তো থাকবে।' ('No matter what happens in Germany, there will be theatre !') কিংবা, 'আমার একমাত্র জবাব : হ্যামলেট !' ('This is my only answer : Hamlet !')। থিয়েটারের প্রতি এই আত্যন্তিক একাগ্র আকর্ষণ, নেশা, পেশা, বিশ্বাস, আদর্শ একাকার করে একই বিন্দুতে মিলিয়ে দেবার লোভ, কেবলমাত্র 'ভালো' বা 'সৎ' থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার শেষ পর্যন্ত থিয়েটারকে বৃত্তিচ্যুত করে, লক্ষ্যচ্যুত করে। যে একদা ব্রেশ্‌ট্-এর নাটকে থিয়েটারের বিপুল বিস্তৃতি খুঁজেছিল ('the days of the peepshow are over'), সে-ই অচিরেই ভালো থিয়েটারকে বাঁচাবার নামেই বিশ্বাসঘাতক হয়, প্রথমে স্ত্রী ও প্রেয়সীর প্রতি, তারপর সহকর্মীদের প্রতি, তারপর নিজের শিল্পেরই প্রতি, যখন নাৎসি প্রভুদের মনোরঞ্জনার্থ 'হ্যামলেট'-এর 'জর্মানিক' ভাষ্য রচনা করে সে (যদিও তখনও সে সততার

দাবি করতে পারে, কারণ কে অস্বীকার করবে হ্যামলেট ডেনমার্ক-এর রাজকুমার, প্রাচীন জর্মেনিয়ার অধিবাসী ? আর কেই বা অস্বীকার করবে শিল্পীর নবব্যাখ্যার অধিকার ?) থিয়েটারের প্রতি এই ভালোবাসায় থিয়েটারেরই প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আয়রনিকে জাবো ধরেছেন শেষ দৃশ্যের প্রায় ধ্রুপদী বিন্যাসে। ছবি শুরু হয়েছিল স্পটলাইটের বৃত্তে অবরুদ্ধ আদৃত যে অভিনেতাকে দিয়ে, ছবি শেষ হয় আবার তাকে দিয়েই। আবার স্পটলাইটের আলোয়। শুধু এবার সেই স্পটলাইট যেন শিকারীর মতো হেনড্রিক হোফ্‌গেনকে তাড়া করে ফেরে, তাকে বিদ্ধ করে বিধ্বস্ত করে। অথচ আয়রনির মজা, থিয়েটারে প্রাপ্তির যে শিখরে হোফ্‌গেন পৌঁছতে চেয়েছিল, সেই শিখরেই সে এসে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে। জেনেরাল গোয়েরিং তার হাতে তুলে দিচ্ছেন নুরেনবার্গ-এর বিশাল নতুন থিয়েটার (যা প্রায় সব পেটিবুর্জোয়া পেশাদার বা পেশাদারমনস্ক থিয়েটারকর্মীর স্বপ্ন, সরকারি দয়ায় বা দাক্ষিণ্যে নিজস্ব একটি থিয়েটারের সেই কামনা, যাতে অনিশ্চয়তা তথা সংগ্রামের ঝামেলার অবশেষে অন্ত)। এই দৃশ্যের আয়রনি দৃশ্যও বটে, কারণ সুউচ্চ সুবিশাল এই অ্যামফিথিয়েটারটি পেতে হোফ্‌গেনকে নামতে হয় সিঁড়ি বেয়ে নিচে, অনেক নিচে, যেখানে স্পটলাইটই যেন তাকে তাড়া করে নামিয়ে নিয়ে যায়! যে আলো তাকে এতদিন লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, সেই আলোই যেন এবার তাকে আক্রমণ করে নগ্ন করে দেয়, যাতে বেরিয়ে আসে সেই আর্ত উচ্চারণ : 'ওরা কী চায় আমাদের কাছে ? আমি তো একজন অভিনেতা মাত্র' ('I'm only an actor')। যাকে এক সাক্ষাৎকারে জাবো বলেন, 'আত্মাবিষ্কার। এবং ক্যাথারসিস—মোক্ষণ ও শুদ্ধি' ('An illumination. And a catharsis – a purging and a cleansing', *Film Quarterly*, 35. 4)।

উক্ত সাক্ষাৎকারে জাবো বলেন, বুদ্ধিজীবীদের নিরাপত্তার লোভে আত্মসমর্পণ ও ক্ষমতাবানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের যোগে কাজ গুছিয়ে নেবার প্রবণতাই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য, যদিও নিরাপত্তা ও সাফল্যের প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণের ব্যাধি অভিনেতাদের মধ্যে বিশেষ তীব্র বলে তাঁর বিশ্বাস ('This film is, among other things, about the ability to be reduced…As for the intellectuals, the security problem is greater than it is for those who work with their hands in fields or factories…This treasonous dynamic may be even more powerful among certain strata of the intellectuals, as exemplified by Gruendgens. For such a man, the right connections mean more than anything else. The security-lust, in the Nazi period as well as in our own, is probably most evident among the petit-bourgeoisie…

Of course, for an actor success has a special radiance. But the moral is almost painfully universal : you should not strive for success at any cost'.) আপস করতে করতে গ্রুয়েন্ড্‌গেন্‌স্‌-হোফ্‌গেন-এর (গ্রুয়েন্ড্‌গেন্‌স্‌ নামে বিখ্যাত অভিনেতার জীবনী অবলম্বনেই ক্লাউস্‌ মান লিখেছিলেন 'মেফিসটো' নামে মূল উপন্যাসটি) অগ্রগমনের বৃত্তান্তে জাবো একটি নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা করেন, যখন ইহুদি সহকর্মীকে বাঁচাবার ভরসায় পরম প্রত্যয়ী হোফ্‌গেন গোয়েরিং-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় । জাবো যেভাবে হোফ্‌গেন-এর এই গোয়েরিং-যাত্রা সাজান, তাতে অনেক অফিসারের অনেক টেবিল, অনেক সিঁড়ি, অনেক বারান্দা (ইংরেজির পরিচিত রূপকালংকার 'করিডর্জস্‌ অফ পাওয়ার'), অনেক চোখের সতর্ক সজাগ দৃষ্টি বেয়ে হোফ্‌গেনকে গোয়েরিং-এর কাছে পৌঁছতে হয় । তার এই দীর্ঘ হাঁটার অভিনয়ে রয়েছে অভিনেতার স্বভাবোচিত আত্মপ্রক্ষেপণ ও অবিচল আত্মবিশ্বাস—জাবো-সাক্ষাৎকারের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে যার আভাস, প্রাতিষ্ঠানিক আস্থায় নিশ্চিন্ত বুদ্ধিজীবীর সেই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস যাতে সে ভাবে, প্রভুরা বুঝি শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারে তারই কথায় ওঠে বসে, প্রভুদের কাছে তার সম্মান বুঝিবা অলঙ্ঘনীয়, অটল । হোফ্‌গেনের সেই মূঢ় আত্মবিশ্বাস ভাঙে গোয়েরিং-এর চিৎকৃত 'বেরিয়ে যাও, অভিনেতা !' ('Get out, Actor !') উচ্চারণে । ইংরেজি 'অ্যাকটর' কথাটির জর্মান প্রতিশব্দ প্রায় একই ধ্বনি । রল্‌ফ্‌ হপ্‌-এর উচ্চারণে কথাটি প্রবল অবজ্ঞা ও ঘৃণার প্রতিভাস পায় । তারপর আবার সেই পুরনো পথ বেয়ে, সেই একই চোখের চাহনির সামনে ফিরে আসা—হোফ্‌গেনের হাঁটা, শরীরের আড়ষ্ট কুঁকড়ে যাওয়া, এবং অনুসারী দৃষ্টিগুলির মধ্যে কিসের যেন ঝিলিক, এইসব মিলিয়ে জাবো তৈরি করে দেন একটা ইমেজ-এর বিপর্যয় ।

৩

অভিনেতা-বুদ্ধিজীবী-নিরাপত্তামোহ-আত্মসমর্পণ-আত্মবিক্রয়ের এই অত্যন্ত তাৎপর্যগভীর স্তরটির নিচে আরেকটি স্তরে গ্যোয়টে-র 'ফাউস্ট' নাটক ও ফাউস্ট মিথ্‌-এর অনুষঙ্গের একটি জমি আছে 'মেফিসটো' ছবিতে । বস্তুত 'ফাউস্ট' নাটকাভিনয়ে মেফিসটোর ভূমিকায় ক্লাউস মারিয়া ব্রানডাউআরের মুখসজ্জার মূর্তিটি ছবির সবচেয়ে স্মরণীয় রূপকল্পগুলির অন্যতম । মুখসজ্জাটি মুখোশের, মাইম-এর 'হোয়াইটফেস মাস্ক' । গ্যোয়টের নাটকে মেফিসটোর ভূমিকা 'সিডিউসার'-এর । সে ঈশ্বরের সঙ্গে বাজি রেখে বুদ্ধিজীবী ফাউস্টকে নারী ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাকে কক্ষচ্যুত করে । বুদ্ধি তথা যুক্তিই বুদ্ধিজীবীর প্রধান অবলম্বন । অথচ সেই বুদ্ধি সে ব্যবহার করে পশুর মতো, কেবল নিজের নিরাপত্তা ও

স্বার্থের প্রয়োজনে। 'তার জীবন হয়তো অতটা খারাপ হতো না, / যদি না তুমি তাকে দিতে স্বর্গের আলোর একটি দ্যুতি ; / যাকে সে নাম দিয়েছে যুক্তি, ব্যবহার করে / কেবল যে-কোনো পশুর চেয়ে পাশবিক হতে।' সেই বুদ্ধিজীবী প্রবণতার রন্ধ্রপথেই মেফিসটো ফাউস্টকে নষ্ট করে। হেনড্রিক হোফ্‌গেন-এর মতোই ফাউস্টও গ্রেচেনকে ব্যবহার করে, প্রবঞ্চনা করে ; নিজের গা বাঁচিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত ; নিজের মাহাত্ম্যের মোহে সদা মুগ্ধ থাকে ; ভাবে মেফিসটো-কে সে-ই চালাচ্ছে, অথচ চালিত হয় পুতুলের মতো। ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফাউস্ট সম্পর্কে মেফিসটোর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্‌বাণী : 'সে মাটির ধুলো খাবে—খাবে লোভীর মতো / কাহিনী ও গানে গ্রথিত আমার আত্মীয় সর্পের মতো।' লোভ ও শঠতা, নীচতা ও সরীসৃপগতি, বুদ্ধিজীবীর চারিত্র্যনির্ণয়ে এই ব্যঞ্জনাগুলি গ্যোয়টে থেকেই কি জাবো-তে আসে ? ফাউস্ট-এর প্রথম আত্মঘোষণায়ও উল্লেখযোগ্য : 'কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় নেই আমার / শয়তানকে ভয় করি না, ভয় করি না কেউ পোড়াবে আমায়, / আর তাই সব সুখ ফসকে গেছে আমার হাত থেকে ; / আমি আমার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারি না, / আমি আমার মন উন্মুক্ত করে দিয়ে/ জ্ঞান বিতরণ করে মানবজাতির কল্যাণসাধন করতে পারি না।' পরে ভাগ্‌নারকে ফাউস্ট বোঝায়, যারাই জনতার অনুভূতি ও কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে তারাই মরেছে বধ্যভূমিতে। তাই ফাউস্ট-এর পথ নান্দনিক শুদ্ধতার পথ, প্রকারান্তরে যা নিজের গা বাঁচিয়ে শিল্পসাধনার পথ, হেনড্রিক হোফ্‌গেনের পথ, অনাবিল 'ভালো' থিয়েটারের পথ। কিন্তু জাবোর মেফিসটো-হোফ্‌গেন কেবল ফাউস্ট নয়, একাধারে ফাউস্ট ও মেফিসটো। হোফ্‌গেন-কে অন্য কেউ প্রলুব্ধ করে কক্ষচ্যুত করে না। সে নিজেকেই নিজে প্রলুব্ধ করে। সেই ভূমিকায় হোফ্‌গেনই মেফিসটো। ফাউস্ট পুরাণে মেফিসটোর বহুরূপী প্রতিভা কি অভিনেতা-অভিনয়েরই মিথ-এর রূপক নয় ? আবার সেই মেফিসটো-মুখোশই হোফ্‌গেনের মুখ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে ফাউস্ট-এর মতো পতনের পথে টেনে নিয়ে যায়, একের পর এক বিশ্বাসঘাতে লিপ্ত করে। এই ফাউস্ট-মেফিসটো অভেদে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবাদী আত্মহননেরই এক মিথ রচনা করেছেন জাবো। মুখোশ-মুখের প্রবল ইমেজে সেই মিথ বিধৃত হয়।

ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের পরিমণ্ডলে থিয়েটার তথা পারফরমিং আর্টকে টিঁকিয়ে রাখার অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি আরো দুটি সমকালীন ইয়োরোপীয় ছবি, ফাসবিনডার-এর 'লিলি মারলীন' ও ত্রুফো-র 'দ লাস্ট মেট্রো' (দুটি ছবিই গত বছর নিউইয়র্কে লিংকন প্লাজার ত্রিকক্ষ প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি দুটি কক্ষে একই দিনে দুপুরে-রাত্রে দেখেছিলাম, পরের দিনই রাস্তার অন্য পারে মুখোমুখি লিঙ্কন সেণ্টারে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে 'মেফিসটো' দেখি)-র সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, ফাসবিনডার ও ত্রুফো দুজনেই

যেখানে হলিউডের চিত্রাচরিত্র আদলে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে শিল্পের প্রাণপণ আত্মরক্ষার রোম্যান্টিক বিলাসে মজে যান (ফাসবিণ্ডার কি এই একবারই লিলির গানের বহুধাব্যাপ্ত জনপ্রিয়তার ছবি আঁকতে গিয়ে একই গানের ধারায় বহু যুদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈনিকের মুগ্ধ রসাস্বাদনের প্রায় বিজ্ঞাপনী ছবির মনতাজের সহজ জৌলুসে নেমে যান ?), জাবো গেছেন অনেক গভীরে ; এতই গভীরে যে যুদ্ধও হয়ে ওঠে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিস্থিতিরই রূপক, আর তার মধ্যে অভিনেতার নিরাপত্তালোভী আত্মরক্ষা বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষত অভিনেতৃসমাজে আত্মবিক্রয়ের রূপক । তার মধ্যে যেন আমরা দেখতে পাই অতিপরিচিত সমকালীন সমদেশী একাধিক অভিনেতা ও বুদ্ধিজীবীর বাস্তব ইতিহাসের দলিল ।

উসকি রোটি প্রসঙ্গে

প্রদীপ্তশঙ্কর সেন

সত্যজিৎ রায় এখনও একমেবাদ্বিতীয়ম । কিন্তু পরিবর্তন শুরু হয়েছে । কলকাতায়, বোম্বাইতে এমনকি দাক্ষিণাত্যেও । কয়েকটি ছবিতে দু'একজন প্রবীণ এবং বেশ কিছু নবীন পরিচালকেরা নতুন সম্ভাবনার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন । এদের অনেকেই আবার বয়সে তরুণ তাই হয়ত প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করবার সময় হারান নি । ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে 'নিউ ওয়েভ' এই উক্তি এখন আর অশ্রাব্য নয় । সত্যজিৎ রায়ও নতুন কিছু যে ঘটছে সেকথা স্বীকার করেছেন । তাঁর অন্য মতামতের কথা স্বতন্ত্র ।

পালাবদলের পালা । শুনতে গালভারি লাগে । এবং সত্যসত্যই চিত্রজগতের পরিচিত পালা বদলে দেওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে । কিন্তু কিছু পরিচালকদের স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গী, ভিন্ন মেজাজ পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত । এবং এর সঙ্গে যদি পরিশীলিত বুদ্ধি এবং মার্জিত রুচি জোড়া যায় তাহলে ব্যাপারটা নিরেস থাকে না । যে যাই বলুন । আজকে বোম্বাইতে মণি কাউল, বাসু চ্যাটার্জী, সত্যপাল দুবে, রাজীন্দর বেদী, কান্তি-লাল রাঠোর ইত্যাদিরা যে নতুনত্বের সাড়া তুলেছেন তা অস্বীকার করা যায় না । বাসুবাবুর 'সারা আকাশ' কলকাতাতেও প্রদর্শিত ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই । তা সীমাবদ্ধ হলেও উল্লেখ্য । বেদীর 'দস্তক' দিল্লী ও কলকাতা শহরে বক্সঅফিস সাফল্য অর্জন করেছে । দুবের 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' আমি দেখিনি । তবে দুবের স্বল্পদৈর্ঘের ছবি যেটা তাঁর চিত্রপরিচালনায় হাতে খড়ি সেই 'অপরিচয় কা বিন্ধ্যাচল' দেখার সুযোগ হয়েছে ।

অপরিচ্ছন্ন হলেও এই ছবিটি গতানুগতিক চিত্রপদ্ধতির বিরুদ্ধে তুবের বিদ্রোহ ঘোষণা সূচিত করেছে। 'শান্ততা' এবং রাঠোরের 'কঙ্কু' আঞ্চলিক ভাষার ছবি, যথাক্রমে মারাঠি এবং গুজরাটি।

বিদ্রোহের ছাপ মণি কাউলের 'উসকি রোটি'র সর্বাঙ্গে। একটি পুরুষ এবং একটি নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। প্রেমের ছক নয়। তবু এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? এই প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু 'উসকি রোটি' হিন্দি সিনেমার বহুলপরিচিত শব্দ এবং গল্প ছকের জ্যামিতিক প্রাঙ্গণে বাঁধা নয়। আজকাল অবশ্য কিছু ছবি হয় যা প্রেমের ত্রিভুজে আবদ্ধ নয়। কিন্তু 'উসকি রোটি' শুধু সেইটুকু মাত্র তফাৎ থেকে বিচার্য নয়। কাউল তো কাহিনী বিন্যাসের ধারাকেই নতুন করে ভেবেছেন।

দৃশ্য হতে দৃশ্য এবং দৃশ্যের সংযোজনে কাউল প্রচলিত ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী নন। সংযোজনের চাইতে বিভাজনের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। ফ্রেমগুলো টুকরো টুকরো, ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। তবে এ কেমন ছবি? কিন্তু ঐ মেয়েটি? যে এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা রুটি তরকারি নিয়ে বাস রাস্তায় অপেক্ষা করে? কিসের অপেক্ষা, কার জন্য? অপেক্ষা এবং অপেক্ষা এবং অপেক্ষা। ছবির গতি, গল্পের স্রোত নিয়ামক ট্রাফিক পুলিশ? ছবি এখানেই থামছে, এখানেই মোড় নিচ্ছে। পরিচালকের এই 'তিতিক্ষা' স্বেচ্ছাকৃত। ধৈর্য্যের পরীক্ষায় আমরা কেউ পাশ, কেউবা ফেল।

পরিচালকের 'তিতিক্ষা' বলছি কারণ আঙ্গিক তাঁর স্বঅঙ্কিত। এবং প্রথাগত আঙ্গিকের অবমাননা করার এই যে উৎসাহ তা এতই প্রচণ্ড যে 'উসকি রোটি' সহজবোধ্য হতে পারে না। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে কাউলের ছবি কোন আপাতবোধ্য সামগ্রিক আকার ধারণ করে না।

মেজাজের দিক থেকেও কাউলের স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিষ্কার। বলা যেতে পারে বয়সে তরুণ হওয়ার জন্যই যেন ছবির চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব। তাদের মধ্যে কোন গভীরতার ছাপ আমরা পাই না।

'উসকি রোটি' যেন কোন নির্দিষ্ট সময় পর্দাতেও আবদ্ধ নয়। ছবি দেখার পরে অবশ্য অনেকের কাছে শুনেছি এবং একটি ইংরাজী সারাংশেও পড়েছি যে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই কাউল ছবির ঘটনাচক্রের আবর্তন ঘটিয়েছেন। এই ভাষ্য মানতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে দিনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী যে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোজনী কি? ভাষ্য, দৃশ্য অথবা সঙ্গীত? রুটি নিয়ে অপেক্ষা করা এবং দিনের শেষে সেই বিশেষ পুরুষটির হাতে তা তুলে দেওয়া নির্দিষ্ট নির্ঘণ্টের মধ্যে বাঁধা যেতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়টুকু? ছবি কি তখন অতীতচারী? ভবিষ্যৎবিলাসী? নাকি বর্তমানের সময়পুরে সঞ্চারমান? কিছু বোঝবার অবকাশ নেই।

বোঝবার অবকাশ নেই মেয়েটি এবং বাস ড্রাইভারের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ? একবার মেয়েটি বাসস্টপে অপরিচিত পুরুষের কাছে ড্রাইভারটিকে তার 'ঘরওয়ালা' বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট ?

'উসকি রোটি'র প্রায় সর্বত্রই এই রহস্যের হাতছানি। ছবির শুরুতে যে হাতটি থেকে গাছের পাকা ফল ছবির দ্বিতীয় মেয়েটি গ্রহণ করে সম্পাদনা এবং গ্রন্থনার জন্য তখন রহস্য উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে। পরেও যে মৃতদেহটি বদ্ধ নালা থেকে উদ্ধার করা হয় সেটি কার ? তার তাৎপর্যই বা কি ?

ছবির আরম্ভ আশ্চর্য সুন্দর। কাল পর্দার উপর দিয়ে সাউণ্ডট্রাকে ভেসে আসে ভারী কোন যন্ত্রযানের চলার আওয়াজ আর মাঝে মাঝে নিঃস্তব্ধ দুপুরে যেমন কাকের আওয়াজ সেইরকম বায়সকণ্ঠ। তারপর লম্বা শটে কতগুলি সারি সারি গাছ মাঠের প্রান্তে, একটি মেয়ে। ক্লোজে আসে ক্যামেরা। মেয়েটিকে আরো পরিষ্কারভাবে দেখি। গাছের পাশ থেকে একটা হাত বেরিয়ে আসে। একটা ফল মেয়েটির হাতে দেয়।

ছবির নানান দৃশ্যেই যা আমাদের বার বার অবাক করে তা হল কাউলের 'ফ্রেম'। প্রতিটি শট, প্রতিটি দৃশ্য যেন মেপে মেপে বসান এবং যেন তুলি হাতে করে পর্দায় আঁকা। দূর পাঞ্জাবে একটি গ্রাম জীবন্ত হয়ে উঠেছে পরিচালকের ক্যামেরা-চোখের প্রসাদগুণে। সব কিছুই যেন এঁকে বসিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। 'উসকি রোটি'র ক্যামেরা পরিচালক কে. কে. মহাজনকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি অমৃতা শেরগিলের নাম করেন।

কাউলের ছবি রসোত্তীর্ণ কিনা এই প্রশ্ন ছবির শেষে থেকেই যায়। অবশ্য এই কথা আমি মানি না যে 'উসকি রোটি' ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কাউল ভারতীয় চলচ্চিত্রে কাউকেই তাঁর পূর্বসূরী বলে মানতে চান না। তারুণ্যের তেজ এবং অস্থিরতা দুইই তাঁর ছবিতে প্রতিফলিত। গতানুগতিক এবং তথাকথিত হিন্দি তথা ভারতীয় সিনেমার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ইত্যাদিকে ধরেও তিনি যথার্থই একজন 'রাগী' ছোকরা। তাঁর ছবি ভারতীয় সিনেমাকে আরো আধুনিক, আরো ঋজু করে তুলবে বলেই মনে হয়।

আমরা তো একথা জানি যে চলচ্চিত্র এমন এক শিল্প যা শুধু বয়সে নবীন নয়, যার উপাদান, যার কলাকৌশল, যার আঙ্গিক নিত্যপরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই চলেছে, যার বিবর্তনের মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি। চলচ্চিত্রে অগ্রণী পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যদেশের জাপানের ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তো একথা মানবেনই। কাউল যদি ভারতীয় সিনেমার দিগন্তকে আরো একটু প্রসারিত করে থাকেন তাহলে আমাদের আপত্তিই বা কেন হবে ?

আকিরা কুরোসোয়ার 'ইকিরু'

সুনীত সেনগুপ্ত

ইকিরু সম্ভবত আকিরা কুরোসোয়ার ত্রয়োদশ ছবি। এর নির্মাণকাল উনিশ শ একান্ন-বাহান্ন সাল, অর্থাৎ প্রায় সতের আঠার বছর আগেকার ছবি। সময়ের এই দীর্ঘ দূরত্ব সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় এই কি বিষয়বস্তুতে কি আঙ্গিক প্রয়োগে ছবিটির আবেদন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। সম্প্রতি ছবিটি কলকাতায় দেখান হয়। ইকিরু সমেত কলকাতায় এ পর্যন্ত কুরোসোয়ার মোট ছ খানি ছবি দেখান হয়েছে। অন্যগুলি হলো রশোমন, সেভেন সামুরাই, থ্রোন অব ব্লাড, হাই এ্যাণ্ড লো ও রেড বিয়ার্ড। এই ছয়খানি ছবি দেখার পর পরিচালক হিসেবে কুরোসোয়ার মানসিকতার একটা মোটামুটি ধারণা দর্শকের কাছে গড়ে ওঠে। তাঁর শেষ ছবি রেড বিয়ার্ড। এরপর তিনি আর ছবি করেন নি। শোনা যায়, তাঁর ছবির প্রধান ব্যক্তি তোসিরো মিফুনের সাথে তার মনোমালিন্য ঘটে গেছে। রেড বিয়ার্ড ছবিতে অভিনয় করার সময় মিফুনকে দীর্ঘকাল দাড়ি রাখতে হয়েছিলো, ফলে অন্য ছবিতে তিনি কাজ করতে পারছিলেন না। ছবিটি তৈরী হতে প্রায় দু আড়াই বছর সময় লেগেছিলো। এই নিয়ে বিবাদের শুরু। যদি এ জনশ্রুতি সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। আকিরা কুরোসোয়ার ছবিতেই তোসিরো মিফুন প্রথম অভিনয় করেন, উনিশ শ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ সালে। ছবিটির নাম ড্রাঙ্কেন এ্যাঞ্জেল। এরপর একমাত্র ইকিরু ছাড়া অন্যসব ছবিতে, মোট সংখ্যায় ষোলখানি মিফুন প্রধান চরিত্রে রূপদান করে আসছেন। পৃথিবীর অন্য কোন পরিচালকই বোধ হয় কোন একজন অভিনেতাকে নিয়ে এত সংখ্যক ছবি করেন নি। একথা অনস্বীকার্য যে অভিনেতা হিসেবে তোসিরো মিফুন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। নানারূপ বিচিত্র চরিত্রে রূপদান করতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। যে সামুরাই চরিত্রের রূপায়ণ কুরোসোয়ার ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সকল চরিত্রে রূপদান একমাত্র মিফুনের দ্বারাই সম্ভব। বস্তুতপক্ষে তোসিরো মিফুন স্বীকার করেছেন আকিরা কুরোসোয়াই আমার নিজের কাছে আমার অভিনেতার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন [···it was he who first introduced me to myself as an actor—Toshiro Mifune]

আকিরা কুরোসোয়া জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার ও শিল্পী। তাঁর ছবির যথার্থ মূল্যায়ন শ্রমসাধ্য। তিনি উনিশ'শ তেতাল্লিশ সাল থেকে ছবি করছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি ছবি করেছেন। তাঁর প্রতিটি ছবির পটভূমিকা যেমন বিস্তৃত বিষয় চিন্তা তেমনি গভীর। রশোমন (১৯৫০) এর মতো কাহিনীকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ

হতে পারে সে যুগে বোধ হয় কেউ ভাবতে পারে নি। বা সেভেন সামুরাই এর মতো বিস্তৃত জীবন কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়ণ সম্ভব এ চিন্তা একমাত্র কুরোসোয়ার দ্বারাই সম্ভব। জাপানীদের তুলনায় দীর্ঘ, শান্ত ও গম্ভীর স্বভাবের মানুষ কুরোসোয়া। তাঁর শক্ত সবল হাত দুটি দেখলেই বোঝা যায় যে তিনি অক্লান্ত কর্মী মানুষ। নিজের সম্পর্কে বা তাঁর ছবি সম্পর্কে তিনি মুখ খুলতে নারাজ। আমার ছবি দেখে তোমরা যতটুকু বোঝ শিল্পী হিসেবে ততটুকুই আমার সার্থকতা।

আমি এ পর্যন্ত কোন সমালোচকের লেখায় আকিরা কুরোসোয়ার ছবির নিন্দা পড়িনি। হয়ত শিল্প হিসেবে তাঁর সবকটি ছবিই সমান মূল্য পায় নি। তবে খুব সাধারণ ছবি তিনি একখানিও করেন নি। এর প্রধান কারণ পরিচালক হিসেবে আকিরা কুরোসোয়ার বিশেষত্ব এই তিনি কখনও হেলাফেলায় কোন ছবি করেন না। প্রতিটি ছবি করার সময়ই তার শ্রম যত্ন চিন্তা ও অধ্যবসায়ের কোন ত্রুটি থাকে না। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে ছবি রচনা করলেও আকিরা কুরোসোয়া প্রধানত তাঁর সকল ছবিতেই সত্যের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেন, সেই সাথে তাঁর অধীত জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষ সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছে, সত্য কি, বাস্তবের সাথে কল্পনার সম্পর্ক বা পার্থক্য কতখানি, মৃত্যুর আলোকে জীবনের মূল্য কি—প্রধানত এই তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। জাপানী ছোট গল্প ও রূপকথা থেকে স্থরু করে আধুনিক উপন্যাস বা সেক্সপীয়র, ডস্টয়ভস্কি, গোর্কির উপন্যাসকে তিনি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। জাপানের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্ক সত্বেও তাঁকে অতি আধুনিক মানুষ বলে অভিহিত করা যায়। জাপান তাঁর ছবির পটভূমিকা। জাপানী মানুষ তাঁর ছবির নায়ক নায়িকা। জাপানী কাহিনী তাঁর ছবির বিষয়বস্তু—মানসিকতায় তিনি পাশ্চাত্যের যে কোন প্রধান পরিচালকদের সমকক্ষ।

জাপানী ছবি সম্পর্কে সাধারণ অভিযোগ এই, ছবিগুলি খুব দীর্ঘ ও মন্থর গতি-সম্পন্ন। ক্যামেরা প্রায় অচল থাকে, ঘটনার বিবর্তনও হয় কম। কুরোসোয়ার ছবি সম্পর্কে একথা একেবারেই বলা চলে না। তাঁর প্রায় সব ছবিই (যে কটি অন্ততঃ আমরা দেখেছি) অসম্ভব গতিসম্পন্ন। সেভেন সামুরাই বা থ্রোন অব ব্লাডের চেয়ে গতিসম্পন্ন ছবি আর কি হতে পারে? আসলে কুরোসোয়ার ক্যামেরা চালনার স্টাইল পাশ্চাত্যের পরিচালকদের মতো [He is the most western amongst the Japanese directors], পাশ্চাত্য দেশে কুরোসোয়ার ছবির প্রচণ্ড কদর। তাঁর দুখানি প্রধান ছবির ইংরেজি সংস্করণ নির্মিত হয়েছে।

সেভেন সামুরাই অবলম্বনে 'দ্য ম্যাগনিফিসিয়েণ্ট সেভেন' এবং রশোমনের অবলম্বনে 'দ্য আউটরেজ'। দুটি ছবিরই চিত্রনাট্য কুরোসোয়ার তৈরী। সম্প্রতি শোনা গিয়েছিলো

আকিরা কুরোসোয়া রেড বিয়ার্ডের পর হলিউডে একখানি ছবি তৈরী করবেন। কিন্তু কোন কারণে সে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নি। নিজের উপলব্ধিতে যা তিনি ধ্রুব সত্য বলে জেনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন কিছুর সাথে কুরোসোয়া কোনদিনও আপোষ করেন নি। তাঁর চেহারার মধ্যে বাইরের প্রশান্তি দেখে হয়ত কিছুই বোঝা যায় না তাঁর অগ্নিগর্ভ অন্তরের কথা। এই জন্যেই কুরোসোয়া মহৎ ব্যাপক ও গভীর।

ইকিরু ছবিটি নির্মাণের পূর্বে আকিরা কুরোসোয়া ডস্টয়ভস্কির 'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাস অবলম্বনে একটি ছবি নির্মাণ করেন। ডস্টয়ভস্কির উপন্যাসের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কথা জানা যায়। তিনি এক সময়ে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। টলস্টয় তুর্গেনিভ ডস্টয়ভস্কি তাঁর প্রিয় লেখক। ডস্টয়ভস্কির উপন্যাসের মত তাঁর ছবিতেও বিস্তৃত পটভূমি ব্যাপক জীবন গভীর মানবিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দরদ ও সহানুভূতির সাথে ডস্টয়ভস্কি জীবনকে দেখেছেন, ইকিরু ছবিতে মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে কুরোসোয়াও সমানুভূতিশীল। Ikiru is a film in the Dostoevsky manner—একথা কুরোসোয়া নিজেই স্বীকার করেছেন। মানুষের পাপবোধ তার বিচার হতাশা ভ্রান্তি অনিশ্চয়তা দ্য ইডিয়টের বিষয়বস্তু—এ ছবি করার পর ইকিরু ছবি নির্মাণের মধ্যে বিষয়বস্তু না হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা গভীর মিল লক্ষণীয়। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে ইকিরু ছবিটি তাঁর কোন আকস্মিক খেয়ালের সৃষ্টি নয়, তার সমগ্র জীবনের অন্বিষ্ট সত্যানুসন্ধানের সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। কোন কোন সময় আমি আমার মৃত্যুর কথা ভাবি, মনে হয় আমি যখন এ পৃথিবীতে থাকব না—এরূপ চিন্তা থেকেই ইকিরু ছবিটির পরিকল্পনা মাথায় আসে—কুরোসোয়া নিজেই এ কথা জানিয়েছেন।

ইকিরুকে কোন মতেই নির্দিষ্টভাবে জাপানী চলচ্চিত্র বলা চলে না। (যদিও শিল্পের এ জাতীয় জাত-বিচার এক হিসেবে অর্থহীন) এটা যে কোন দেশের ছবি হতে পারে। ছবির নায়ক ওয়াতানাবের মধ্যে কোন জাপানী বিশেষত্ব নেই, সে যে কোন দেশের মানুষের মত। যদিও জাপান এ ছবিতে বিশেষভাবে উপস্থিত তবুও যে জাতীয় সমস্যা খুবই সার্বজনীন। ওয়াতানাবে একজন কর্কট রোগাক্রান্ত মানুষ। জীবনের আয়ুষ্কাল তার প্রায় নির্ধারিত, এই প্রকার মানুষের জীবন সম্পর্কে যে ভয় আশঙ্কা দুঃখবোধ আকুতি হয় ওয়াতানাবেরও ক্রমান্বয়ে সেগুলি দেখা দেয়।

ইকিরু ছবিটির কাহিনী মোটামুটিভাবে এই—ওয়াতানাবে একজন প্রৌঢ় যে পৌর সংস্থার মতো একটি স্থানে জীবনের সেরা বছরগুলি খুব নিরুত্তেজ ও গতানুগতিকভাবে কাটিয়েছে। জীবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে হঠাৎ ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে সে কর্কট রোগাক্রান্ত। ক্রমশঃ তার মনে জেগে ওঠে ভয় ও সন্দেহ, মৃত্যুভয়ে সে তার জীবন

আত্মীয়স্বজন পরিচিত পরিবেশকে আকুল আকর্ষণে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও রিক্ত মানুষ। তার পুত্র মিৎসু বিবাহিত, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কে এক অলঙ্ঘ্য দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। তোয়া নামক একটি কিশোরী মেয়ের সাথে তার যদিও সাময়িক স্নেহ ও সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে তার স্থায়িত্ব বেশীদিনের হয় না। একজন নবীন লেখকের সংস্পর্শে এসে সে মদ উন্মত্ততা নারী ও উল্লাসের চিত্র-ও একে একে দেখে। কিন্তু কিছুতেই সে আকর্ষণ বোধ করে না। হতাশা বোধ যখন তার মনে তীব্র তখন সে স্থির করে ছোটদের জন্য একটি পার্ক তৈরী ক'রে যাবে এজন্যে সে জীবনের সর্বস্ব পণ করে বসে। ওয়াতানাবে যখন সুস্থ ছিলো নিয়মিত অফিস করত সেই সময়েই বহুদিন ধরে নাগরিকদের একটি আবেদনপত্র ফাইল চাপা অবস্থায় পড়ে ছিলো—শিশুদের জন্য খেলার একটি পার্ক তৈরী করার আবেদন। সে সময় সে হাত দেয় নি। এখন কেন সহসা সে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল ? পার্কটি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, একটি শীতের রাতে, ওয়াতানাবে একাকী গভীর তৃপ্তিতে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলো, তার কপালে মুখে কোন হতাশার কুঞ্চন ছিলো না, সে গান গাইছিলো, বহুদিনের পুরানো একটি প্রেমের গান ; সেই অবস্থায় সে প্রাণত্যাগ করে।

কুরোসোয়া এই কাহিনীটিকে শুধুমাত্র তাঁর বক্তব্যের কাঠামো হিসেবে রেখেছেন। আসলে চলচ্চিত্রে কাহিনীর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ছাড়া কুরোসোয়া গল্পের দিকে কোন সময়েই বেশী নজর দেন না। যাই হোক এখানে আমি কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করতে চাই, কুরোসোয়া কোন সময়েই তার ছবিতে কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করেন না। দুটি বা ততোধিক দৃষ্টিভঙ্গী মারফৎ একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেন। আলোচ্য ছবিটি শুরু করেন একটি এক্সরে প্লেট থেকে। এই এক্সরে প্লেট, ছবির নায়কের। মানুষটিকে দেখানোর পূর্বে তার রোগ সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করে দেওয়া, পরে তার জীবনের সকল কর্ম বা ব্যস্ততা অর্থহীন প্রমাণ করাই, হয়ত পরিচালকের উদ্দেশ্য। এই পারস্পেকটিভ-এর পরিবর্তনের জন্য ছবির কোথাও একটুও ক্ষতি হয় নি। বরং এর থেকে তৈরী হয়েছে কুরোসোয়ার নিজস্ব স্টাইল, এবং আরও গভীর ও ব্যাপক হয়েছে কুরোসোয়ার বক্তব্য। যেমন, যেখানে ছবিটি সবচেয়ে বেশী জমে ওঠে, ওয়াতানাবে যখন মনস্থির করে যে সে একটি পার্ক তৈরী করবে, তখন এই অর্থহীন বাঁচার থেকে তার কিভাবে মুক্তি হয় সে জন্য দর্শকের আগ্রহ প্রবল, এই সময় ঘোষকের কণ্ঠে শুনি এর পাঁচ মাস পরে ওয়াতানাবে মারা যান, খুব নিস্পৃহ, সাদাসিধে ঘোষণা, এ যেন হাতের তাসকে সাফ্‌ল করার মতো শেষাংশকে প্রথমে টেনে আনা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্তব্য, কুরোসোয়া অত্যন্ত সচেতন পরিচালক, তিনি কোন সময়েই নিটোল গল্প বলার পক্ষপাতী নন, বা দর্শকের কাছে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য যেভাবে কাহিনীকে

ঢেলে সাজালে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সে চিন্তা প্রশ্রয় দেন না। তাঁর এই ইচ্ছাকৃতভাবে পরের দৃশ্যকে আগে এনে, ক্রমশঃ তার বিশ্লেষণ করে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছেন, এতে তাঁর একটি প্রতিষ্ঠিত ডিকশন তৈরী হয়েছে। তিনি বোঝাতে চান মানুষ যা নিজের সম্পর্কে ভাবে সে নিজে কিছুতেই তা নয়। একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাও লোকমুখে ভিন্ন চেহারা লাভ করে। বাস্তবের সাথে ইলিউশনের এই সঙ্ঘাত চিরকাল চলে আসছে। ওয়াতানাবে একটি পার্ক তৈরী করে গেছে। সে আজ জীবিত নেই। এখনও তার কথা লোকমুখে বিরাজমান, আকিরা কুরোসোয়া দেখাতে চান, কাহিনীর এই প্রধান অংশ লোকের মুখ থেকে শোনা ভালো। কেননা এ সম্পর্কে এক একজন এক একভাবে বলে। কেউ বলে ওয়াতানাবেই সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় পার্কটিকে তৈরী করে গেছে। কেউ বলে তা হতে পারে না। অমন জিনিস তার একার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয়ত এই দুটি বা এমন বহু মন্তব্যের কোনটাই মিথ্যা নয়। কেন না বিভিন্ন লোকের ওয়াতানাবের কর্ম সম্পর্কে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা—যেহেতু তারা সত্যই এই ধারণা করে আছে এবং সত্য আপেক্ষিক তাই তাদের মতও সত্য। কুরোসোয়া এখানে একটু রহস্যময় অবস্থা তৈরী করেছেন। এই রহস্যকে আমরা ভাববো না। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই, কুরোসোয়ার দৃশ্যসংস্থাপন ও স্থায়িত্বে অসম্ভব পরিমিতি-বোধ। ছবিতে এমন কোন দৃশ্য নেই যাকে একটুও দীর্ঘ বা ক্লান্তিকর মনে হয়। দ্বিতীয়ার্ধে, ঘটনার বিশ্লেষণে আমরা মোট সাতবার ফ্লাশব্যাকে চলে যাই। অথচ কোনটাই পরিহার্য নয়। আমি এই বিষয়টির উপর ঈষৎ জোর দিতে চাই এর জন্যে, যে এমন বহু অভিযোগ শোনা গেছে, যখন দর্শকেরা বলেছেন, ইকিরু ছবির দ্বিতীয়ার্ধ কেন এমন ক্লান্তিকর ও দীর্ঘ করা হলো। বাস্তবের সাথে ইলিউশনের যেখানে প্রভেদটা দেখান হচ্ছে, যেখানে কাহিনীর বিশ্লেষণের অংশ সেখানে এছাড়া আর গত্যন্তর কি?

ছবির শেষ দৃশ্যটি ভোলা যায় না। ওয়াতানাবের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে দাঁড়িয়ে আছে দূরে—লক্ষ্য করছে শিশুদের কলরবে প্রাণোচ্ছল পার্কটিকে। তার কি মনে পড়ছে ওয়াতানাবের কথা? বা, নিজের জীবনের অর্থহীনতার কথা? বা কোন ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির কথা—এর যে কোনটাই হতে পারে।

জ্যামিতিক জানুসির 'স্ট্রাকচার অফ ক্রিস্টালস'

প্রলয় শূর

১৯৫৫ থেকে ৫৯ পর্যন্ত ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জানুসি ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র। এই সময়ই তিনি চলচ্চিত্রে শিক্ষালাভ করেছেন, ক্রাকোতে দর্শন পড়েছেন। ৬০ সালে Pwstif এর পরিচালনা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। ৬ বছর পরে Death of a Provincial ছবি ক'রে তিনি ডিপ্লোমা পেয়েছেন, ঐ ২৮ মিনিটের ছবিটা ভেনিস ম্যানহাইমে পুরস্কৃত। ইতিমধ্যে বার্গম্যানের ছবি লোড্জ ফিল্ম স্কুলের এই স্নাতককে উদ্দীপিত ক'রে তোলে। ৬৭ সালে টেলিভিশনের জন্য জানুসি একটা ২৫ মিনিটের ছবি করলেন Face to Face. ৬৮তে একটা ২৮ মিনিটের ছবি Attestation. ঐ বছরই সরাসরি সংস্কৃতি ও শিল্প মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে থাকা পোলিশ চলচ্চিত্রে বেশ কিছু সংস্কার সাধন হয়। পোল্যাণ্ডের তরুণ পরিচালকদের প্রায় সকলেরই শিক্ষানবিশীর মাধ্যম হল দূরদর্শন। ৬৯-এ তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি 'Structure of Crystals'. জানুসির তখন ঠিক ৩০ বছর বয়েস। এই ছবিতে তাঁর দুই নায়কের বয়স ৩৬ এবং ৩৭, কাহিনীবিন্যাসে তাঁকে সাহায্য করেছেন জেব্রোস্কি।

৭৭ মিনিটের এই ছবি জানুসিকে পোলিশ চলচ্চিত্রে এক নোতুন শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, যেমন একদা এক আশ্চর্য ক্ষমতায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন রোমান পোলানস্কি তাঁর নাইফ ইন দ্য ওয়াটার-এ। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত তাঁর ছবিতে জানুসি দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর ক্যামেরা। বিমূর্ত শিল্পী নন তিনি, তাঁর চরিত্রগুলি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে আধুনিক মানবের আন্তর সত্তার পরিচয়, আত্মপরিচয়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় চিত্রিত জানুসির চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলী। এরিক রোমার প্রসঙ্গের সীমানা যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে জানুসির জ্যামিতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে তাঁর দেশের বৈজ্ঞানিকেরা যেসব সমস্যা সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছেন জানুসি সেগুলোই তুলে ধরেছেন, দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরেছেন সেই বিরল উপলব্ধি। এক বিশেষ শৃঙ্খলায় গ্রথিত ক'রে প্রতিটি সংলাপকে তিনি ব্যবহার করেছেন সচেতন চিন্তার পর। বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতাব সঙ্গে যুগচেতনার প্রতীকী যোগ ছবিটিকে পোলিশ চলচ্চিত্রে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এমন উজ্জ্বল বিজ্ঞান চেতনা এমন আধুনিক বিজ্ঞানের ভাবনা ও বিজ্ঞানের চিত্রকল্প তখন কোথায় ?

চাঁপার কলিতে কবি ধরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র
খুলে যাবে কোমল দিগন্তে দিগন্তে
জ্যামিতিক গড়নের অঙ্কন।

আর কোনো ছবি সম্পর্কে এ কবিতা এমন সত্য নয়। কুব্রিকের '২০০১' ভিন্ন ধরণের ছবি, ঐ সময়ের ছবি, সমালোচকদের ভোটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাইশটি ছবির অন্যতম। বিজ্ঞান আমাদের প্রজ্ঞা বাড়ায় তবু জানুসি বিজ্ঞানে সব সমস্যার তল পান না। ব্যক্তি-জীবনে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই জানুসির সমাজ চেতনার বিকাশ। জানুসির এই অনুবীক্ষণের লেন্স-এ বিজ্ঞানের আবিষ্কার কেবল কৌতূহলের বস্তু নয়, পরন্তু বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এখানে রূপের অঙ্গ, এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিই আমাদের জীবনকে আকৃতি দিচ্ছে, জানুসির মাইক্রোস্কোপে যা প্রতিবিম্বিত। কথোপকথনের উপর ছবিটি গড়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে আমরা যে যুগোশ্লাভিয়ার Rondo ছবিটা দেখেছি তার সঙ্গে এ ছবির একটা আঙ্গিকগত মিল রয়েছে, হয়তো Structure of Crystals বাক্-সংযমে চেখভকে মনে পড়িয়ে দেয় এবং জুল এণ্ড জিমের ভাষা যেমন তার বিষয়বস্তু থেকেই উঠে এসেছে এখানেও তেমনি লেন্স আলো দৃষ্টিকোণের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে গোটা ছবিতেই বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গীর এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য আমরা লক্ষ্য করি।

মারেক এবং ইয়ান দুজনে কলেজে বিজ্ঞানের সহপাঠী ছিল। আজ দুজনেরই বয়স বেড়েছে, বয়সের সঙ্গে বেড়েছে জীবন সম্পর্কিত তাদের আদর্শগত ব্যবধান। সমাজ-গতির দ্বান্দ্বিক স্বভাবের ফলে আরেক স্তরে চলেছে আলোড়ন।

তুষারাবৃত এক বিচ্ছিন্ন শহরতলির দূর উচ্চভূমিতে বিবাহিত ইয়ান আবহাওয়া বিশারদের কাজ করে। স্ত্রী এ্যানকে নিয়ে সে সহজ জীবনযাপন করে। তার বন্ধু মারেক এখন পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, নিজের গাড়ি চালিয়ে উঠে আসে ইয়ানের বাড়ি আজ বহুদিন পর। সে কয়েকদিন থাকবে এবং থাকে। স্বামী স্ত্রী তাদের নির্জন জীবনযাপনে এমন প্রাণবন্ত সঙ্গী পেয়ে দুজনেই খুশি।

ইয়ান ধীর স্থির গম্ভীর কর্তব্যপরায়ণ অতিথিবৎসল বিজ্ঞানের প্রতি নৈতিক দায়িত্বে আবদ্ধ, চরম পেশাদারী সত্তায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারেক অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে ভরপুর মারেক তার শহুরে আভিজাত্য নিয়ে সফলতার সিঁড়িগুলো দ্রুত অতিক্রম ক'রে যায়। এ্যানের কাছে বহির্বিশ্বের গতি ও উত্তেজনা নিয়ে আসে মারেক। ছবির প্রথম দৃশ্যে এ্যান আর ইয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের পাশ দিয়ে দুটি শিশু চলে যাবার সময় এ্যান জিজ্ঞেস করে 'জামায় এত নোংরা লাগিয়েছ কোত্থেকে ?' তখনই গাড়ির শব্দ শোনা যায়, মারেকের গাড়ি। তাদের ছোট্ট এবং অগোছালো ঘরে এ্যান অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এই অতিথির সামনে, যেন একটু ভীরু ও মেয়েলী লজ্জায় সে মারেককে বলে, 'সামনের বছর আমাদের টি. ভি. এসে যাবে।' মাসের হিসেব কষছিল এ্যান। দাদু বলে, 'আমার ওষুধের কথা ভুলো না' স্বামী জানায় 'আমার বইয়ের কথা মনে রেখো' স্ত্রী বলে, 'আমার ব্লাউজ কিনতে হবে।' এই তাদের সংসার।

লবণ চিনি তুঁতে দেখতে স্ফটিকাকার। কোন কোন স্ফটিক দেখতে পিরামিডের ন্যায়, কোনটি গঠনে ত্রি-শিরা আকারের। বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিকের বিভিন্ন আকার দেখা যায়। লবণের স্ফটিকের ছয়টি সমতল পিঠ, ফটকিরির আটটি। কঠিন পদার্থের ঘন দ্রবণ বা বিগলিত কঠিন পদার্থ শীতল করে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট জ্যামিতিক আকারে গঠিত কঠিন দানাকে স্ফটিক বা ক্রিস্টাল বলা হয়। এতো প্রাথমিক জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসার চাই। নোতুন নোতুন গবেষণা চাই। বহু অর্থ ব্যয় ক'রে গবেষণা চালানো আমাদের উচিত নয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ও রাস্তাটা ঠিক নয়। এটা মারেকের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সে তার গবেষণার জন্য নিজের দেশের ওপর নির্ভর করতে পারেনি, তাকে ধনতান্ত্রিক দেশে কিংবা সোবিয়েৎ রাশিয়ায় যেতে হয়েছে। ইয়ানের ঘরে খাটের ওপর ব'সে মারেক তার পেপার পড়ে যায়, হাত নেড়ে নেড়ে ইয়ানকে তার তথ্য বিশ্লেষণ করে, তখন সে আত্মবিশ্বাসে উচ্ছল। অসামান্য নৈপুণ্যে জাহুসি এই দৃশ্যের গতিময়তায় শব্দ ও আলোকচিত্রকে একই স্তরে নিয়ে আসেন। ইয়ানও একটা যন্ত্র বানিয়েছে—Denaturator. যন্ত্রটা সে মারেককে দেখায়, মারেক এর ঠিক অর্থ খুঁজে পায় না। কারণ ঐ যন্ত্র থেকে জেগে উঠবে একটা অজানা সংগীতের অস্তিত্ব।

এ্যান জানে তার স্বামীও যোগ্য পুরুষ, তবু মাঝে মাঝে অভাবটাও বড় হয়ে দেখা দেয়। মারেক তাকে যেন কিভাবে আকর্ষণ করে। বসে বসে কাগজ পড়ে ইয়ান, এ্যান এবং মারেক নাচের জন্য পরস্পরের দিকে হাত এবং পা বাড়িয়ে দেয়।

ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ফার্টিলাইজার ফ্যাকটরির পাশ দিয়ে তারা গাড়ি চালিয়ে শহরের দিকে যায়। সিনেমা দ্যাখে। সেখানে নিউজরীলে আবার সেই ছবি দ্যাখে, দেশের অর্ধেক উৎপাদন কোথা থেকে হয়। দুই বন্ধু দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে, বার ধরে ঝোলে, তুষারে গড়ায়, পাঞ্জা কষে। কাঠের গন্ধ শোঁকে মারেক। দুই বন্ধুর মধ্যে খুব তর্ক বিতর্ক হয় না বটে কিন্তু এটা বোঝা যায় ধীরে ধীরে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আর তারা কেউ কাউকে বোঝে না। অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের সকলের সঙ্গে ইয়ান কথা বলে। মারেক তাতে অবাক হয়, 'তুমি এদের সঙ্গে কি নিয়ে এত কথা বলো' ইয়ান বলে, 'আবহাওয়া ছাড়া আর সব কিছু নিয়েই বলি।'

এ্যানের মাথার কোণে বাতি জ্বলছে। সে সোফায় ব'সে কিছু একটা খাচ্ছে। পাশের চেয়ারে ইয়ানের হাতে সিগারেট। টেবিলের ওপর এ্যাশট্রে, বীয়ারের গেলাস। উল্টোদিকের চেয়ারে মারেক। কেউ কোনো কথা বলছে না। এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মারেক বলে, 'কী শান্ত স্তব্ধতা একেবারে Chekhovian atmosphere.'

'কেন?'

'কিছুই ঘটছে না।'

এ্যান বলে, 'চেখভে তো উল্টো, সব সময়েই কিছু ঘটছে।'

ইয়ান বলে, 'তুমি চেখভ পড়েছ ?'

মারেক—'পড়েছি। বড় বিষণ্ণ। চেখভের থ্রি সিস্টারস আমি প্যারিসে দেখেছি।'

ইয়ান চেয়ার ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে যায়, 'কিভাবে চেখভ মারা গিয়েছিলেন জানো ?'

'না।'

'চেখভের টিবি হয়েছিল। সে আমলে টিবি সারতো না। চেখভ ছিলেন স্বাস্থ্য-নিবাসে। সেখানে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। একটা পার্টি দেয়া হোলো। চেখভ ঠাট্টা রসিকতা করছিলেন। শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে নিলেন। এক সিপ্ খেলেন। সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। নিঃশব্দে খুব শান্তভাবে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।'

একটা দুর্ঘটনায় ইয়ান ছমাস শয্যাশায়ী ছিলো। মারেক জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখন আর পাহাড়ে ওঠো না ?' ইয়ান বলে, 'না। দুর্ঘটনার জন্যে নয়। আসলে সময় পাই না।' মারেক আর ইয়ান একটা কারখানায় ঢোকে। একটা স্মৃতিখণ্ডে জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার ক'রে একটা শুকনো ফুলের ডাল কুড়িয়ে তার ওপরে রাখে ইয়ান, ধুসর অক্ষরগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তোমরা এখন যা, আমি একসময় তাই ছিলাম, আমি এখন যা, তোমরা একসময় তাই হবে, আমাকে মনে রেখো, যাতে তোমাকেও অন্য লোকে মনে রাখে।

একটা স্থানীয় স্কুলে মারেককে পরিচিত করান হয়। মারেক তার ভাষণে জানায়, আমরা এখন ডায়মণ্ড তৈরী করছি। একটা সময় আসবে যখন আমাদের তৈরী জুয়েলারীই লোকে ব্যবহার করবে, অবশ্যই যা কৃত্রিমভাবে তৈরী। আমাদের তৈরী জুয়েলারী হবে আসলের চেয়েও খাঁটি। মানুষ ছাড়িয়ে যাবে প্রকৃতিকে। খাঁটি ও কৃত্রিম ক্রিস্টালের বৈপরীত্য যেন সমান্তরাল মারেক ও ইয়ানের অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মারেক। সে বড় বেশি ব্যস্ত খ্যাতির সংগ্রামে নিজেকে টি'কিয়ে রাখতে। অবশ্যই সে জানে না এর পরিণতি কোথায়। সে বুঝতে পারে তুষারের এই নৈঃশব্দ থেকে ইয়ানকে বার ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সহরে একটা ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য লোভী নয় ইয়ান। এই শূন্যতায় তার কাজের জগতে সে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায়। এই নক্ষত্র জগতের বাইরে এমন সব জগৎ আছে যাদের আলো দূরবীণ-দৃষ্টিরও অতীত। সান্ত সসীম ও অনন্ত অসীমের আলোচনায় দুই বন্ধু বোঝে, মিলছে না দুজনের কোথাও মিলছে না। 'অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক ঢুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে

কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম ভাঙার মতো'—(বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ)। হয়তো ইয়ানেরই প্রশ্ন এটা, অঙ্ক দিয়ে তো সবই পাই, কিন্তু অসীমের মধ্যে আরম্ভটা কোথায় ?

মারেক আর ইয়ানের মাঝখানে ভাসতে থাকে এ্যান। স্বামীক সে ভালোবাসে এবং জানতে চায় সে কবে বোনাস পাবে কারণ ঐ টাকাটা খুব দরকার, এরই পাশে প্রতিষ্ঠিত মারেক তাকে মুগ্ধ করে, নিজের রুচির কথা এ্যান খুব জোরের সঙ্গেই জানাতে পারে, কারণ সে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করে। স্বামীর সঙ্গে তার বড় মধুর সম্পর্ক। গাড়ি চালাচ্ছিল মারেক, সে ইয়ানকে বলে, 'চালাবে নাকি ?' পিছনের সীটে বসে ছিল এ্যান। ইয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি চালাবো ?' এ্যান বেশ খুশি হয়েই বলে, 'চালাও না।' তারা জায়গা বদল করে।

কিন্তু যখন কেউ নেই, রান্নাঘরে সে এবং মারেক, হাতের ওপর চাটি মারার খেলায় তারা এত বেশি মত্ত হোয়ে ওঠে, দুজনের পেছনে যখন দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই, মারেকের বিস্মিত মুখখানা নেমে আসছে বিহ্বল এ্যানের মুখের ওপর, মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পায় এ্যান, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বেরিয়ে আসে মারেকের শরীরের পাশ থেকে, ঘর থেকে বেরোবার সময় এ্যান বলে যায়, 'জল ফুটলে আপনার চা বানিয়ে নেবেন।'

ছবির শেষে একটি শিশু তার হাতে একটা ভাঙা বোতলের তলার ভারী কাঁচের টুকরোটা নিয়ে মারেককে দেখিয়ে বলে, 'এই ছাখো ক্রিস্টাল।' লেনিনগ্রাডে বৈজ্ঞানিকরা আসছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাই বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেয় মারেক। ইয়ানকে সে বলে, 'ওদের সঙ্গে দেখা হবে।' ইয়ান বলে, 'দেখা হবেই।' মারেক বলে, 'একই কথা।'

তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে চারপাশটা।

সেই শীতলতম শূন্যতার ভিতর দিয়ে তার মোটর চালিয়ে ফিরে যাচ্ছে মারেক। প্রথম সকালের রোদ্দুরের তেজ এসে লাগছে তার চোখে। সকালের সূর্যও যেন সহ্য করা যায় না।

সে গাড়িতে ওঠার আগে ইয়ান তাকে বলেছে, 'গ্রীষ্মের সময় এসো, মাছ ধরা যাবে।' ছবির শেষে দূরবীণে কি অতিদূর অদৃশ্যলোক ফুটে উঠছে ইয়ানের দৃষ্টিপথে, তার বোধের সীমায় ?

ওয়াজদার উত্তরাধিকার থেকে এক সুনির্দিষ্ট দূরত্বে জাহুসি পোলিশ চলচ্চিত্রে ঋজু বিষয়বস্তুর পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর এই প্রথম ছবিতেই।

কাঞ্চন সীতা—একটি আলোচনা

সৈকত ভট্টাচার্য

হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও বিবর্তনের লোকশ্রুতিটি বেশ মনোরম। বর্বর অনার্য জাতি বাস করত ভারতে। সুসভ্য আর্যেরা এসে তাদের জয় করলেন, উজ্জ্বল হিন্দু সভ্যতার সূচনা হল। আর্য রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে রচিত হল রামায়ণ মহাভারত। রামায়ণের পুণ্য কাহিনী যে কত প্রাচীন তা বলে শেষ করা যাবে না। প্রাচীন ইতিহাসের নিরপেক্ষ গবেষকরা কিন্তু কেউই রামায়ণের কোন ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না। ৩০০০ খ্রী. পূ. তে আর্যেরা যখন নিজেদের দেশে প্রায় আদিম অবস্থায় আছে তখনই জগতের অন্যত্র মিশরীয়, বাবিলোন আর আসিরীয় সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতা ও গ্রীসের উন্নত সভ্যতার সূচনা হয়ে গিয়েছে। ২০০০ খ্রী. পূ. থেকে আর্যেরা অন্য জাতির দেশে দেখা দিতে শুরু করল। তারা ভারতে যখন এল মোটামুটি সভ্য দুটি বড় অনার্য জাতি তখন এখানে বাস করছে। সেই দ্রাবিড় ও কোলদের নিজস্ব ইতিহাস ছিল। আর্যদের সঙ্গে তাদের সংঘাত ও মিশ্রণে হিন্দু জাতির পূর্ণ রূপগ্রহণে সাহায্য হল। খ্রী. পূ. ১৩০০/১৪০০ বছর থেকে এই হিন্দু সভ্যতার আরম্ভ, যে সভ্যতার ইতিহাসে দুটি প্রধান যুগ ধরা যেতে পারে—যজ্ঞের প্রাধান্যের যুগ আর পৌরাণিক দেবতাদের গুরুত্বের যুগ। জি. অরবিন্দনের কাঞ্চন সীতা ছবির আলোচনার আগে এই কটি কথা রামায়ণ প্রসঙ্গে দরকারী।

ঠিক রিভিউয়ের পদ্ধতিতে নয়, কাঞ্চন সীতা দেখে যে সমস্ত প্রসঙ্গ ওঠে বা প্রশ্ন জাগে তার সম্ভাব্য বিশ্লেষণ বা উত্তরের মধ্য দিয়ে ছবিটিকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত আর্যদের নিজস্ব উপাসনা রীতি হল হোম। দেবতারা আকাশবিহারী, অগ্নি তাঁদের দূত। বেদী তৈরী করে তাতে কাঠেব আগুন জেলে সেই আগুনে দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘী, রুটি, মাংস, সোমরস আহুতি দিয়ে দেবতাদের খুশী করা হত। আর্যদের মূল রীতিনীতির মধ্যে পূজার প্রচলন ছিল না, প্রতিমা, চাল ফুল সিন্দুরের নৈবেদ্য, পশুবলি ও পশুর মাথা বা রক্তের নিবেদন এই সব আর্য রীতি নয়। পূজা শব্দটি মূলে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ রূপেই অনুমিত। অরবিন্দনের ছবিতে কিন্তু হোম আর যজ্ঞের পাশাপাশি রয়েছে অশ্ববলি আর কাঞ্চন প্রতিমা। ছবির মূল চরিত্রগুলিতে, যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে পৌরাণিক দেবতার গুরুত্ব পেয়েছে, অভিনয় করেছেন অন্ধ্র প্রদেশের উপজাতীয় অভিনেতারা, যাদের পূর্বপুরুষরা অতি অবশ্যই ছিলেন অনার্য। রাম এখানে বিষ্ণু অবতার, শিব ও উমার মত যে বিষ্ণু অনার্যদেরই বড় দেবতা, আর্য বাল্মিকী আর অনার্য বশিষ্ঠের সংঘাত—অন্ধ্র-বংশীয় রাজারা যাঁরা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে

দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন তাঁদের একটা গোত্র নাম হচ্ছে বাশিষ্ঠীপুত্র ও বংশ নাম সাতবাহন—শব্দটি কোল ভাষার, যার দ্রাবিড় অনুবাদ এঁদের একজন রাজার নামে—বিলিবায় কুর বা ঘোটকী পুত্র। সব মিলিয়ে আর্য ও অনার্যের এই মিশ্রণের প্রতি পরিচালক মনোযোগী। তিনি অভিনেতা নির্বাচনে পৌরাণিক দেবতাদের ডি-গ্ল্যামারাইজ করেছেন। উর্মিলা অবশ্য খুবই গ্ল্যামারাইজড, ক্লোজ আপে তার চোখে বলা যায় সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত হয়। তবে উর্মিলা তো সব সময়েই কাব্যে উপেক্ষিতা, স্বতন্ত্র। অভিনয় ছাড়া মিশ্রণের অন্যান্য ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ চরিত্রে যথেষ্ট egotism এর ছাপ রয়েছে, তবে খুব পারসোন্যাল লেভেলের ছবি বলে কাঞ্চন সীতায় এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিচারের সুযোগ শেষ পর্যন্ত খুব কম।

দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত চতুর বুদ্ধিবৃত্তির কিছু লোক নিজেদের প্রয়োজনে পুরোহিত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। আর অধিক শারীরিক ক্ষমতার কিছু লোক তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে না চাওয়ায় তৈরী হল আলাদা গোষ্ঠী—সামন্ততন্ত্রের। তখন পুরোহিত শ্রেণী বিশেষ কিছু চুক্তি ও নিয়মবদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করল। রাজা হচ্ছেন দেবতার প্রতিনিধি আর পুরোহিত হচ্ছেন দেবতার অবতার, এই কথা প্রচলন ও স্বীকৃতি পেল। এই সব তন্ত্রের পাশাপাশি রইল সর্বাধিক জন সংখ্যার সাধারণ শ্রেণী—কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা। শুরু হল জমি চাষ, ফসল বোনা, ফসল কাটা, ফসল তোলা। রামায়ণ এই কৃষি সভ্যতারই কাহিনী। কাঞ্চন সীতা ছবিতে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকা রয়েছে নানান ঋতু ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার। বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পর্যায়ে পুরোহিততন্ত্র সাধারণ মানুষকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করাত যার থেকে বিভিন্ন ব্রতের জন্ম। এই ব্রত ছিল লোকজীবনের অঙ্গ, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ছিল লোকবৃত্তানুকরণম্। অর্থাৎ সংস্কৃতি শ্রেণীচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অরবিন্দনের ছবিতে সেই শ্রেণীচেতনার পরিচয় বিষয়ে প্রকৃতির ঋতুক্রম ও অলংকরণের সঙ্গে সমাজ বিন্যাস ও সমাজ বিশ্লেষণের তেমন কোন ইঙ্গিত নেই বলেই মনে হয়। একটি দৃশ্যে অবশ্য অযোধ্যার প্রজাদের ফসল বন্দনার চিত্রায়ণ দেখি যদিও সেই নাচ গান বাজনা অনেকটাই ornamentation হিসেবে আনীত। রাজতন্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্রের যুগ্ম উদ্যোগের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ও উপস্থিতি একান্ত বিরল।

তৃতীয়ত, কর্মের সঙ্গে ধর্মের যে অবিচ্ছিন্নতা টানা হয়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রকৃত অর্থে কখনও ধর্মীয় ছিল কি ? কর্মময় জীবন ও মৃত্যুর পরের জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ধর্মীয় ক্রিয়া, কার্যকারণ কি এই রকম ছিল না ! শাশ্বত পুরুষ ও নারী রূপে যে প্রকৃতি ও পুরুষ বা দ্যাবা ও পৃথিবীকে ভাবা হয়েছে তার কারণ এই যে তারা অমৃত, অনন্ত

স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে বিনাশশীল নয়। ছবিতে মহাপ্রস্থানের শেষে পুরুষ রাম সরযূ নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রকৃতি সীতার সঙ্গে একাঙ্গী হন। নদী—যা কিনা অবিরত প্রবাহিত, যুগ যুগ ধরে গতিশীল, স্মরণযোগ্য কাল ধরে অ-মৃত। নদী—যা কিনা কৃষির আশ্রয়; সাপের মত আঁকা বাঁকা সরযূ নদী, সর্প—যা কিনা উর্বরাশক্তির প্রতীক, কৃষির প্রাচুর্য ও নারীর যৌনতার প্রতীক। ছবিতে সীতা অনুপস্থিত আর সীতা প্রতীম প্রকৃতির যে ফেমিনিন রূপ তার তুলনায় পুরুষালি বলিষ্ঠতা কম। অশ্বমেধ যজ্ঞের চূড়ান্ত পর্যায়ে যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে চাদর ঢাকা অবস্থায় রাজার প্রধানা মহিষীর প্রতীকী যৌন সংগম হত, ছবিতে যা অনুপস্থিত। এবং রাম সীতা একাঙ্গী হলেন এই শেষ দৃশ্যের আগে পর্যন্ত ছবিতে পরোক্ষ যৌন উল্লেখও অনুপস্থিত। এর ফলে ও এ ছাড়াও সাধারণ ভাবে কাঞ্চন সীতা-য় ভাইটালিটি এবং কর্ম ও জীবনে ঐক্যবোধের কতকটা অভাব রয়েছে; সবটাই খুব বেশি রোমান্টিসাইজড বলে ছবিতে বলিষ্ঠতার কোন ব্যাপারই নেই। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব, প্রায় সম্মোহিত চরিত্রায়ণ, বলিষ্ঠতার পক্ষে ক্ষতিকর বড্ড সাজানো গোছানো সব ব্যাপার কিন্তু তাই বলে ব্রেসোঁর ছবির inaction নয়, ব্রেসোঁতে আপাত নিষ্ক্রিয় চরিত্রদের অন্তর্মুখীনতা ছবিতে যে মাত্রা যোগ করে যুগযন্ত্রণার অভাবে এই ছবিতে তেমন কোন মাত্রা পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, ইলিয়াদ মহাকাব্যে যেমন আকিলেসের ক্রোধ, কাঞ্চন সীতায় তেমনি অনিবার্য বিষাদ। আনুষ্ঠানিক ও প্রথাসিদ্ধ সব কিছুর পাশাপাশি, রিলকের মতই রামের কাতরোক্তি—জীবন ও মহৎ কর্মের মধ্যে এক অনিবার্য শত্রুতা রয়ে গিয়েছে। ন্যাচারালিজম ও ইমপ্রেশনিজমের সহাবস্থানে এই টানাপোড়েন ফুটিয়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে। বাল্মিকী উত্তর রাম চরিত রচনা শুরু করলেন, বিষাদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দৃশ্যটিতে। দৃশ্য বিন্যাস ও মূল সুর প্রসঙ্গে এই বিষাদের কথা তোলা যায়। আবহসংগীত ও কম্পোজিশনে, চরিত্রদের চলাফেরায় ও সংলাপের বিরলতায়, ঘটনা নির্বাচনে ও আদি মধ্য অন্ত পারম্পর্যে বিষাদ ছবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, তবে তাকে শৈল্পিক বিষাদ বলা বাড়াবাড়ি হবে যেমন বাড়াবাড়ি হবে এই director's film কে classic film বলা।

সবশেষে, এই ছবির আঙ্গিক। রামায়ণে সাধারণভাবে প্রচলিত ও বর্ণিত কাহিনীটিই অরবিন্দন ভীষণভাবে স্টাইলাইজড করেছেন। খুবই কম সংলাপ, মন্থর গতি, ভিস্যুয়ালস নির্ভরতা ও বিশেষভাবে নির্বাচিত ভিস্যুয়ালস। ক্যামেরা যখন গতিশীল হয়েছে তখন সেই গতি সাংকেতিক ও অর্থবহ। ক্লোজ আপের বাহুল্য, দৃশ্যগত ও অর্থগত ভাবে যা সফল। স্টাইলাইজেশন প্রসঙ্গে যেমন একটা পাথর, তারপর তিনটে পাথর, ছটা পাথর, লংশটে রাম লক্ষ্মণ হাঁটছে কাট করে গুহা, গুহার অভ্যন্তর, দূরে নদী বইছে। আপাত ভাবে কাটা কাটা নির্বাচিত দৃশ্য ও শট কিন্তু সব মিলিয়ে সামগ্রিক। টানা কোন গল্প

নেই, বরং অ্যাবসট্র্যাকশনের দিকে ঝুঁকে ফ্রেম তৈরী, ফ্রেমিং ও কম্পোজিশনে পেন্টিংয়ের প্রভাব বিশেষ করে মণি কাউলের দুবিধার ফর্ম মনে করিয়ে দেয়। অলংকরণের ঝোঁক খুব বেশী, সুন্দর রঙে প্রকৃতি অলংকৃত। ট্রিটমেণ্ট প্রধান এই ছবিতে মাধ্যমের ওপর পরিচালকের দখল স্পষ্ট।

'চীন থেকে বৌদ্ধরা'—একটি আদি সমম্বিবাদ

ধীমান দাশগুপ্ত

৫৮১ থেকে ৯৬০ খৃষ্টাব্দ, চীনের ইতিহাসের যে সময়টি সমগ্র মানবসভ্যতার বিবর্তনেরই এক অন্যতম সৃজনশীল পর্ব, 'চীন থেকে বৌদ্ধরা' (Buddhist form China) ছবির সময়কাল ওই স্বর্ণযুগের এক অংশে। তা হল তাং সাম্রাজ্যের শাসনকালের (৬১৮ থেকে ৯০৬ খৃষ্টাব্দ), আরও নির্দিষ্ট করে বললে Hsuan Tsung-র রাজত্বকালের (৭১২ থেকে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ) কুড়ি বছর। চীনের অসংখ্য খণ্ড রাজ্য একত্র হয়ে তখন অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামো ক্রমসংহত রূপ পাচ্ছে, শিল্প ও সাহিত্য হয়ে উঠছে পরিশীলিত, বিজ্ঞান লোকবিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে ততদিনে তত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্যে রীতিমত সমৃদ্ধ। দেশে তখন একাধিক ধর্মের আর দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মোটামুটি শান্তিপ্রিয় সহাবস্থান। অস্থিরতা আছে বৌদ্ধধর্মের। বিশেষত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীদের সম্পর্কে শাসক ও আমলাদের নীতি নির্ধারণে। তাই ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনী বিষয়ক যাবতীয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কখনো কূটনৈতিক-অভ্যর্থনা-বিভাগ, কখনো টেম্পল্ অ্যাফেয়ারস্-দপ্তর, কখনো মে'রটোরিয়াস অ্যাফেয়ারসের অধিকর্তা। ৭১৪-য় বারো হাজার ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীকে অনান্তরিক ঘোষণা করে সংসার জীবনে ফিরে আসার আদেশ গেল, ৭২৯-য় ভিক্ষুদের নাম নথীভুক্ত করা শুরু হল, ৭৪৭ থেকে তাঁরা স্বীকৃতি স্বরূপ পেতে লাগলেন সাদা সিল্কের কাপড়ে লেখা অভিজ্ঞান পত্র। জাপান থেকে চীন, অথবা চীন থেকে ভারত কি সিংহল, বৌদ্ধ পর্যটকরা তখন এদেশ থেকে ওদেশ যাচ্ছেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করে আনছেন চারপাশ থেকে। এমন একটি সময়ে ও পরিবেশে ইতিহাস-সমর্থিত এক ঘটনার অবতারণা ও (তার চেয়েও বেশি কথা) বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচ্য ছবিটি। ছবিতে আমরা দেখি ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ জাপানে বৌদ্ধধর্মের আগমনের একশো আশি বছর পর, চারজন জাপানি ছাত্রভিক্ষু, যাদের একজন ফুশো, চীনদেশ থেকে কোন মহাপ্রাজ্ঞ শ্রমণকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য ছয়

মাসের সমুদ্রযাত্রায় অনেক শারীরিক কষ্ট ও বিস্তর মানসিক শংকা অতিক্রম করে প্রাচীন চীনের রাজধানী লোয়াংয়ে এসে উপস্থিত হয়। তারপর বছরের পর বছর ধরে চলে প্রাজ্ঞ ও জাপানে যেতে ইচ্ছুক শ্রমণের অনুসন্ধান। শেষে একদিন (৭৪২ খৃষ্টাব্দ) তাঁর খোঁজ মেলে, মহাজ্ঞানী চিয়েন-চেন (৬৮৭-৭৬৩)-এর। তাঁর ওপর প্রশাসনিক নিষেধ অস্বীকার করে, অস্বীকার করে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে, ধরা না পড়লেও নৌযাত্রায় ব্যর্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত চিয়েন-চেনকে নিয়ে শুধুমাত্র ফুশো এসে জাপানে পৌঁছোন ৭৫৪-য়, দেশ ছেড়ে যাবার দীর্ঘ কুড়ি বছর পর। এই সময়ের মধ্যে ফুশোর অন্য তিন সতীর্থ সহযাত্রীর একজন মারা গেলেন, একজন সংসারজীবনে ফিরে গিয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে চীনদেশে রয়ে গেছেন, আরও একজনকে জীবনের চোরা স্রোত টেনে নিয়েছে লোভের চোরা-বালিতে। মারা গেছেন ফুশোর মা, বিবাহিত প্রৌঢ়া হয়ে পড়েছে ফুশোর এককালীন প্রেমিকা। ফুশো নিজে? আমার বিচারে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে রয়েছে এই ছবির আত্মা, তা থিম ও বিউটির মিলনে, রূপ ও রসের ঐক্যে অসাধারণ ধ্রুপদী ও রহস্যময় কিছু একটা।

ক্রিয়া (action) ও অক্রিয়া (inaction)

আত্মা ও ঐক্য, দুটি শব্দই বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে বহু আলোচিত। হিন্দু আত্মবাদের মূলে যেখানে রয়েছে জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে একটা অবিচ্ছিন্নতা-বোধ যার সাথে যুক্ত আছে একটি ঐক্যের প্রত্যয় বৌদ্ধবাদে সেখানে জীবনপ্রবাহ ও চেতনপ্রবাহের কোথাওই অবিচ্ছিন্নতা বা একত্বে বিশ্বাস নেই, অসংখ্য পৃথক অস্তিত্বের দ্রুত সন্নিহিতির সন্ততি এক কল্পিত অনবচ্ছিন্নতা ও একত্ব এনে দেয়, বলা হয়েছে, যাকে অবলম্বন করে প্রতীত হয় ব্যক্তি-সত্তা বা আত্মা। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মে আত্মা মানুষের কল্পনাই মাত্র, আর জীবন ঐক্যহীন সন্ততি। প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তথাপি সমস্ত রূপান্তর ও ধর্মান্তর সত্ত্বেও একটি যোগসূত্র থেকে যাচ্ছে, রহস্যময় এক যোগ।

ছবির শুরুতেই দিগন্তবিস্তৃত উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে চারটি জলযান পাঁচশো আশি জন যাত্রীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে চীনদেশ অভিমুখে। ঝড় বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুৎ, ক্রুর সমুদ্র, চঞ্চল ঢেউ—সব মিলিয়ে আদিম প্রকৃতির আদি রূপের সামনে পড়ে যাত্রীরা যে শুধু বিপদগ্রস্ত আর অসহায় তাই নয়, তারা আতংকিত, মৃত্যুভয়ে ভীত, নিরাপদে যাত্রা শেষ করার প্রার্থনায় কাতর। যাত্রীদের মধ্যে চারজন ছাত্রভিক্ষুর—দলনেতা ইয়াই, ফুশো, ও আর দুজন—অবস্থাও অন্য যাত্রীর তুলনায় খুব কিছু পৃথক নয়, তারাও ভীত ও কাতর, স্মৃতিদীর্ণ ও শিথিল। ইয়াই ও ফুশো হয়তো বা কখনো সাহসী হবার প্রত্যাশী কিন্তু সামান্যতা ছাড়িয়ে যাওয়া তখনো তাদের সাধ্যাতীত। আদিম

প্রকৃতি ও কৌম চেতনার যুগ্ম ও যৌথ ষড়যন্ত্রের কাছে সাধারণ মানুষের অসহায়তা বারবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবির সূচনায়। মৃত্যুভয়ের আতংক, তটরেখা দেখে উল্লাস, চীনের মাটিতে পা দিয়ে প্রগলভতা—দৃশ্যগুলি সেই অসহায়তার বড় স্বাভাবিক প্রকাশ। কোন কোন সমালোচক এই দৃশ্যটিকে লাউড বলেছেন কিন্তু এই উচ্চকিত উচ্চারণ এই ছবির প্রয়োজনে ও কাঠামোয় একেবারে অপরিহায। সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মকে কর্মরাহিত্যের ধর্ম বলা হয়। কর্ম যা কোন বাহ্যিক বস্তু নয়, বাহ্যিক পরিবর্তনও নয়। তা রূপাশ্রয়ী ও নামাশ্রয়ী উভয়ই। ভূত কর্মকে অবলম্বন করে জীবনপ্রবাহ রূপ পায়। এই কর্ম বিধৃত আমাদের কৌম তৃষ্ণায় অনাদি অবিদ্যায় যা মানুষকে অসহায়, নিক্রিয়, সামান্য করে রাখে। ছবির প্রারম্ভিক দৃশ্যগুলি সেই ইনঅ্যাকশান-এর ধ্রুপদী উদাহরণ। শারীরিক সক্রিয়তার সঙ্গে মানসিক অক্রিয়তা, শারীরিক ও মানসিক, উভয় স্তরের অক্রিয়তা ওই ইনঅ্যাকশানকে চিত্রিত করে। তা থিমের প্রথম স্তর।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (reaction)

থিমের দ্বিতীয় স্তর প্রতিক্রিয়ায়। চীনে পৌঁছে চার ছাত্রভিক্ষু বৌদ্ধমন্দিরে আশ্রয় পায়, শুরু হয় তাদের অধ্যয়ন ও মহাশ্রমণের অনুসন্ধান। জ্ঞানের গভীরতায় কিন্তু সান্ত্বনা মেলে না, প্রকৃতির সুগম্ভীর সৌন্দর্য তৃপ্তি এনে দেয় না। দেশের কথা মনে পড়ে, আর কি কখনো তারা সেখানে ফিরে যেতে পারবে! সন্ন্যাস জীবনের কঠোর শৃঙ্খলায় আকুল, সংসারজীবনের বিলাসচিন্তা তাদের থেকে থেকে হাতছানি দেয়। ভিক্ষু হতে চেয়ে আর দেশ ছেড়ে এসে তারা কী ভুল করেছে বলাবলি করে। অভিমানে কাঁদে। সন্দেহ দ্বিধা লোভ শংকায় দোলায়িত মন। অশান্ত সমুদ্রের দৃশ্যপ্রতিমা থেকে অশান্ত মানসের ভাব প্রতিমায় এসে উপনীত হই ছবির দর্শকরা। ছাত্রভিক্ষুদের স্বীকারোক্তি-সপ্রতিভ সংলাপ ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতায় শীর্ণ হয়ে আসে। তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস, নৈতিক বিধান, পুনরুজ্জীবনের ধারণা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ধর্মীয় মাত্রা পেতে থাকে। তখন তারা শুরু করে পদব্রজে চীন-পরিভ্রমণ। যেন এই হেঁটে যাওয়া তাদের তীর্থযাত্রা, যেখানে চারদিকের পাহাড় হ্রদ অরণ্য তাদের মধ্যে মহত্ত্বের বোধ ও মানুষের ধ্রুপদী আর মৌলিক অনুভূতিগুলি মহীয়ানত্বের উদ্ভাস সঞ্চারিত করে দিতে সক্ষম। এ বুঝি তাদের পূর্ব জড়তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্খালন, সচেতন প্রতিক্রিয়ার ফলে মানসিক প্রায়শ্চিত্ত। একজন ছাত্রভিক্ষু ইতোমধ্যে দৃশ্য থেকে সরে গেছে, উত্তরণের এক আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে বাকি তিন চরিত্র তখন চলমান, এই পথিকবৃত্তি বৌদ্ধবাদের পঞ্চ কুশলধর্মের প্রথম চারটি—শীল শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি—সমেত। ফুশো এখন অনেক ধীর স্থির প্রত্যয়ী। তার আত্মগঠনের এটি দ্বিতীয় পর্যায়।

প্রতিক্রিয়ার আর একটি সুন্দর ও জরুরি দৃশ্য সমুদ্র ঝড়ে আত্মরক্ষার্থে জাহাজের

ওজন কমাবার জন্য এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর আজীবন পরিশ্রমে রচিত ও প্রতিলিখিত অসংখ্য পুঁথি সমুদ্রে নিক্ষেপের দৃশ্যটি। বৃদ্ধ ভিক্ষুর ব্যর্থ বাধাদান, সকরুণ আর্তি আর তীব্র শোকপ্রকাশকে যদি কেউ অসহায় আত্মসংযমের অভাব বলেন তবে উত্তরে বলার এই যে এ প্যাশন নিজের জন্য নয়, জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজনে। বৃদ্ধের প্রতিক্রিয়া নিরাসক্ত না হতে পারে কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত সাধারণ যাত্রীর আবেগের উচ্চকিত প্রকাশ থেকে তা মানে ও মাত্রায় অনেক উন্নত, মানসিকভাবে সচেতন বলেই এখানে প্রতিক্রিয়ার কথা উঠছে, নয়তো একে বলা যেত মানুষের সহজাত ইনস্টিংট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব চঞ্চলতা আকুলতার দৃশ্য যখনই আসছে পটভূমি বা পুরোভূমিতে আমরা পাচ্ছি জলের ফ্লিটিং ইমেজ। পদযাত্রার ধীর অন্বেষণ ও স্নিগ্ধ আহ্বানের শান্ত ও কখনো অশান্ত দৃশ্য-গুলিতে যেমন সবুজ বনানীর প্রাধান্য, স্থির অথচ চঞ্চল, উপশমকারী ও পবিত্র মনে হয় যে অরণ্য, গাছ যা আরাম ও তৃপ্তি, শীতে তাপ ও গ্রীষ্মে ছায়াদায়ক।

ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া (Interaction)

থিমের শেষ স্তর মিথক্রিয়ায়। মহাজ্ঞানী ও জাপানে যেতে আগ্রহী শ্রমণকে ফুশো তত-দিনে খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে চিয়েন-চেনকে। কুশলধর্মের পঞ্চমটিও—সমাধি—তাঁর করায়ত্ত; সমাধি হল প্রমুখলক্ষণ, অন্য যে চার কুশলধর্ম আছে তারা সমাধিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হয়, সমাহিত ব্যক্তি যথাভূত তত্ত্ব জানতে পারে। চিয়েন-চেন সেই সমাহিত ব্যক্তি, পঞ্চ কুশলধর্মের পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তিনি প্রজ্ঞাবানও হয়েছেন। সমস্ত ক্লেশ ছেদন করে বলে প্রজ্ঞা ছেদ-লক্ষণ, আবার উৎপদ্যমান হয়ে অবিদ্যারূপ অন্ধকার দূর করে বলে প্রজ্ঞা অবভাসন। আগেই বলেছি, বৌদ্ধমতে কর্ম বিধৃত তৃষ্ণায়, তৃষ্ণা বিধৃত অবিদ্যায়। ফলত প্রজ্ঞায় তৃষ্ণার যথার্থ পরিচয় লাভ করে তৃষ্ণাজনিত কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করে ক্লেশের অবসান ঘটে। স্বভাবতই চিয়েন-চেনের চীন থেকে জাপানে আগমনের একাধিক প্রচেষ্টার বিভিন্ন দৃশ্যে পাহাড়ের দৃশ্যপ্রতিমার সন্ধান মেলে, পাহাড় যা ক্লেশঘ্ন অনড় স্থিতরূপ গম্ভীর। জলের ইমেজ ও বনের ইমেজের পর পাহাড়ের ইমেজের এবংবিধ উপস্থাপনায় এই ছবিতে প্রকৃতি মোটিফের পর্যায়ে উঠে যায়, চলচ্চিত্রে মোটিফের এক জাত উদাহরণ এটি। স্বভাবতই মহাশ্রমণের বিভিন্ন দৃশ্যে আবহে কোন সংগীত থাকে না। নীরবতা যোগ্য মনে হয় সেখানে। শাসক ও প্রকৃতির সমস্ত ভ্রূকুটি সহ্য করে জাপানে যাবার প্রচেষ্টায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কী নিবেদিতপ্রাণ ও ধৈর্যশীল প্রয়াস তাঁর।

অবশেষে ৭৫৪-য় তিনি জাপানে এসে পৌঁছতে পারলেন, জাপানের সম্রাট সাদর অভ্যর্থনায় গ্রহণ করলেন তাঁকে, ততদিনে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছেন তবু কী ক্ষমাশীল

সুন্দর তাঁর দুই চোখ। পি-লু-চে-না প্রাসাদে থেকে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিলেন রাজকুমারদের, মন্ত্রীদের, শুরু করলেন শিক্ষাদান, জাপানে বৌদ্ধ লু সম্প্রদায়ের সূচনা হল। আর সবচেয়ে বড় যে কাজ করলেন তিনি তা হল তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে ফুশোর নিজেকে গড়ে তুলতে পারা। তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ফুশোকে ধীর শান্ত নিবেদিত বীতকাম দেখি আমরা, আর তার কোন অভিমান নেই, অশান্তি নেই, সে তার অন্বিষ্ট খুঁজে পেয়েছে। জাপান থেকে যে ক্লিষ্ট ফুশো গিয়েছিল আর চীন থেকে যে সমাহিত ফুশো ফিরে এলেন তারা এক ব্যক্তি তবু এক নন। এই রূপান্তরের আরেক নাম চিয়েন-চেনের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া।

গঠন কাঠামো

চীন থেকে তাহলে জাপানে এলেন দুই বৌদ্ধ—চিয়েন-চেন ও ফুশো। 'চীন থেকে বৌদ্ধরা' ছবিতে দৃশ্যরূপ ও নন্দনরস, নাটকীয় ব্যাপকতা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা, সরলতা ও পরিশীলনের যে ঐক্যময় মিলন ঘটেছে তা বিশেষভাবে জাপানি। আদি সুইডিশ সিনেমার অনুরূপ প্রবণতা থেকে তা আলাদা, আরও বেশি সুন্দর ও মিষ্টিক। এই ছবি অসাধারণ সুন্দর, গভীরভাবে শিক্ষামূলক, আর স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। ধ্রুপদী ভাবনা আর লোকায়ত জীবনের এমন মিলন সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে খুব বেশি দেখিনি।

মনে পড়ে, বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'চেতনাহং ভিকৃখবে কর্ম্মং বদামি,' চেতনাকেই আমি কর্ম বলে থাকি। 'চীন থেকে বৌদ্ধরা' ছবির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মিথস্ক্রিয়া প্রসঙ্গ এবং এই চেতনাপ্রবাহ একটি আদিম সমদ্বিবাহুর মতো প্রজ্ঞাকে শীর্ষে তুলে ধরে। থিমকে এইভাবে গঠন-কাঠামোর অঙ্গীভূত করে ফেলা এ ছবির সবচেয়ে বড় সাফল্য। কৌম চেতনায় ছবির সূচনা ঘটেছিল, প্রজ্ঞায় ছবির সমাপ্তি ঘটে। প্রজ্ঞা—জীবন ও চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত কোন সতেজ, সজীব, প্রাণস্পন্দনের ব্যাপার যা, তা উদ্ভাসনের এক দিব্য বিভা নিয়ে আসে যা সব গহন ও গোপনকে অনাবৃত করতে সক্ষম ও সমর্থ। ছবির শেষ শটে চিয়েন-চেন প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বাতাসে রঙীন পতাকা উড়ছে।

তুলনীয় : বাতাসে উড়ন্ত পতাকা দেখে—

প্রথম ভিক্ষু—যা নড়ছে তা হল পতাকা

দ্বিতীয় ভিক্ষু—যা নড়ছে তা হল বাতাস

মহাশ্রমণ—না পতাকা, না বাতাস, যা নড়ছে তা হল মন ॥

অন্তর্গত রাজনীতির ছবি "ডেথ বাই হ্যাংগিং"

ইরাবান বসুরায়

এ ছবি শুরু হয় একেবারে ডকুমেন্টারী ছবির ধরনে। মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার বিরোধী শতকরা সত্তর জনকে প্রশ্ন করা হয় তারা কখনও কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে কিনা ? এবং তারপর কিছু নিখুঁত বর্ণনা, মৃত্যুদণ্ডের চেম্বার, ফাঁসীর আগের নানা অনুষ্ঠান প্রার্থনা, ভোজ—ফাঁসীর মঞ্চ, গলা ঘিরে দড়ির ফাঁস, অপেক্ষা, বোতাম টেপা, পায়ের তলায় পাটাতন সরে যাওয়া, শরীরটার ঝুলে পড়া, ডাক্তারের অপেক্ষা, নির্দিষ্ট সময়ের পর পরীক্ষা করে মৃত্যু ঘোষণা—ছবি এখানে এসেই মোড় ঘুরে যায়, গলার ওপর ফাঁসীর দড়ির গাঁট চেপে বসার দীর্ঘ সময়ের পরেও একটি শরীর ফাঁসীর আসামীর শরীর যার নাম 'আর'—তার নাড়ীর স্পন্দন স্তব্ধ হচ্ছে না। বড় বেশী অনিয়ম এটা। বস্তুতঃ এটাই একধরনের বিদ্রোহ—প্রাতিষ্ঠানিক কর্তা ব্যক্তিদের কাছে যার ভাল নাম বেয়াড়াপনা।

ওশিমা এমন একটি চরিত্রকে নায়ক করেছেন আপাতঃদৃষ্টিতে যার সম্পর্কে কোনরকম সহানুভূতি আসা একেবারেই অসম্ভব। খুব সাধারণ নির্ভরতা জীবন আমাদের, আমরা যারা ঐ শতকরা সত্তরজন বা বাকী তিরিশ জন, সকলেই। আমরা নিয়ম মানি, খেতে দিলে খাই, পরতে দিলে পরি, শোয়ালে শুই, দাঁড় করালে দাঁড়াই সেখানে কে এক কোথাকার 'আর' নিয়ম মানে না, কথা শোনে না—ধর্ষণ করে দুটি মেয়েকে, তাদের হত্যা করে, অবশ্য সে কোরিয়ান, 'অপরাধ' করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক—এমন লোককে খুব তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া দরকার—ফাঁসীটাই বেশ উপযুক্ত পদ্ধতি ; সুতরাং 'আর' কে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে হয়। কিন্তু তারপর……?

ওশিমা বড় ঝামেলায় ফেলেন আমাদেরও। ফাঁসীটা হয়ে যেত, আমরা দর্শকেরা 'পাপের বেতন মৃত্যু' আওড়াতে আওড়াতে বাড়ি ফিরতাম, আমাদের 'ঘরে গ্রামোফোন সুখী গৃহকোণ'এ, তা নয়, 'আর'-এর শরীর মরল না, শুধু শরীরই কেননা পুরোহিত-এর মতে 'আর'-এর আত্মা এখানে নেই—তাও মন্দ নয়, ব্যাপারটা বেশ মজার, মজা এবং মজা—তারপর 'আর'-এর অ্যামনেশিয়া তাকে তার কৃতকর্মের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য নানা চেষ্টা—কেননা জাপানী সংবিধান অনুসারে 'অ-চেতন' কোন ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া যায় না, সুতরাং সিকিউরিটি গার্ড, একসিকিউশন অফিসার, এডুকেশন অফিসার, ডাক্তার, পুরোহিত—প্রত্যেকে অভিনয় করে 'আর'-এর আসল অবস্থানটা তাকে মনে করিয়ে দিতে চায় - মজা, অনেক মজা, সিকিউরিটি গার্ড এর মাথায় ফিতে বেঁধে বোন সাজায় মজা, শর্ট পরে ডাক্তারের ভাই সাজায় মজা, অভিনয়ের মারামারিতে মজা, হাত-

তালি দিয়ে গান করায় মজা—আর তারই মাঝে মনে করিয়ে দেওয়া হয় ব্যাপারটা আর একটু 'ভালগার' করা দরকার, মানে আর একটু কোরিয়ানদের মত। মুহূর্তেই ওশিমা এই মজা টেনে বার করেন আমাদের—জাতিবিদ্বেষের এই ছোট্ট ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দেন এই হ'ল জাপানী পুঁজিবাদের বা যে কোন পুঁজিবাদেরই ধরন—উদিত সূর্যের নিশানী পতাকাবাহী ছাড়া আর সবাইকেই যেখানে মনে করা হয় মানবত্বের কিছু আর আমাদেরও মনে পড়ে এই মজা এই অভিনয়, সবটাই শুধু 'আর'-এর চেতনা ফিরিয়ে এনে তাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর জন্য কেননা 'আর' দুটি মেয়ে ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে।

এরই মাঝে 'আর'-এর ছোট বোন মানে সিকিউরিটি গার্ড বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। 'আর' হাত ধরে তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়, ফাঁসীর চেম্বারের ছোট্ট চার দেয়ালে ঘেরা এলাকার মধ্যে 'আর' ঘুরে বেড়ায় মনে মনে, বহু দূরের ষ্টেশনে, পার্কে, রাস্তায়। 'আর' তাহলে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখত। তার চোখ গভীর হয়ে আসে, গলা জড়ানো—স্বপ্নের মধ্যে তার শিথিল পদচারণা, বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন—আসলে ওশিমা আমাদের জানিয়ে দেন যে বাস্তব স্বপ্নের তীব্র দ্বন্দ্বেই 'আর' হত্যাকারী হয়ে ওঠে।

আসলে 'ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং' স্বপ্নভঙ্গের নিষ্ঠুরতাকে ধরতে চেয়েছে। গোটা ছবিই একরকম 'অ্যাবসার্ড' জগৎ তৈরী করেছে—ফাঁসীর পরেও বেঁচে থাকার 'অ্যাবসার্ডিটি' থেকেই যার শুরু। আসলে এই সমাজে 'আর'দের বেঁচে থাকাটাই কি চরম অ্যাবসার্ডিটি নয়। 'আর'-এরা এখানে বাঁচেনা, কেন না 'আর'-এরা দরিদ্র, 'আর'-এরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বলি, 'আর'-এরা কোরিয়ান। জাপানে 'আর' কোরিয়ান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আর' নিগ্রো, হিটলারের জার্মানীতে 'আর' ইহুদী, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বা লাতিন আমেরিকায় 'আর' লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। এই মানুষগুলোর কাছে বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানও স্বপ্নমাত্র। 'আর' সেই স্বপ্নকে ধরতে চেয়েছিল, জীবনের স্বাভাবিক কামনাকে মেটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কোরিয়ান, সুতরাং, স্বপ্ন তার কাছে স্বপ্নই—বাস্তব নয়। মেরুপ্রমাণ এই দূরত্বের ফলেই তার স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে হয়ে ওঠে তির্যক—ওশিমা তার কৃত ধর্ষণ ও হত্যাকে দাঁড় করান বহুবছরের অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ হিসেবে।

'আর'-এর সামনে তার আসল অবস্থানটা অভিনয় করতে গিয়ে তাকে আর একটু টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, বাইরে খোলা জায়গায়। সত্যি কি খোলা জায়গা। অদ্ভুত একটা আলো-আঁধারিতে এই দৃশ্যগুলি তোলা, মাঝে মাঝেই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অবয়ব—এই বহির্দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কেও সংশয় জাগায়। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েন, সংযোগ ও সংঘাত ছবির দৃশ্য-পরিকল্পনাতেও এসে যায়। এখানেই 'আর' কৃত অপরাধকে অভিনয় করে দেখাতে গিয়ে এডুকেশন অফিসার একটি মেয়েকে হত্যা

করে। এই মেয়েটি, যার মৃতদেহ কফিনে শোয়ানো দেখা যায়, জাতীয় পতাকায় ঢাকা, ফাঁসীর চেম্বারে—কেউ তাকে প্রথমে দেখতে পায় না এডুকেশন অফিসার ছাড়া, পরে সে উঠে আসে কফিন থেকে—দৃশ্যমান হয়ে ওঠে—'আর' তাকে চিনতে পারে তার বড় বোন বলে। সত্যিই কি সে বড় বোন ! আরেকজন কোরিয়ান এই মেয়েটি—'আর' তার সম্পর্কিত—দুটি মানুষ, যারা দু'জনেই আসছে একই ধর্ষিত সমাজ থেকে—মেয়েটি তাকে বোঝায়, মাঝখানে শুয়ে থাকে 'আর' এবং এই মেয়েটি, দু'জন কোরিয়ান—আর তাদের ঘিরে পাবলিক প্রসিকিউটর, এডুকেশন অফিসার, সিকিউরিটি গার্ড, ডাক্তার, পুরোহিত—জাপানী বুর্জোয়া সমাজের সব প্রতিনিধি, তারা মদ্যপান করে, তাদের শিথিল, অসংলগ্ন বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বুর্জোয়া সমাজের আবর্জনার গলিত স্রোত—বুর্জোয়া পৃথিবীর নানা হত্যা আর ধর্ষণের নানা চেহারা। মাঝখানে শোয়া দুটি মানুষ, ক্যামেরা তাদের চারপাশে ঘোরে—আলোর স্তিমিত ব্যবহারে পারিপার্শ্বিক বিহীন মনে হয় তাদের। প্রকৃতই তারা তাই—তাদের স্বদেশ, স্ব-ভূমি থেকে বিচ্যুত এই দু'টি নরনারী—তারা বলে তাদের কোরিয়ার কথা, দক্ষিণ কোরিয়ার কথা, যেখানে এখনও শোষণের চেহারা সমানই তীব্র, যেখানে সাধারণ মানুষ একইরকম পশুজীবন যাপন করছে, সেই কোরিয়ার কথা—মেয়েটি 'আর'-কে বোঝায় তার 'কোরিয়ানত্ব' এবং 'আর' বোঝাতে যায় তার অসহায়ত্ব—কল্পনা আর বাস্তবের দুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা ভুল করার অসহায়ত্ব, আর মেয়েটি তাকে বোঝায় যে তার অপরাধ আসলে জাপানী অত্যাচারেরই শাস্তি। একটু মেনে নিতে অসুবিধা হয় ব্যাপারটা, সাধারণ নিশ্চিন্ত বুদ্ধিতে—কিন্তু কে না জানে ন্যায়নীতি, ধর্মাধর্ম, অন্যায়, অপরাধ সবই আপেক্ষিক—শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর তা নির্ভরশীল। ওশিমা হাত দিয়েছেন বড় শক্ত জায়গায়, তুলেছেন বড় অস্বস্তিকর প্রশ্ন।

এই মেয়েটি, প্রায় শূন্য থেকে যার আবির্ভাব, বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকা না থাকাটা খুব জরুরী ছিল না এই ছবির পক্ষে। বরং ওশিমা ছবিতে যে বাস্তব-অবাস্তবের জাল বুনেছেন, তারই সঙ্গে মানানসই এ ব্যাপারটা। মেয়েটি এবং 'আর'-কে তিনি নিয়ে গেছেন ছায়া-আলোর মাঝে। বাইসিকলের চাকা বস্তু পৃথিবীর মাটি প্রায় স্পর্শ করে না, তারা গড়িয়ে যায় ঢালু পাড়ে। গড়িয়ে নামছে তো নামছেই, ধীর গতি, কাবুকীর ভঙ্গি —সামনে জল, জল না শান্তি, মনে হয় এক্ষুণি টের পাওয়া যাবে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া, জলের কলকল—তারপর সেই জলস্রোতের মাঝে স্থির একটু ভূমি—সেখানে মেয়েটি 'আর'-কে নিয়ে, পেছনে চাঁদের মায়াময় আলোয় ঢাকা একটা বাড়ির রেখা—সরু তুলিতে আঁকা জাপানী ছবি। এই রং, রেখা, মায়ার জগৎ ওশিমা তৈরী করেছেন, কাবুকীতে যেমন ভঙ্গিতে, মুদ্রায় উন্মোচিত হয়ে যায় মানবজীবনের গূঢ় সমাচার,

এখানেও তেমনি পরতে পরতে উন্মোচিত হয় একটা নিষ্ঠুর সমাজের নিদারুণ সত্য—ওশিমা বস্তুজগতের কঠিন কাঠামো থেকে সরে এসে অবাস্তবতার কাঠামোতে বসিয়ে দেন বস্তুজগতের নিষ্ঠুর সত্যকে।

যে ছবি শুরু হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে, সে ছবি এভাবে পৌঁছে যায় আরও গভীর রাজনৈতিক সমস্যায়। ফাঁসীর অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ করার জন্য যারা হাজির ছিল, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন হত্যার অংশীদার, সেখানে বিচারসিদ্ধ হত্যারও কোন যৌক্তিকতা থাকে না। ওশিমা এভাবেই তুলে ধরেন শ্রেণীসমাজের প্রবহমান হত্যাধারাকে। ওশিমা পৌঁছে যান শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আসল চেহারায়—শেষপর্যন্ত এ ছবি একটা রাজনৈতিক ছবিই হয়ে দাঁড়ায়।

এবং 'আর' তার নিজের অপরাধ ও অপরাধহীনতাকে উপলব্ধি করতে পারে। বুঝতে পারে জাপানে কোরিয়ান হয়ে থাকাটাই তার একমাত্র অপরাধ। সুতরাং সে মরতে রাজী হয়, জাপানী সংবিধানে 'সচেতন' না হ'লে ফাঁসী দেওয়া যাবে না, এই নিয়মের মর্যাদা রাখার জন্য নয়, অন্য 'আর'-এরা যেন আর এভাবে না মরে, তারই জন্য। তার সেই বোনকে আর দেখা যায় না—তার ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। 'আর' ফাঁসীর দড়ির দিকে এগিয়ে যায়, তারপর আমরা দেখি ট্র্যাপডোর খুলে যায়, নেমে আসে একটা শূন্য দড়ির বৃত্ত। কোণাকুনি ভাবে পর্দায় ঝুলতে থাকে দড়িটি—দর্শকের সামনে আমাদের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব অস্তিত্বের সামনে একটা ফাঁসীর দড়ি ঝুলেই থাকে। 'আর' কাদের জন্য মরতে রাজী হ'ল—ঐ ফাঁসীর দড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা—ওশিমা কি আমাদেরই, এই পচে যাওয়া সমাজটাকেই দাঁড় করিয়ে দেননি ফাঁসীর আসামী করে?

আর তাই কি অবধারিত ভাবেই পাবলিক প্রসিকিউটারের যিনি আগাগোড়া সমস্ত অনুষ্ঠানের নীরব, নির্বিকার দর্শকমাত্র, তার ধন্যবাদ বর্ষিত হয় দর্শকেরও প্রতি; ধন্যবাদ, না ওশিমার তীব্র, নিষ্ঠুর চড়।

যাকে মনে হচ্ছিল মানবিক সমস্যা মাত্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যৌন বাসনার বিকৃতি, তাকে ওশিমা দাঁড় করিয়ে দেন রাজনৈতিক প্রশ্নের হাত ধরে—এমনি করে বুঝিয়ে দেন, আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব, আমাদের জীবনযাপন, কামনা, প্রাপ্তি—সবই তুমুলভাবে রাজনীতি-নির্ভর, রাজনীতি-বহির্ভূত কিছু নয়। 'ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং' আসলে সেই অন্তর্গত রাজনীতিরই ছবি।

ইয়ানচোর 'ইলেক্‌ট্রা'

সোমেন ঘোষ

—সুপ্রাচীন গল্প, গাথা, পৌরাণিক উপকথা, ঐতিহাসিক আখ্যান ইত্যাদিকে সমকালীন ভাবনাচিন্তার অনুসঙ্গীরূপে শিল্পিত রূপ দেওয়া যেমন দুরূহ কাজ, তেমনি তাব সার্থক প্রকাশে স্রষ্টার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এর আগে পরিচালক ইয়ানচোর কয়েকটি ছবি দেখেছি। এ ছবিতে ইয়ানচো তাঁর অসাধারণ চলচ্চিত্রবোধ ও গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সোফোক্লেসের সেই সুপ্রাচীন গ্রীক নাটকের নামের ছায়ায় পরিচালক সম্পূর্ণ নোতুন ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক এই ইলেক্‌ট্রা ছবিটির নাট্যরূপায়ণ করেছেন লাজ্‌লো-গিয়োরকো। গিয়োরকোর রচিত আধুনিক নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সেই পুরাতন গ্রীক নাটকের নামেই উপস্থিত আছেন। কেবল স্থান-কাল এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির অসাধারণ আধুনিকীকরণ ঘটেছে। আখ্যান অংশে ইলেক্‌ট্রা এবং তার ভাই অরেস্‌টেস্‌ তাদের মৃত পিতা এ্যাগামেমননের প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ। মৃত পিতার হত্যাকারী এজিস্‌থাস্‌ তাদের প্রতিশোধের কেন্দ্র-বিন্দু। ইয়ানচোর ব্যাখ্যায় ইলেকট্রা চরিত্রটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তায় উপস্থাপিত নয়, শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতাকে সে চিহ্নিত, সে বিশেষভাবে স্বাধীনতার প্রতিভূ, ব্যক্তি স্বাধীনতার ফসল, মানুষের চিরকালীন মুক্তির দ্যোতক। পরিচালক অরেস্‌টেস্‌কে দেখিয়েছেন আবর্তমান বিদ্রোহের মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে, এবং এজিস্‌থাস্‌কে আমরা দেখেছি বাহ্যতঃ অশেষ উৎপীড়কের চিরকালীন চরিত্ররূপে যা মানুষের অস্তিত্বের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে একের পর এক, নোতুনরূপে, নোতুন সংজ্ঞায়। ইয়ানচোর মতে এই উৎপীড়নের ধ্বংসের প্রয়োজন। একে নিঃশেষ করতে হবে বারবার। 'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে' দুজনেই সমান দোষী। ইলেকট্রা তাই প্রত্যেক অত্যাচারীকে অভিশাপ দিয়েছে আর তাদের জন্য আশীর্বাদসূচক বন্দনা করেছে যারা উৎপীড়নকে সরল চিত্তে মেনে নেয়নি এবং সদাজাগ্রত চৈতন্যর জন্য মানুষের মৌলিক বৃত্তির উন্মেষের চেষ্টা করেছে। ছবিতে আমরা তাই এই দুরন্ত সংলাপ শুনতে পাই "As long as there is one who does not forget, nobody forgets. Electra does not forget." উৎপীড়ক এজিসথাস্‌ সুচতুর বাক্যবাণে ইলেকট্রাকে পরাস্ত করতে চায় কিন্তু ইলেক্‌ট্রার প্রচণ্ড বিদ্রোহী মনোভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এজিস্‌থাস্‌ ইলেক্‌ট্রাকে বোঝাতে চায় যে তার বাবা এ্যাগামেমনন সার্থক শাসক ছিলেন না। তিনি স্বাধীনতার দ্বারা জনতাকে ভারগ্রস্ত করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তারা স্বাধীনতাকে কি কাজে লাগাবে জানে না। অতএব জনস্বার্থে আমাকে আসতেই হয়েছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যে চলে

যাচ্ছেন পরিচালক এক অনাস্বাদিত, অদৃষ্টপূর্ব নির্মিতিতে। সংলাপ চলছে, ক্যামেরা ঘুরছে ব্যালের ছন্দে, মুখ্য চরিত্ররা ঘটনা সংস্থানকে ঘিরে অনবদ্য কম্পোজিসানে বিচরণ করছে। তাঁর ক্যামেরা এখন এজিস্থাস্কে ঘিরে গতিশীল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একাধিক চরিত্ররা দুষ্ট অত্যাচারী এজিস্থাসের প্রতি স্তোকবাক্য নিক্ষেপ করছে : কেউ বলে "My wife gave birth to three children this year, thanks Sire" আবার অন্যত্র শোনা যাচ্ছে "This year I dreamed only pleasant dreams" "Sugar has never been so sweet, salt never so salty as now, Sire" তিক্ত বিদ্রূপের ভঙ্গিতে পরিচালক এই দৃশ্যক্রমে অত্যাচারী শাসকের অভিপ্রায় আর তাঁর বশীভূত সাধারণ মানুষের স্তাবকতার করুণ চেহারাটা তুলে ধরেছেন। একটি অনবদ্য দৃশ্যক্রমের কথা মনে পড়ছে। ইলেক্ট্রা এজিস্থাসের বর্তমান অনুগত সংঘবদ্ধ মানুষের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, উদ্দেশ্য তার নিজের অনুভূতি এ্যাগামেমনন হত্যার মূল উদ্দেশ্য জনতার মনে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া। ইলেক্ট্রাকে ঘিরে বৃত্তাকারে অনেক মানুষ, ইলেক্ট্রা একের পর এক তথ্য ও সত্য পরিবেশন ক'রে চলেছে। একের পর এক মানুষ সত্য কথা শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে, তারা সংকোচে যে যার কান দুহাতে ঢাকছে। এক অপূর্ব প্রাচীন আনুষ্ঠানিক কৃত্যকের কম্পোজিসনে পরিচালক দৃশ্যক্রমটিকে প্রতীকময় ক'রে তুলেছেন। এরপর চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ ইলেক্ট্রাই জয়ী হয়েছে। এজিস্থাসের মৃত্যু ঘটেছে। ইলেক্ট্রা এবং অরেস্টস্ বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছে। পর্দায় লেখা পড়েছে : "Our story is finished. The tyrant is dead". কিন্তু পরিচালক এই রোমাণ্টিক সংলাপেই থেমে যাননি। ইলেক্ট্রার হাতে পিস্তল, সে অরেস্টস্কে মেরেছে, নিজেও মরেছে ; পুনরায় তারা বেঁচে উঠেছে। কেননা ইয়ান-চোর ব্যাখ্যায় তাদের দুজনের ভূমিকাই হচ্ছে ক্রমাগত মৃত্যুবরণ করা এবং পুনর্জীবন লাভ করা ; তারা তো বিপ্লবেরই মানস সন্তান। ইয়ানচো সব দেশের সব কালের বিপ্লবের মূল প্রেরণার বন্দনা করেছেন। ছবির শেষে পর্দাজুড়ে রক্তবর্ণের হেলিকপ্টার বৃত্তাকারে আকাশ ভ্রমণ শেষে মাঠে নেমেছে এবং ইলেক্ট্রা ও অরেস্টসকে নিয়ে আবার পাড়ি দিয়েছে। ছবির নেপথ্যে গল্প বলা তখন শুরু হয়েছে কোনো এক 'firebird'-এর যার বাবা হচ্ছে 'স্বাধীনতা' আর মায়ের নাম 'সুখ'। এরা সারাদিন অনেক উঁচুতে উড্ডীন থাকে, সন্ধ্যায় ফিরে আসে যখন তাদের ডানা অবসন্ন। এরা পরবর্তী সকালের জন্য আবার অপেক্ষা করতে থাকে। বিপ্লবও ঠিক এমনইতরো। সে যেন বহতা নদীর ধারা। থেমে থাকলে তাকে চলবে না। ইলেকট্রা যেন অত্যাচার আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় এক তীক্ষ্ণ সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এজিস্থাসের সঙ্গে কুতর্কেও সে অনমনীয়, ঋজু ও প্রখর। এজিস্থাসের কষ্টকল্পনা ইলেকট্রা আত্মতুষ্ট বর্তমান জনতার মধ্যে কৃত্রিম অসন্তোষের

বীজ বপন করতে চায়। তার বিপরীতে ইলেক্‌ট্রার উত্তর : "A pig in the mud is also contented." ইয়ানচো নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি কেবল দক্ষ পরিচালকই নন, স্বকাল, স্ব-সমাজের সমকালীন চলিষ্ণু জীবনের গভীরে যে টিঁকে থাকার গ্লানি, সামান্য তৃপ্তির ছদ্মবেশে আমাদের দহন করছে, তিনি তারও অতি মননশীল রূপকার। আমাদের সভ্যতার ঊষাকাল থেকে এখন পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় চোখ মেললে দেখতে পাবো আমাদের ইতিহাস স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগের তুলনায় গোলামির কারুণ্যে ভরা। আলব্যের কামুর কয়েকটা কথা মনে পড়ছে : "Freedom is the concern of the oppressed, and her natural protectors have always come from among the oppressed". ইলেকট্রা এই উৎপীড়িত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। 'বিপ্লব' কথাটির প্রাথমিক অবস্থায় সেই সুপ্রাচীনকালে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল কোনো এক রোমাণ্টিক নায়কের আবির্ভাবে তাঁর একক সক্রিয়তায় শোষণের ধারার পরিবর্তন ঘটে। এমনকি মেকিয়াভেলীর মতো প্রতীচ্য মনীষীও অল্পবয়সে খারাপ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বলতে পুনরভ্যুত্থান বা নবীকরণ বুঝতেন। তাঁর কল্পিত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চিন্তায় কোনো মুক্তিসূচক ইংগিত ছিল না। কিন্তু কাল পাল্টেছে, দিন বদল হয়েছে। সেকালের শোষণের হাত থেকে ইতিহাসের পরিক্রমায় একালের জনসাধারণ যে অত্যাচার আর উৎপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সেখানে শোষণের রূপটা আরো বীভৎস, আরো মর্মান্তিক। একালে তাই তাকেই বিপ্লবের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে হয় যার মধ্যে সামাজিক অবস্থার নবীকরণের বৈচিত্র্য একমাত্র স্বাধীনতার অনুষঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। ইলেকট্রা সেই চিরকালীন স্বাধীনতার প্রতিভূ। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো'য় মার্কস্ ঘোষণা করেছিলেন "Let the ruling class tremble at a Communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win." বস্তুতঃ মার্কসীয় চিন্তার অনুবর্তনে এটাই প্রতীয়মান যে তিনি মানুষের সামাজিক রূপান্তর চেয়েছিলেন এবং তিনি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিল একান্তই সামাজিক বিপ্লব, রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রের সাংগঠনিক পরিবর্তনটা তাঁর কাছে ততো মুখ্য ছিল না। প্রধানতঃ তাঁর আদ্যন্ত কৌতূহল নিবদ্ধ ছিল শ্রেণী সংঘর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যা হেগেলীয় যুক্তিবাদে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ ছিল এবং মার্কসের মতে এই সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দুরাচারী শাসনের কবলে চিরকাল মানুষের অবমাননা চলতে পারে না। তার নিগ্রহের সমাপ্তি আছেই। কাউকে না কাউকে একদিন সেই মুক্তির পথ দেখাতেই হবে। ইলেকট্রা সমস্ত নিপীড়িত, অবদমিত মানুষের মুক্তির দূতরূপে বিপ্লবের সূচনা করেছে। এজিসথাস্‌কে তার কবলে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। গভীর লাল হেলিকপ্টার সমস্ত শোষণের শেষে

বিপ্লবের প্রতীকে চিত্রিত হয়েছে। আবার কামুর কথায় ফিরতে হচ্ছে : "We shall henceforth be sure, as we shall be sure that freedom is not a gift received from a state of a leader but a possession to be won every-day by the effort of each and the union of all." এজিস্থাসের শাসনে পীড়িত মূঢ় জনগণের মধ্যে সত্যিকারের মানসিক স্বাধীনতার মন্ত্রটিকে ইলেকট্রা জাগিয়ে দিতে চেয়েছে ; এজিস্থাসের অনুগত আজকের জনতা নিজেদের প্রকৃত দুরবস্থাটা পরখ ক'রে নিজের অধিকারটুকু আদায় ক'রে নিক, এটাই তার কাম্য। ইয়ানচো একবার বলেছিলেন "There is no finer aesthetic pleasure than the discovery of justice." মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর চরম প্রভুত্ব স্থাপনই হ'লো মানব সভ্যতার চূড়ান্ত অধঃপতন, আর ইয়ানচো তাঁর এই দুর্ভাবনাকেই তাঁর শিল্পে অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই-ই।

একালে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বপ্ন সার্বজনীন ভাবনায় ছড়িয়ে পড়েছে। আজ পৃথিবীর যে প্রান্তেই যারাই শোষণের অত্যাচারে নিগৃহীত, বিপ্লবের পথে আমূল পরিবর্তন তাদেরই একান্ত কাম্য। আর এই মুক্তির স্বপ্নই একালে দেশে দেশে নিপীড়িত জন থেকে জনে সক্রিয় হয়ে উঠছে। এ অর্থে বিপ্লব কেবল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থারই পরিবর্তন নয়, চলিষ্ণু সামাজিক অবস্থার মধ্যে, অনাচার আর ক্লেদের পঙ্কিলতায়, মানুষের অস্তিত্ব যখন দুর্বিষহ হ'য়ে নোতুন মূল্যবোধের প্রবল চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—দরকার পড়ে সমস্ত অবস্থাটার একটা আমূল ওলোট-পালট, 'বিপ্লব' সেই পরিবর্তনেরই আর এক বিকল্প নাম। তখন চলমান সমস্তকিছু বাতিল হ'য়ে যায়। তাই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এক অর্থে মুক্তিকামী মানুষের অবনমিত মানবিকতার বিপরীতে শোষকের প্রবহমান অত্যাচারের অবিরাম বিরোধীতাকেই বোঝায়। ইয়ানচো তাঁর ইলেকট্রাকে এইভাবে এজিস্থাসের সর্ববিধ বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে অনমনীয়, অটল প্রতিবাদী হাতিয়ার রূপে খাড়া ক'রেছেন। ইলেকট্রার জঙ্গীবাদী মনোভাবই প্রকৃত বিপ্লবের অন্তর্ভাবিত রূপ। মরতেই যদি হয়, তবে শোষকের বিরুদ্ধে লড়েই মরা ভালো, কেননা অত্যাচারী শাসকের রাজত্বে এমন ভাব দেখানো উচিত নয় যার থেকে মনে হতে পারে আমরা সর্বান্তঃকরণে ন্যায়রাজ্যে পরম সুখে আছি। অতএব এসো, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হই। পরিচালক বিপ্লবকে প্রতীকময় করেছেন Firebird-এর কল্পনায়। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে এই বিপ্লব কোনো বিশেষ কালের কোনো বিশেষ মানুষের স্বাধীনতার মধ্যেই নয়, পরন্তু সর্বকালের সমস্ত মানুষের সেই চিরকালীন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার দুর্বার সাহস। এর মৃত্যু নেই, এ নিত্য নবায়মান। জয় বিপ্লবের জয়, জয় বিপ্লবী চেতনার জয়। জয়তু বিপ্লবী উদ্বোধক!

ছবি শুরু হয়েছে ইলেক্ট্রার পিতা এ্যাগামেম্‌ননের পঞ্চদশ মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঘটনা দিয়ে। এ্যাগামেম্‌ননকে হত্যার পরে অত্যাচারী এজিসথাসের বর্তমান মূঢ় অনুগত প্রজাবৃন্দ প্রাচীন ধ্রুপদী কায়দায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করছে। ইয়ানচো তাঁর চিরপ্রিয় সেই মাঠের সংস্থানে সমগ্র ছবিটির দৃশ্যক্রম সাজিয়েছেন। এখানে তাঁর আঙ্গিক দক্ষতা বিস্ময়কর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। বহুকালের পুরোনো আখ্যান বর্ণনার সেই স্পার্টান্ স্টাইলটিকে পরিচালক তাঁর ক্যামেরা-সঞ্চালন ভঙ্গি, চরিত্রদের বিচিত্র গতিবিধি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে পর্দায় তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথকতার ভঙ্গিতে সিকোয়েন্সের মাঝে মাঝে গান, কখনো প্রয়োজনে চরিত্ররা প্রাচীন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নেচেছে। সমগ্র ছবিটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অপূর্ব ছন্দে প্রবাহিত হয়ে গেছে, যে স্টাইলটা একেবারে তাঁর স্বকীয় পরিকল্পনা। আমরা এর আগে এই ধরনের ছবি দেখিনি। এই অভিনব সিনেমা বর্ণনা-ভঙ্গির জনক হলেন ইয়ানচো। তাঁর প্রায় সব ছবিতেই সেই একই মাঠের লোকেশন, একই গতিতে ব্যালের নৃত্যভঙ্গিমায় ক্যামেরার মুগ্ধকর সক্রিয়তা, পূর্বাপর চরিত্রের চলাফেরা, সংলাপ উচ্চারণ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, উজ্জ্বল আলোকিত ভূমিতে কাছে ও দূরে কখনো এক, কখনো একাধিক মানুষের ভীড়, পশ্চাদপটে দুরন্ত অশ্বপৃষ্ঠে রক্ষীবাহিনীসুলভ মানুষের চাঞ্চল্য, সংকীর্ণ দীঘির জলমগ্ন একগুচ্ছ নগ্ন নারীর ধর্মগত প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়া, রং, প্রতীক এবং চিত্রকল্প—এবংবিধ বিচিত্র ও জটিল বহু বিষয়ের সমন্বয়ে পরিচালক তাঁর ইলেকট্রাকে এক অসাধারণ শিল্পস্তরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ছবিটি নাকি মাত্র তেরটি দৃশ্যগ্রহণে (13 takes) সমাপ্ত হয়েছে। ভাবলেও বিস্ময় লাগে!

প্রমথেশ বড়ুয়ার নির্মল প্রহসন 'রজত জয়ন্তী'

রজত রায়

একেবারে সেই সূচনার কাল, ১৯১৯ থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের মূল লক্ষ্যটি ছিল প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্তের বিনোদন। গত পঁয়ষট্টি বছরের ভেতর এই চরিত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আজকের পটভূমিতে, হিন্দী বাণিজ্যিক স্থূলরুচির বাংলা যাত্রার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 'বিনোদন' কথাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রেই হয়ত কোন শিল্প-সচেতন মন কিছুটা সংকুচিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিনোদনও তো নানা স্তরের হতে পারে। মূল মানবিক সত্যের কোন বিকৃতি না ঘটিয়ে,

সুস্থ ও স্বাভাবিক মানব প্রবৃত্তির ও ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, মানুষের প্রতি মমতা ও ভালবাসা নিয়ে যে বিনোদনের প্রচেষ্টা তা তো অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। সমাজ সমালোচনার কোন সচেতন প্রয়াস যদি তাতে না'ও থাকে, সমাজ রূপান্তরের কোন ইঙ্গিত যদি সেই শিল্প না'ও দিতে পারে, তবুও তা সার্থক হতে পারে যদি সেই শিল্প জীবনের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকে, মানুষের প্রতি সৎ থাকে।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই সুস্থ প্রমোদ বিতরণের ক্ষেত্রে নিউ থিয়েটার্স একটি ঐতিহ্যের স্রষ্টা। সেই ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করেই, মধ্যবিত্তদের দ্বারা, মধ্যবিত্তের জন্য। নিউ থিয়েটার্সের 'জীবতাং জ্যোতিরেতু হায়াম'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন সেকালের প্রায় সব গুণী বাঙালী চলচ্চিত্রকারেরা। ঝাঁক ধরে তাঁরা ছবি তুলেছেন, মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নিউ থিয়েটার্স পোষিত সেই এক ঝাঁক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়াও (১৯০৩-১৯৫১) ছিলেন একজন। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে বাংলা হিন্দী মিলিয়ে যে মোট একুশটি ছবি তিনি পরিচালনা করেছিলেন তার ভেতর এগারোটিই নির্মিত হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে। 'রজত জয়ন্তী' (১৯৩৯) প্রমথেশ বড়ুয়া পরি-চালিত দ্বাদশ ছবি, অবশ্য এই ছবির পর থেকেই নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

ছবিটি নির্মিত হবার পঁয়তাল্লিশ বছর বাদে একজন একালের শহুরে বাঙালীর চোখে ছবিটি কেমন লাগল তাই একটু আলোচনা করা যাক।

পরিচ্ছন্ন এবং কৌতুকপ্রদ অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ছবিটির ক্রেডিট টাইটেল শুরু হয়। অন্য সব নাম পাওয়া গেলেও পাওয়া যায় না কেবলমাত্র মূল কাহিনীকারের নাম। রুচিসম্পন্ন ক্রেডিট টাইটেলটি আমাদের তৃপ্ত করে, যা একালের বেশীর ভাগ বাংলা ছবিতেও বেশ দুর্লভ। লঘু একটি প্রহসনের আবহাওয়া তৈরী হয়ে যায়। তারপরেই আমরা পরিচিত হই ছবির নায়ক, মফঃস্বলের এক ক্ষুদে জমিদারের ভাগ্নে রজত এবং তার মাসতুতো ভাই বিশুর সঙ্গে। বোঝা যায় এই আলালের ঘরের দুলাল দুটির জীবিকা অর্জনের কোন গরজ নেই। রজত সৌখিন হোমিওপ্যাথির চর্চায় মশগুল আর বিশুর লক্ষ্য কলকাতায় একটি সিনেমা কোম্পানীর জন্য মামার কাছ থেকে হাজার দশেক টাকার সংস্থান করা। এ'ও জানা যে রজত তাদের প্রতিবেশীর কন্যা জয়ন্তীর প্রেমে মশগুল, যদিও সে প্রেম নিবেদন করবার সাহস তার নেই।

রজত ও বিশুর মামা জমিদার বগলাচরণ এবং অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরনাথ প্রায় বিশ বছরের পুরোনো বন্ধু এবং প্রতিবেশী। কিন্তু বাগানের সীমানা নিয়ে

সামান্য একটু তর্কাতর্কির ফলে দুই বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হল, ফলে জয়ন্তীর প্রতি রজতের অপ্রকাশিত প্রেম আরো জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ল। ইতিমধ্যে সকন্যা এক প্রতারকের আবির্ভাব ঘটল বগলাচরণের গৃহে, তাদের অতিথি হিসেবে। প্রতারক নটরাজ সামন্ত নিজের পরিচয় দিল বর্মা নিবাসী এক লক্ষপতি জমিদার হিসেবে। তার কন্যা স্বপ্না অতি ধুরন্ধর মেয়ে, বাপের সমস্ত প্রতারণা ও জুয়োচুরির মূল পরিকল্পনাকার সে'ই। বাপ মেয়ের প্রতারণার ফাঁদে পড়লেন বগলাচরণ। স্বপ্না জানাল সে বগলাচরণের প্রয়াত স্ত্রীর সব অলঙ্কারগুলি কিনে নিতে চায়। এদিকে গহনাগুলি ছিল ইনসিওর করা। স্বপ্নার পরামর্শে বগলাচরণ নিজেই গহনাগুলি চুরির ব্যাপারে উদ্যোগ নেন এবং 'মাভৈঃ হেলথ হোম'-এর পরিচালক প্রফেসর গজানন ওরফে রঘুয়ার সাহায্য চান। প্রফেসর গজানন একদিকে বগলাচরণের ব্যায়াম শিক্ষক, অপরদিকে নটরাজ সামন্তের পুরোনো সাগরেদ। জেল খাটার পূর্ব অভিজ্ঞতাও তার আছে।

নানা মজাদার ঘটনার পর গজানন গহনাগুলি বগলাচরণের হয়ে চুরি করল। ইতিমধ্যে বগলাচরণ জানতে পারলেন যে নটরাজ আর তার মেয়ে আসলে প্রতারক। তখন তিনি তথাকথিত চোরাই মাল পার্শেল করে শহরে পাঠিয়ে দিয়ে রসিদটি রাখতে দিলেন ভাগ্নে রজতের কাছে। ইতিমধ্যে রজতের ভীরুতা এবং ধূর্ত বুদ্ধিমতী স্বপ্নার জালে রজত জড়িয়ে পড়ায় জয়ন্তী বিশুকেই বিবাহ করবে বলে স্থির করে। এইভাবে সে রজতকে কিছুটা শিক্ষা দিতে চায়।

বিশু আর জয়ন্তীর বিবাহের তারিখ স্থির হয়ে যায়। এদিকে গজানন, নটরাজ আর স্বপ্না কৌশলে রজতকে বন্দী করে গহনা পার্শেলের রসিদটি আদায়ের চেষ্টা করে। রজত তাদের চালাকি ব্যর্থ করে দিয়ে উল্টে তিন প্রতারককেই আটকে ফেলে। স্বপ্না জানায় যে থানা পুলিশ করে কোন লাভ হবে না, কারণ তাতে বগলাচরণও জড়িয়ে পড়বেন। তখন রজত বগলাচরণকে জানায় যে হরনাথবাবুর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে তার মেয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে না দিলে সে মামার সব কীর্তি ফাঁস করে দেবে। তখন বগলাচরণ ভাগ্নের সব দাবী মেনে নেন এবং জয়ন্তীর সঙ্গে রজতের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

হালকা এই কমেডিটির মধ্যে উপভোগ্য মুহূর্ত আছে অনেকগুলি। নটরাজ আর তার মেয়ের নকল আভিজাত্যের নানা কৌতুককর ঘটনা, প্রফেসর গজাননের 'মাভৈঃ হেলথ হোম'-এর মজাদার পরিবেশ, গজাননের গহনা চুরি, গহনা চুরিতে বগলাচরণের সাহায্য, জয়ন্তীকে প্রেম নিবেদন করতে রজতের উপর্যুপরি ব্যর্থতা—এগুলো সবই দর্শককে অনাবিল আনন্দ দেয়। জমাটি গল্প, সাবলীল অভিনয় আর পরিচ্ছন্ন কৌতুক এই সব কিছু মিলে ছবিটিকে করে তোলে আনন্দদায়ক আর উপভোগ্য।

ফিল্মে চলচ্চিত্রধর্মী অভিনয়ের চাইতেও বেশী জোর দেওয়া হয় ঘটনার নাটকীয়তা আর সংলাপের উপর। প্রতিটি চরিত্রই কথা বলে, বড্ড বেশী কথা বলে। মাত্র আট বছর আগে নির্বাক ছবিকে সবাক করবার কায়দাটি রপ্ত করার জন্যই হোক, অথবা চলচ্চিত্রের স্বধর্ম সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোন সঠিক ধারণা গড়ে না ওঠার জন্যই হোক চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় গল্প বলার কোন চেষ্টা না করে সেকালের অন্য সব পরিচালকের মতই প্রমথেশ বড়ুয়াও যা করে গেছেন তাকে থিয়েটারের ফটোগ্রাফ্‌ড্‌ অনুবাদ ছাড়া আর বেশী কিছু বলতে আমাদের বাধে।

কাহিনীর পরিধিও উচ্চ-মধ্যবিত্ত জগতের চৌহদ্দির গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে না। জমিদার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শিকারী, সৌখিন সিনেমা কোম্পানীর লোক, আর অলস অকর্মণ্য ধনী পরগাছা যুবকদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই গোটা কাহিনীটি ঘুরপাক খেতে থাকে। উচ্চ-মধ্যবিত্তের যে জগৎ তা পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা তার মূল্য-বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন। অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র আর ঔপনিবেশিক মূল্যবোধকে সমাজ প্রগতির আলোকে বিচার করবার কোন প্রচেষ্টাই প্রমথেশ বড়ুয়ার কোন ছবিতে নেই, আর সে ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়নের সমস্ত উত্তাপ ও স্পর্শকে বাঁচিয়ে কেবলমাত্র শহুরে মধ্যবিত্তকে নিরাপদ এবং তৃপ্তিদায়ক বিনোদন দেওয়াই ছিল এই জাতীয় সভ্য-ভব্য প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনে সেকালের দিনে এই ছবি নিশ্চয়ই সফল হয়েছিল। কিন্তু প্রহসনের মধ্য দিয়েও যে হীরকদ্যুতির মত কোন গভীরতর জীবনসত্যের প্রতিফলন ঘটানো যায়, সে রকম কোন প্রচেষ্টাই এই ছবিতে নেই। ভীরু প্রেমিকের হৃদয়দৌর্বল্য, ধনী ব্যক্তির অধিকতর ধনলোভ, প্রতারণা ও জালিয়াতি—অবশেষে সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়, এই সরল রেখা ধরেই কাহিনীটি এগিয়েছে।

'মা ভৈঃ হেলথ হোম'-এর পরিকল্পনাটি কিছুটা অভিনব, আর প্রফেসর গজানন-এর ভূমিকায় পণ্ডিত শোরও আমাদের আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর। সেকালের বেশ কিছু দক্ষ অভিনেতাকে আমরা দেখতে পাই এই ছবিতে। নটরাজ সামন্তর ভূমিকায় ইন্দু মুখো-পাধ্যায়, বগলাচরণের চরিত্রে শৈলেন চৌধুরি, বিশুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, হরনাথের ভূমিকায় দীনেশরঞ্জন দাস, আর সুপ্তা দেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবী সুন্দর সাবলীল অভিনয় করে গেছেন। আপত্তি কেবল নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় স্বয়ং প্রমথেশ বড়ুয়া আর মেনকা দেবীর অভিনয়ে। রজত আর জয়ন্তীর চরিত্রে তাঁদের দুজনকেই কেমন যেন জড় আর স্থাণু বলে মনে হয়েছে। নির্জীব প্রাণোচ্ছ্বাস বর্জিত জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা কেবল কিছু সংলাপ আউড়ে গেছেন, চরিত্রে কোন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। নাম ভূমিকার চরিত্র দুটির অভিনয়ের জড়তা ও কৃত্রিমতাকে অতিক্রম

করে পার্শ্বচরিত্রগুলির সজীবতা ও উচ্ছলতাই এই কমেডিটিকে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছে।

হয়ত যান্ত্রিক উন্নত মানের অভাবেই এই ছবিতে ক্যামেরা বহির্দৃশ্যগুলিতে স্থাণু এবং অন্তর্দৃশ্যগুলিতে, বিশেষ করে রাত্রিবেলায় নায়ক নায়িকার নৌকাবিহারের দৃশ্যে একেবারেই কৃত্রিম।

মধ্যবিত্ত দর্শককে সপরিবারে যে পরিচ্ছন্ন প্রমোদ বিতরণের প্রচেষ্টা প্রায় পাঁচ দশক আগেকার এই বাংলা ছবিটিতে ছিল, আজকের দিনের সাধারণ বাংলা ছবিতে, এমন কি তথাকথিত প্রহসনগুলিতেও তার অভাব আমাদের কেবল পীড়িতই করে তোলে।

বুদ্ধির দীপ্তি না থাকলেও, অন্ততঃ প্রয়াসের আন্তরিকতার জন্য আজকের দিনেও প্রমথেশ বড়ুয়ার এই ছবিটি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সশস্ত্র বিপ্লবের দলিল 'অ্যালসিনো এণ্ড দ্য কন্‌ডোর'

প্রদীপ বিশ্বাস

লাতিন আমেরিকায় চলচ্চিত্র বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এখনও হচ্ছে। ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া, কিউবা প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের চিত্র পরিচালকেরা রাজনীতি ও বিপ্লব—দুটো বিষয়কে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন তাঁদের সিনেমাতে, সিনেমার বিষয় নির্বাচনে। এই প্রসঙ্গে লাতিন আমেরিকার ছোট্ট দেশ চিলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্তরের দশকের প্রথম পর্বেই চিলির বিপ্লবী সরকার আলেন্দির পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দালালেরা দখল করে নেয় জনগণের দুর্গ চিলি। বিপ্লবী চিত্র পরিচালকেরা যেমন প্যাট্রিসিও গুজম্যান, মিগুয়েল লিটিন, রউল রুইজ সকলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলেন, দেশ ছাড়লেন। ছবি তৈরি কিন্তু বন্ধ রইল না। আশপাশের রাজ্যে তাঁরা আশ্রয় নিলেন, ছবি করলেন। বিপ্লবী ছবিই করে চললেন। বিষয় ঐ একই রাখলেন, জনগণের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। চিলি তথা সব লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস বিবৃত হলো ছবির গাম্ভীর্যে, ভাবনায় দ্যোতনায় এবং বিপ্লবী যুক্তিবাদে।

লাতিন আমেরিকার আলেন্দির দেশ চিলি। মানুষের বিদ্রোহী ভূমিকার লড়াকু দেশ চিলি। সেই চিলির বিদ্রোহী পরিচালক হলেন মিগুয়েল লিটিন। লিটিন চিলি ছেড়ে

তাঁর বিপ্লবের ছবি করলেন 'অ্যালসিনো এণ্ড দ্য কনডোর' বিপ্লবী সরকারের দেশে নিকারাগুয়াতে। সহযোগিতা করল কিউবা। সম্প্রতি লিটিনের সেই বিপ্লবী ছবি 'অ্যালসিনো এণ্ড দ্য কনডোর' আমরা দেখলাম কলকাতায় বসে। ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন কলকাতা সিনে সেণ্ট্রালের কর্তৃপক্ষ।

'অ্যালসিনো এণ্ড দ্য কনডোর' লিটিনের বিপ্লবী ডায়ালেকটিকসের ছবি। নিপীড়িত জনগণের অভ্যুত্থানের ছবি। বিপ্লবের ছবি। বিষয়ের শুরুতে আমরা দেখি সাম্রাজ্যবাদী দানবদের নিরন্তর আকাশে ছুটে চলার দৃশ্য। সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আস্ফালন। মানুষকে লুটিয়ে দেয় শস্যক্ষেত্রের সবুজ চাদরে। দানা বাঁধে শ্রেণীশত্রুরা নীরবে। খেটে খাওয়া মানুষেরা ধরা পড়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রে। চলে আস্ফালন, নিপীড়ন, অত্যাচার। সব কিছু কাটা কাটা চিত্রের সারিবদ্ধতায় মন্তাজ হয়ে অত্যাচারের কাহিনী লাল হয়ে ওঠে। উত্তেজনা বাড়ে। ছোট ছেলে অ্যালসিনোর চোখ দিয়ে আমরা এতক্ষণ সব দেখি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ধীরে ধীরে নেমে আসে শোষকের ভূমিকায়। কুব্জ পৃষ্ঠ অ্যালসিনো বুঝতে পারে 'অ্যামষ্টারডাম' উচ্চারণের অর্থ পরাধীনতা। সেই সঙ্গে আমরা দেখি জনগণের বিপ্লবী ভূমিকার চিত্র। মাটির মানুষেরা সজ্জিত হয় অস্ত্রসজ্জায়। প্রস্তুতি নেয় শ্রেণীশত্রু খতমের। মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের বিপুল সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবে এনে দেয় কনডোর ভূমিতে জনগণের স্বাধীনতা। রক্তাক্ত সংগ্রামে অ্যালসিনো তুলে ধরে শেষ আগ্নেয়াস্ত্রটি। সে একজন বিপ্লবী 'ম্যানুয়েল' হয়ে যায়। মিগুয়েল লিটিন সাহসের সঙ্গে বলে চলেন তাঁর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার কথা অ্যালসিনোর চোখ দিয়ে চেতনা দিয়ে। লিটিন নোতুন বিপ্লবী শব্দ চয়ন করে নেন, যোদ্ধাকে চিহ্নিত করেন 'ম্যানুয়েল' নামের অন্তরালে। আমাদেরকে শুনিয়ে দেন বিপদে আমরা যেন সকলেই 'ম্যানুয়েল' হয়ে উঠতে পারি। 'ম্যানুয়েলের' আর এক নাম বিপ্লবী শপথ। মিগুয়েল লিটিন বিপ্লবকে হাজির করেছেন খুব স্বাভাবিক ভাবে, দেশজ মৃত্তিকার মত নরম করে, বহমান শোণিতের চাঞ্চল্যের ধারায়। সঙ্গে প্রতিটি ছবির ফ্রেমকে করেছেন সাবলীল কিন্তু কঠিন। ক্যামেরার রঙের বহমানতায় সবুজ, লাল, ফিকে —সব চলন্ত মানুষ মোটিফের সাযুজ্যে অর্থবহ হয়ে ওঠে। বিষয় ও আঙ্গিক হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। লিটিনের কাটিং আরও সুন্দর। তাঁর প্রতিটি কাটিংয়ে বিষয়ের মেজাজ বিপ্লবের চরম অর্থটুকুকে পরম সূক্ষ্মতায় পরিবেশন করতে সক্ষম হয়।

মিগুয়েল লিটিন দিল্লীতে জুরির সদস্য হয়ে এসেছিলেন কবছর আগে। সেখানে জোরের সঙ্গে বলে গিয়েছিলেন : "We regard our people as our only masters. Our cinema should find its roots in our people. I think that our self expression through cinema, must be to fight for our liberty. We

should show the feelings of our people and their attitude towards freedom. The liberation of our people should be the main idea behind the creation of our films. This attitude of our film people, added to the revolutionary spirit of our people, would be our aesthetic."

লিটিনের ছবি নিপীড়িত মানুষের কাছে বিপ্লবী ইস্তেহার হোক।

প্যাসেঞ্জার

অমিয় বসু

> "Man, who has no fear of the scientific unknown, is frightened by the moral unknown."—আন্তনিয়নি

শূন্যতাবোধ আন্তনিয়নির নায়ক বা নায়িকাদের চিরকালের নিয়তি। খুব সরল করে দেখলে, তাঁর সব ছবিই আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এবং আন্ত-নিয়নির সব ছবিতেই এই সংগ্রামের মোটামুটি নির্দিষ্ট একটা চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর নায়ক বা নায়িকার সমস্যা মূলত প্রেমজনিত, এবং তার সমাধানের ইঙ্গিত ওই প্রেমে—পুনর্মিলনে অথবা সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসে। 'ব্লো-আপ' থেকে এই রীতির ব্যতিক্রম শুরু হয়েছিল, 'দি প্যাসেঞ্জার' ছবিতে সেই ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে।

'ব্লো-আপ' ছবির নায়ক ফটোগ্রাফার টমাসকে আন্তনিয়নি নানাভাবে বিদ্রূপ করেছেন। টমাস ব্যবহার করে এমন একটি যন্ত্র যার সম্পর্ক কেবল ঘটমান বর্তমান কালের সঙ্গে, একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের সঙ্গে। এই যন্ত্রটি আর্টের স্বাভাবিক শর্ত হিসেবে প্রকৃতি বা স্বাভাবিকতাকে বিকৃত করে দেখায়। ক্যামেরার লেন্স এই দৃষ্টিবিকারের মাধ্যম। আন্ত-নিয়নির নায়ক যেদিন তার যন্ত্রের মাধ্যমে একটি অধিকৃত 'সত্য' ঘটনা আবিষ্কার করল, সেদিন সে নিজেই চমকিত হলো। 'প্যাসেঞ্জার'-এর নায়ক ডেভিড লক্‌ও একজন টেলি-ভিসন ফটোগ্রাফার। কিন্তু টমাসের চেয়ে সে বহু পরিমাণে আত্মসচেতন, কারণ ছবির শুরু থেকেই সে নিজের ব্যর্থতার কথা জানে।

'প্যাসেঞ্জার' ছবির প্রাথমিক অধ্যায়ে, নিতান্ত অল্প পরিসরে, লকের ব্যর্থ জীবন-ধারার একটি সুচিন্তিত রূপ উপস্থিত করা হয়েছে। আন্তনিয়নির ছবির প্রথম অধ্যায় তীক্ষ্ণতার জন্য সমালোচকদের কাছে আদৃত হয়ে থাকে; এখানেও নামমাত্র সংলাপ এবং

দৃশ্য রচনার কৌশলে অনায়াসে একটি বিশেষ মেজাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার নামহীন, দরিদ্র, ধুলিধুসর এক শহরের রাস্তায় ডেভিড লক্ গাড়ি চালিয়ে আসে। গাড়ি থামিয়ে সে রাস্তায় নামে এবং পরে পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে গিয়ে কয়েকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে। কি উদ্দেশ্যে সে এই শহরে এসেছে তা দর্শকদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, কারণ লক্ স্থানীয় ভাষা বোঝে না, বলতেও পারে না ; সে কথা বলে খানিকটা ইংরেজীতে, খানিকটা ভাঙা ফরাসীতে, অবশেষে নিরুপায়ের মতো কেবল অঙ্গ-সঞ্চালনের সাহায্যে।

এই পর্যায়ের শেষ হয় একটি নিখুঁত আন্তনিয়নি-সুলভ দৃশ্যে। আমরা চলে আসি বিশাল একটি মরুভূমির লং শটে এবং দেখতে পাই ফ্রেমের একপ্রান্ত থেকে লকের হালকা সবুজ ল্যাণ্ডরোভার ধুসর বালির উপর কীটের মতো এগিয়ে চলেছে। গাড়ির এঞ্জিনের আর্তনাদের উপর লক্ তার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে কথা বলে প্রায় ক্ষিপ্ত চিৎকারে। এখানেও প্রায় প্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটে। লকের আফ্রিকান পথপ্রদর্শক তাকে মাঝ-পথে ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়। লক্ ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার গাড়ি মরুভূমির বালিতে অচল হয়ে পড়ে। লক্ প্রাণপণে বালির বন্ধন থেকে গাড়ির চাকা উদ্ধার করার চেষ্টা করে, যদিও মরুভূমির প্রখর রোদে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিক্ত-মুখে, ঘর্মাক্ত দেহে লক্ বালির উপরে বসে পড়ে, দুপাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে দিক্‌ভ্রষ্টের মতো। তার অনড় যন্ত্রযান তার নিজের রিক্ত জীবনের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

এর পরে লক্‌কে তার হোটেলে ফিরে আসতে দেখি। ক্যামেরা মরুভূমির দীর্ঘ, বিবর্ণ দিগন্ত থেকে হোটেলের দীর্ঘ, বিবর্ণ দেওয়াল ধরে লকের সঙ্গে চলে। পান্থশালার নিরাভরণ ঘরে সামান্য আয়োজনের মধ্যে লক্ একা বসে থাকে বন্দীর মতো। এই অংশ-টুকু পরবর্তী দৃশ্য-পর্যায়ের জন্য দর্শককে মনে মনে প্রস্তুত করে রাখে। ক্রমে সাউণ্ডট্র্যাকে শোনা যায় দুটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর—পূর্বদিনের একটি কথোপকথন—তার থেকে ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখতে পাওয়া যায় দুই বক্তাকে : লক্ ও তার হোটেলের প্রতিবেশী ডেভিড রবার্টসন। এখানেই আমরা প্রথম জানতে পারি যে, লক্ আফ্রিকার কোন দেশে গেরিলা যুদ্ধের উপর একটি তথ্য চিত্র তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু দর্শক জানেন যে, লক্ অত্যন্ত অবসন্ন। এই ছবিটি না তুলতে পারলে বরং সে খুশি হবে। লক্ টেপ-রেকর্ডার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং পাশে রবার্টসনের ঘরের দিকে যায়। আন্তনিয়নির নায়ক আপন শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়।

পরবর্তী দৃশ্যপর্যায়টি ছবির দুটি বিপরীত কেন্দ্রের প্রথম। দৈর্ঘ্যের দিক থেকেও এটি ছবির অন্তিম অংশের সঙ্গে তুলনীয়। দুটি কেন্দ্রেরই ঘটনাস্থল নির্জন পান্থশালার ঘর; দুই দৃশ্যেই একটি মৃত্যু; দুই মৃত্যুই একটি তীক্ষ্ণ শ্লেষকে (irony) ছুঁয়ে থাকে। প্রথম মৃত্যুতে সুরু হয় একটি 'জীবন', দ্বিতীয় মৃত্যুর সঙ্গে সেই জীবনের সমাপ্তি। ছবির মূল নৈতিক প্রশ্নটিও এই দুই বিপরীত কেন্দ্রের মধ্যে নিহিত। আমরা এই প্রশ্নটি কী আলোচনা করি।

লক্ যখন প্রথম রবার্টসনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় ভূমিকা পরিবর্তনের কথাই তার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি কি একমাত্র উভয়ের শারীরিক মিল? লক্ আগেই জেনেছিল যে রবার্টসনের জীবনে কোথাও একটি গূঢ় সুখ আছে। তার নিজের জীবনের ব্যর্থতার 'পরিসমাপ্তি' ঘটানোর এই সুযোগ সে গ্রহণ করে; ডেভিড লক্ হিসেবে মৃত্যুবরণ করে' জীবন গ্রহণ করে রবার্টসন হিসেবে। এই পরিবর্তন যে খুব অনায়াসে সংঘটিত হয় তা নয়। ছবিতে এই দৃশ্যপর্যায়ের নিখুঁত ডিটেল উপস্থিত করা হয়েছে এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও চলচ্চিত্রের সময় ঘড়ির কাঁটাকে মান্য করেছে। বেশ পরিবর্তনের পর লক্ নতুন ঘরে চলে আসে এবং তাকে আমরা হাঁফাতে দেখি। এই শ্রান্তি স্পষ্টত নিছক শারীরিক নয়। গ্যারেট স্টুয়ার্ট (সাইট অ্যাণ্ড্ সাউণ্ড, শীতকালীন সংখ্যা ১৯৭৫/৭৬) মন্তব্য করেছেন যে, এই অবসাদ লকের তীব্র নৈতিক ও মানসিক দ্বন্দ্বের ফল।

লক্ যখন রবার্টসনের পরিচয় গ্রহণ করে তখন লকের সঙ্গে দর্শকেরও স্বাভাবিক বিশ্বাস হয় যে, এই ভূমিকা পরিবর্তন সফল হবে। নাটকীয় কৌশল হিসেবে চলচ্চিত্রে চিরদিনই এই alter ego বা অপর সত্তারা সফল; ছদ্মবেশধারী নায়ক কখনোই বিফল হয় না। আন্তনিয়নি দর্শকের এই সহজ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছেন। ভূমিকা পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর নায়ক ব্যর্থ। লক্ চেয়েছিল জীবনের সার্থকতা, কিন্তু রবার্টসনের জীবনের মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পারল যে, প্রতিটি মানুষকে তার নিজের সার্থকতা খুঁজে নিতে হয়। যেটা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা যায় না।

অথচ সার্থকতার সমস্ত উপকরণ গল্পে আপাতদৃষ্টিতে উপস্থিত ছিল। লক্ জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, পক্ষান্তরে রবার্টসন জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে আস্থাশীল। লকের কোনো আদর্শ ছিল না, তার নিজের পেশাতেও না ("You've got no real dialogue"—Rachel)। কিন্তু রবার্টসন কয়েকটি দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা চালিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য সুরু হয়েছিল গেরিলা আন্দোলন আফ্রিকার কোনো এক দেশে; লক্ তার পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়। তার তোলা নিউজরীল থেকে দেখা যায় সে শাসনকর্তা

মহাশয়ের নির্জলা মিথ্যাগুলোও ধরে রেখেছে। রবার্টসন ছিল ওই আন্দোলনে বিশ্বাসী; সে গেরিলাদের অস্ত্র সরবরাহ করতো। একটু সরল করে দেখলে, লক্ একজন outsider—রবার্টসন অস্তিবাদী এবং আদর্শনিষ্ঠ। জীবনসংগ্রামে সার্থক রবার্টসনের ভূমিকায় লকের সফল না হওয়ার কোনো স্বাভাবিক কারণ ছিল না।

রবার্টসন বনাম ডেভিড লক্

ডেভিড লক্ রবার্টসন হিসেবে ব্যর্থ হ'লো কেন? রবার্টসনের ডায়েরী থেকে যে-সব ঠিকানা ও ছেঁড়া সাল-তারিখ পাওয়া যায় লক্ সেগুলি পড়ে ঈষৎ ভ্রুকুটির সঙ্গে। ডায়েরির কর্মসূচী অনুসারে সে যায় একটি বিশাল চার্চে, সেখানে এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা। লকের চার্চে প্রবেশের দৃশ্যটিকে প্রায় প্রতীক হিসেবে ধরা যায়। সে এমন এক মানুষ যে কোনো সহজ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চায়, অবলম্বন করতে চায় কোনো স্থির সত্যকে। দেবতার সন্ধান পেলেই সে হয় তন্নিষ্ঠ পূজারী। এই দৃশ্যেই কিন্তু সে জানতে পারে যে তার অর্থাৎ রবার্টসনের ভূমিকা ভক্তের নয়, গোপন অস্ত্র সরবরাহকারীর। শ্লেষ হিসেবে ক্যামেরা চার্চের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবমূর্তি ও iconগুলির উপর ধীরে ধীরে প্যান ক'রে যায়।

লক্ যে টেলিভিসন কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিল তার প্রযোজকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে লকের জন্ম ইংল্যাণ্ডে, শিক্ষা আমেরিকায়। কর্মসূত্রে সে এসেছিল আফ্রিকায়। রবার্টসন হিসেবেও তার ভবঘুরে-বৃত্তির শেষ হয় না। সে প্রথমে যায় নিউইয়র্ক, পরে ম্যুনিখ ও বার্সিলোনা, এবং সবশেষে স্পেনের এক অখ্যাত শহরে। বস্তুত, 'প্যাসেঞ্জার' ছবির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যের পশ্চাৎপট স্থিরতার অভাব সূচিত করে। ঘটনাস্থলগুলি প্রধানত হোটেল, রেস্তোরাঁ, চলন্ত গাড়ি, মরুভূমি অথবা রাস্তা এবং একবার ঝুলন্ত কেব্‌ল কার। ছবিতে ক্যামেরা একবারও কোনো গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে যায় না। শান্ত গৃহকোণ চিরকালই লকের স্বপ্নের বস্তু হয়ে থাকে।

এর বিপরীতে, নায়িকার (তার নাম ছবিতে অপ্রকাশিত) সঙ্গে লকের প্রথম পরিচয় একটি পার্কে। লং শটে আমরা যখন নায়িকারূপী মারিয়া শ্নাইডারকে প্রথম দেখি তখন সে চারিপাশের সতেজ ও সবুজ বৃক্ষপল্লবের দ্বারা পরিবৃত। আন্তনিয়নি এই চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের ভুল করার অবকাশ দেননি। নায়িকা স্থপতিবিদ্যার ছাত্রী (সে গড়ে)। সমালোচকরা হয়তো বলবেন, সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমতী নায়িকার এই চরিত্রটি তাঁদের অজানা নয়, নায়কের বিবেকের প্রতিনিধি-স্বরূপ এই চরিত্রটিকে (যেমন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও নাটকে শ্যালিকা-নায়িকার যে type পাওয়া যায়) তাঁরা বহুবার দেখেছেন। কিন্তু, আন্তনিয়নির ছবিতে এই নায়িকাও নায়ককে কোনো সার্থক-

তার স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারে নি। আন্তনিও গডি-কৃত হোটেল মিলার ছাদে গৃহীত দৃশ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। লং শটে ফ্রেমের একপাশে নিকল্‌সন, অন্যপাশে শ্নাইডার, মধ্যে উঁচু-নিচু সিঁড়ি ও ধাপ, অসংখ্য চিমনীর অর্গল এবং বিচিত্র বায়ু-সঞ্চালক (ventilator)। প্যাসেঞ্জার-এর নায়ক এগিয়ে যাওয়ার সহজ কোনো রাস্তা খুঁজে পায় নি।

হয়তো এই কারণেই 'প্যাসেঞ্জার' আন্তনিয়নির ছবির সাধারণ দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এ যাবৎ আন্তনিয়নির প্রায় সমস্ত ছবির শেষ দৃশ্য এক অনিবার্য আশাবাদের দ্বারা আক্রান্ত। লাভেন্তুরা এবং লা নত্তে-র জটিল চরিত্রগুলিও অন্তিম ভোরের দৃশ্যে এক অস্ফুট সার্থকতার ইঙ্গিত পেয়ে যায়; ব্লো-আপ এবং জাব্রিস্কি পয়েন্টের মতো সাধারণ-ভাবে নৈরাশ্যবাদী ছবিও শেষ পর্যন্ত আশার ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয়। এই আশাবাদ থাকা অসমীচীন, এরকম কোনো দাবি না করেও বলা যায় যে, আন্তনিয়নির ছবির সামগ্রিক মেজাজের সঙ্গে তাঁর অনেক ছবির শেষাংশ বেমানান। 'প্যাসেঞ্জার' তাঁর ইদানীংকালের একমাত্র ছবি যেখানে তিনি এই আশাবাদকে বর্জন করেছেন।

ছবির শেষ অধ্যায়ে নায়িকা লক্‌কে বোঝাবার চেষ্টা করে।

নায়িকা : Robertson believed in something. That's what you wanted, isn't it?

লক্ : But he's dead.

নায়িকা : But you're not.

কিন্তু ইতিমধ্যে লকের মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হয়েছে। সে নায়িকাকে একটি অন্ধ লোকের কাহিনী শোনায়। অন্ধ লোকটি হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। প্রথমে স্বাভাবিক-ভাবেই তার আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু পরে যখন চারিপাশের যন্ত্রণা গ্লানি সে স্বচক্ষে দেখল তখন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। লকের পরিচয় বদল করার সঙ্গে এসেছিল 'প্যাসেঞ্জার' ছবির প্রথম ক্লাইম্যাক্স; শ্নাইডারের সঙ্গে এই কথোপকথন আমাদের নিয়ে যায় দ্বিতীয় ক্লাইম্যাক্সের দিকে।

সাতটি নীরব মুহূর্ত

'প্যাসেঞ্জার' ছবির শেষ সাতটি মিনিট ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। একই সঙ্গে এই দৃশ্য পর্যায় নিয়ে অভিযোগও উঠেছে। রিচার্ড রাউডের মতে, "One can see the whole film, in a sense, setting us up in order to allow him [আন্তনিয়নি] to shoot the ultimate sequence." দীর্ঘ দৃশ্যপর্যায় আন্তনিয়নির ছবিতে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত, লাভেন্তুরায় ক্লদিয়ার প্রতীক্ষা

করার দৃশ্যটি চলে দশ মিনিটেরও বেশী, কিন্তু সেটি ছবির সামগ্রিক গঠনকে কি দুর্বল করে? 'প্যাসেঞ্জার' ছবিতেও আন্তনিয়নি দুটি বিপরীত কেন্দ্র হিসেবে দুটি ক্লাইম্যাক্স গড়ে তুলেছেন। প্রথমটিতে, লক্ রবার্টসনের জীবন নিজের জন্য গ্রহণ করে; দ্বিতীয়টিতে, সে গ্রহণ করে রবার্টসনেরই প্রাপ্য মৃত্যু। একটি অপরটির পরিপূরক। এই জীবন-মৃত্যুর মেলবন্ধন সম্পর্কে গ্যারেট স্টুয়ার্ট বলেছেন, "Pretending to have died as Locke, the protagonist ends up being killed as Robertson." যাঁরা ছবির শেষ দৃশ্য পর্যায়ের সমালোচনা করেন তাঁরা সম্ভবত প্রথম ক্লাইম্যাক্সের কথা ভুলে যান; সেটিও সম্পূর্ণ নির্বাক এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিতীয়টির সমান। সঙ্গীতের ভাষায় দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির কাউন্টার-পয়েন্ট বলা চলে।

হোটেল দ্য লা গ্লোরিয়ার শেষ দৃশ্যে ক্যামেরা একটি নিরবচ্ছিন্ন শটে ট্র্যাক করে জানলার বাইরে চলে যায়, সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘুরে হোটেলের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং বারান্দা দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তের মত ফিরে আসে লকের ঘরে, ক্লোজআপে দেখায় তার শয্যা—যেখানে তার মৃতদেহ পড়ে আছে। ছবির নৈতিক শ্লেষ (moral irony) এখানে সম্পূর্ণ হয়। ছবির প্রথমদিকে মরুভূমির মধ্যে অচল গাড়ির বনেটের উপর লক্‌কে আমরা দেখেছিলাম ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দু-হাত প্রসারিত করে চিৎকার করে উঠতে। এখানে আর একবার তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়—মৃত্যুশয্যাতেও তার হাত দুটি দুদিকে প্রসারিত। 'প্যাসেঞ্জার'-এর অন্তিম শ্লেষ হয়তো কোন গভীর ট্র্যাজেডির দ্যোতনা বহন করে আনে। লক্ নিজের মুক্তি সাধন করতে অক্ষম, তবু সে যায় অন্যের জীবনের মাধ্যমে 'মুক্তি' অর্জন করতে। দুবারই সে ঘটনাচক্রের victim। দুবারই তাকে জীবন থেকে অপসৃত হতে হয়, তাই সে শহীদও বটে।

'প্যাসেঞ্জার' ছবিতে আন্তনিয়নির পরিচিত গুণগুলি উপস্থিত : ল্যাণ্ডস্কেপ এর ব্যবহার যা প্রায়শঃই মহান ইতালিয়ান চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; স্বাভাবিক শব্দের অনুষঙ্গ (কলের জল পড়া, এঞ্জিনের কর্কশ আর্তনাদ); ছেদহীন দৃশ্যপর্যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এই ছবিতে একটি নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে। আন্তনিয়নির নায়করা উপলব্ধি করেছে তারা সবাই একা, জীবনের মানে খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব তার নিজেরই—এবং এর সহজ কোনো সমাধান নেই প্রেমে অথবা বন্ধুত্বে। হয়তো এই পরিবর্তন আন্তনিয়নির চলচ্চিত্রে কোনো নতুন মোড় নিয়ে আসবে।

ইলমাজ গুণের ছবি 'এনিমি'

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেখা ইলমাজ গুণের চতুর্থ ছবিটির নাম 'এনিমি' (শত্রু)। বলা যায় যে, লেনিনের একটি কথার ব্যঞ্জনা এই ছবির সুরে যেন বেজে ওঠে। যাঁরা চান এই পচা সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে তাঁদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বারে বারে এসে দাঁড়ায়—'শত্রু কে?' আমাদের লড়াই উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে যদি শত্রুকে আমরা চিহ্নিত করতে না পারি। গুণের প্রথম তিনটি ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়, ইলমাজ গুণে যেন ক্রমশঃ সত্যের মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রথম ছবিতে ছিল হতাশার মর্মচ্ছবি; কিভাবে একটা পচা সমাজ, এমন কি বঞ্চিতদের মনেও একটা মিথ্যা আশা জাগিয়ে দিয়ে তাদের বিপথগামী করে। দ্বিতীয় ছবিতে কয়েকটি মানুষের বিদ্রোহ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। তৃতীয় ছবিতেই প্রথম ইলমাজ যেন সত্যকার রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তুলে ধরতে চাইলেন তৃতীয় বিশ্বের মর্মচ্ছবি। সেখানেও শ্রেণীশত্রুদের তিনি চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সেই শত্রু খুবই প্রত্যক্ষ শত্রু। শত্রু কে?—এই থীমটি 'দ্য হার্ড' ছবির মূল থীম নয়। সেটি প্রসঙ্গতঃ এবং অনিবার্যভাবে অবশ্য এসেছে সর্বশেষে।

পরবর্তী ধাপে ইলমাজ 'শত্রু কে?' থীমটি নিয়ে কাজ করেছেন।

এই ছবির পটভূমি আজকের তুরস্কের কোন এক নগরী (তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের নগরী হতেও বাধা নেই—পটভূমির মধ্যে সেই 'সর্বজনীনতা' ইলমাজ গুণে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন)। আমরা দেখি শতাধিক বেকার মানুষ—তরুণ এবং প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধ—কাজ পাওয়ার আশায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঠিকাদার তার ট্রাক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করল তার আজ দশজন মজুর দরকার। অমনি মানুষ-গুলোর মধ্যে যেন ক্ষুধার্ত বন্যজন্তুর রূপ ফুটে উঠল, এ ওকে ফেলে নিজে কোনোমতে ট্রাকে উঠে পড়তে চায়।—কেউ পারে, কেউ পারে না। ট্রাকটি দশজনকে নিয়ে চলে যায়। যারা পড়ে থাকে তাদের সর্বাঙ্গে হতাশা—তখন তারা আবার নিজেদের যেন খুঁজে পায়, একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়। কিছুক্ষণ পরে আবার একজন ঠিকাদার এল, তার বারোটি লোক লাগবে। সেই একই মর্মন্তুদ দৃশ্য। একজন প্রৌঢ়, যে একটু আগে ছবির নায়ককে জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল—ট্রাকে উঠতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, ছুটন্ত ট্রাক ধরে ছুটতে থাকে…তারপর পতন এবং মৃত্যু। অর্ধেকের বেশি মানুষের কাজ জুটল না।… রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে আছে…বড় বড় গাড়ী পেরিয়ে যাচ্ছে…প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মানুষ চলেছে…শুধু মাঝে মাঝে কেউ একটু দাঁড়িয়ে দেখছে সেই হতভাগ্যকে।

ছবির নায়ক, ইসমাইল কিন্তু জায়গাটি থেকে নড়ে না, সে গভীর ভয়ে এবং শোকে

মৃতদেহটি দেখতে থাকে। এই থীমটি অন্য চেহারায় গুণে আবার ছবিতে নিয়ে এসেছেন।

ইসমাইলের আর একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়। হঠাৎ একটি বাড়ীর দোতলার বারান্দায় একটি নগ্ন নারীমূর্তি বেরিয়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়; কিন্তু ততক্ষণে কয়েকটি পুরুষ এবং একজন মহিলা এসে তাকে বাধা দেয়। নারীটি আর্তচীৎকার করে জানায় সে বাঁচতে চায় না, এই লোকগুলি তাকে ভালোবাসার নাম করে নিয়ে এসে বেশ্যা বানিয়ে রোজগার করছে। মেয়েটিকে আর কিছু বলতে না দিয়ে টেনে হিঁচড়ে লোকগুলি ঘরে ঢুকিয়ে নেয়, এবং তাদের সঙ্গী অন্য মহিলাটি ইসমাইল সহ অন্য যারা পথ থেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছে তাদের রুচিবোধের নিন্দা করে গালিগালাজ দেয় —'একটা নগ্ন নারীদেহ দেখার জন্য সব লাইন দিয়ে মজা লুটছে'। ইসমাইল এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পায়, সে সরে আসে। তার কাছে ঘটনা বা দৃশ্যটির মধ্যে যৌন আবেদন ছিল না; সে ওই নারীর তীব্র আর্তনাদের মধ্যে আর্তমানবতার করুণ চেহারা দেখেছিল, যে আর্তনাদ তার মধ্যেও নিঃশব্দে ধ্বনিত হচ্ছে। গুণে এও জানান যে, মেয়েটি জার্মান। এর তাৎপর্য পরে উল্লেখিত হবে।

গুণে এরপর আমাদের নিয়ে যান তাঁর নায়কের অন্তর্লোকে। ইসমাইল একজন বিবাহিত ব্যক্তি, তার স্ত্রী সুন্দরী এবং জীবনের রস উপভোগে সতৃষ্ণ। প্রথম তিনটি ছবিতে গুণে আমাদের কাছে নারীর মহিমান্বিত রূপকে তুলে ধরেছেন। বারে বারে যদি তাই করতেন তাহলে তাঁকে ভাববাদী বলে আখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই ছবিতে গুণে বুঝিয়ে দিলেন নারী বলতেই ভক্তিগদগদ হবার কোন অর্থ হয় না। নারী যেখানে নিপীড়িতা ('দ্য হার্ড' ছবিতে) বা নারী যেখানে কল্যাণময়ী ('দ্য এলিজি') সেখানে নারী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া উচিত গুণে তাই নিয়েছেন। কিন্তু নারীমাত্রই অন্য ছবির নারীচরিত্রের মত হবে তা নয়। গুণে 'এনিমি' ছবিতে ইসমাইলের স্ত্রীর মধ্যে অন্য ধরনের নারীচরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু একটি মিলও আছে। এখানেও মেয়েটি বঞ্চিতদেরই একজন—কিন্তু এখানে তার ওপর সমাজব্যবস্থার বঞ্চনা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভোগ্যপণ্যলোভী খাদকসভ্যতা বা সমাজে অবস্থিত বঞ্চিত দরিদ্র এক নারী কিভাবে নিজের বঞ্চনা ও অভাব দূর করবার জন্য অন্যপথ নেয়—এ তারই রূপ।

বিষয়টি গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন। বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর সব মানুষই সংগ্রামের মধ্যে পীড়নের শেষ করতে চায় না; বরং তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এখনো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই করুণ ঘটনা যে, নিপীড়িতরা শোষণের এমন এক যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে আছে যেখানে তারা শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমবেত জেহাদ ঘোষণা করার চেয়ে বরং কোন ফাঁক দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে এই সমাজের শোষকদের কৃপালাভ করে নিজেকে শুধু বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচিয়ে শোষণেরই ছোট ছোট প্রসাদ পাবে তাই

ভাবে। সংগ্রামের প্রথমদিকে তাই দেখা যায়, প্রায়শঃই শোষিতরা শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের বদলে, নিজেরা বিচ্ছিন্নভাবে, সুবিধাবাদী পথে 'খুদে শোষক' হতে চলেছে। শোষকশ্রেণীর 'সুন্দর অবস্থা', 'বড়লোক হবার মজা'—এইসব কিছু শোষিতকে একটা ব্যবস্থার মধ্যে এমন মজিয়ে রাখে, কণ্ডিশনড করে রাখে যে, নিজের অজান্তেই শোষক হবার বা শোষকের মত 'সুখকর অবস্থা'য় পৌঁছবার আশা পোষণ করে। সঠিক-ভাবে নিজেকে সঠিক অবস্থানে রেখে, শোষিত হিসাবে নিপীড়নকারীদের থেকে মানসিকভাবে 'সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন' করে—objectify করা সম্ভব হয় না। তার মানে এটা নয় যে, একজন শোষিত জানে না যে, সে শোষিত নয়; অবশ্যই তা সে জানে। কিন্তু খাদক-সমাজের ছলাকলাময় প্রচার, বিজ্ঞাপনের ও ভ্রান্ত শিক্ষার জগতে যে শোষণের বাস্তবতা বিরাজমান তা শোষিতের মনোজগৎকে এমন ডুবিয়ে মজিয়ে রাখে যে, তার মনের মধ্যে সেও শোষকের গোপন মূর্তিকে অন্তঃস্থ করে বসে। এ যে দ্বৈততা, একদিকে সে জানে শোষিত অন্যদিকে তার ভিতরেও শোষক হবার সুপ্ত আশা—তৃতীয় বিশ্বের শোষিত জনগণের একাংশে, বিশেষতঃ মধ্য ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর মানুষের এটাই একটা বৈশিষ্ট্য এবং এর পূর্ণ সুযোগ নেয় শোষকশ্রেণী।

ব্রেজিলের সামরিক শাসকদের হাত থেকে পলাতক, তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ্ Paulo Freize তার 'Pedagogy of the Oppressed' বইতে লিখছেন যে, তিনি নিজে নিপীড়িতশ্রেণীর মানুষ হওয়ায় এবং বহু বৎসর নিপীড়িত-শ্রেণীর মানুষের শিক্ষার প্রশ্নে জড়িত থাকায় তাঁর একটা পরিষ্কার ধারণা হয়েছে যে, শোষকশ্রেণী হিংসা ও লোভের পরিবেশে সমাজকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখতে পেরেছে যেখানে নিপীড়িতরা সেই পরিবেশের প্রভাব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে না। শোষকশ্রেণীকে তারাও যেন অসচেতনভাবে আত্মস্থ (internalise) করে ফেলে, অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর ভোগের ইচ্ছা, লোভ ও সুযোগ পেলে নিজেকেও 'অন্য ধরনের' খুদে শোষকে পরিণত করারও সুপ্ত বাসনা ইত্যাদি মনের মধ্যে পোষণ করে। তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িতশ্রেণীর মধ্যে এর উদাহরণ অজস্র।

গুণে তাঁর 'এনিমি' ছবিতে তুলে ধরেছেন ইসমাইলের স্ত্রীর (বা নায়িকা) মধ্যে সেই লোভ ও ভোগ করার বাসনা, যাকে সমাজ কাজে লাগিয়ে তার বিরোধীদের চরিত্র নষ্ট করে; সেই লোভ একসময় নায়িকার চরিত্রে বাসা বাঁধে। তার রূপ আছে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্যের জন্যে রূপচর্চা করতে পারে না, উৎকৃষ্ট পোশাক-আসাক-সজ্জাদ্রব্য পায় না। তার ইচ্ছা হয় ঘর সাজাবার, তাও পারে না। তার দুর্মর ইচ্ছা একটি টেপ রেকর্ডার পাওয়ার, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তাও সে পায় না। মনে মনে সে ভাবে যদি কোন রকমে বড়লোকের বৌদের মত তার বাড়ী টেপ রেকর্ডার প্রচুর জামাকাপড় সজ্জা-

দ্রব্য কসমেটিক্স থাকত। নায়ক বেকার, অন্যদিকে স্ত্রী চাইছে বড়লোকের জীবনের স্বাদ; অর্থাৎ যন্ত্রণা ঝগড়া অশান্তি অবধারিত।

ইসমাইল অবশেষে একটা চাকরি পায়। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রাস্তার কুকুর মারার জন্য সে নিযুক্ত হয়। তার ঝুলিতে থাকে কুকুরের পক্ষে সুস্বাদু কিন্তু বিষ মেশান খাদ্য। তার কাজ পথে কুকুর দেখলে আদর করে খাবার দেওয়া, তারপর অপেক্ষা করা কুকুরটা কতক্ষণে ক্রমশঃ বিষক্রিয়ায় যন্ত্রণা পেয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! এইভাবে কয়েকটা কুকুর মারার পর তাদের লাশ নিয়ে ঠেলা গাড়ীতে করে শহরের বাইরে ফেলে আসা তার কাজ। এখানে গুণে কয়েকটি তীব্র শোকাবহ দৃশ্য রচনা করেছেন। ইসমাইল মনেপ্রাণে চায় না এই ঘাতকের কাজ। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে গেলে কুকুর তাকে মারতে হবেই। এক সময় মরণোন্মুখ কুকুরের কাছে সে বসে পড়ে গভীর হতাশায়, সে একটা জীবকে বিষ দিয়ে তিলে তিলে মারছে। তার দেওয়া বিষে মরা কুকুরের মৃতদেহ পথে পড়ে থাকে, পথচারীরা কেউ কেউ থমকে দেখে। তখন প্রথম সিকোয়েন্সের সেই বেকার প্রৌঢ় শ্রমিকের রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহটির কথা গুণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলিতে কুকুরের মরা ও মানুষের মরাতে প্রভেদ কত কম।

বড়রা যেভাবেই নিক, ছোট ছেলেরা কিন্তু এ রকম নির্মমভাবে কুকুর মরছে—এ দৃশ্য দেখতে পারে না। তাদের শিশু চোখে ইসমাইল হয়ে দাঁড়ায় একটা জঘন্য খুনী, ঘাতক। বালকের দল খেপে যায় তার ওপর, ঢিল ছোঁড়ে তাকে লক্ষ্য করে। অপমানিত, আহত ইসমাইল ঘরে ফেরে ও দুঃখে যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে। একদিন পাড়ার যেসব ছোট ছোট ছেলে তাকে ঘিরে গল্প করত—এখন তারা তাকে দেখে পালায়, তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। সে একটা ঘাতক। নিকৃষ্ট ঘাতক। খাদ্য পেয়ে যে কুকুরটা কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার দিকে তাকায়, তীব্র বিষের যন্ত্রণায় সেই কুকুরটাই অসহায় করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে, বুঝতে পারে না কেন সে মরছে, কে তাকে মারছে। তার শত্রু কে? নায়ক বুঝতে পারে সে নিজের মানবতাকে বিকৃত করে তুলছে, এই সমাজ তাকে de-humanise করে তুলছে। তাই বালক ও কিশোর, যাদের এই সমাজ এখনো পচিয়ে দিতে পারেনি, তারা তাকে ঘৃণা করে, শাস্তি দেয়।

চাকরিটা ইসমাইল ছেড়ে দেয়। নিজের সন্তানের কাছে সে 'মানুষ' থাকতে চায়। ঘনিয়ে ওঠে তীব্র অভাব। সুখলোভী সুন্দরী স্ত্রীর অভিযোগ ক্রমশঃ জমতে থাকে। ইসমাইল তার যেসব প্রতিবেশীর চালচলন খারাপ বলে দূরে দূরে থাকত, তাদের কাছে যায়, যদি তারা কোন রোজগারের পথ বলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে যায় মদের আড্ডায়। গল্প শোনায় একজন পচা ধনীলোকের দ্রুত ধনলাভের গল্প। কত অল্প সময়ে

সেই 'শেঠ' কিভাবে কোটিপতি হয়েছে। এখন তার বাড়ী, গাড়ী, কারখানা, অজস্র ঠিকাদারী এবং তৎসহ স্মাগলিং-এর কারবার, যেটা তার মূল কারবার। ছোট ছোট দৃশ্য, ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে গুণে বর্তমান তুরস্ক তথা তাবৎ তৃতীয় বিশ্বের সেই দালাল শ্রেণীর মানুষগুলির ছবি উপহার দেন, যাদের ইংরেজিতে বলে 'the middle man'. এরা বড়লোকের খিদ্‌মৎ করে, যত পাপ কাজ করে দেয়, দরকার মত ভোগ্যদ্রব্য তথা মেয়েমানুষ জুগিয়ে দেয়—প্রয়োজনে খুনখারাপিও করে। এরা নিপীড়িতশ্রেণীর মানুষ বলে নিজেদের ভাবেও না। মালিককে এরা নকল করে।

ইসমাইল এদের ঘৃণা করে—কিছুতেই এই জীবন সে গ্রহণ করে না। ঘরে অশান্তি। একদিন এইসব লোকদের একজন গুণের কাছে একটা 'ভাল কাজে'র প্রস্তাব দেয়। তাদের কোটিপতি মালিকের কাছে জার্মান থেকে আর একজন কোটিপতি ধনী অতিথি আসছে তুরস্কে বেড়াতে। তার সঙ্গে থাকতে হবে, তাকে তুরস্কের এই অঞ্চলের দর্শনীয় ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখাতে হবে, তার ও তার সঙ্গীদের দেখাশোনা করতে হবে—এজন্য একজন শিক্ষিত ব্যক্তি দরকার। ইসমাইল সেই কাজটা পেতে পারে। এতে নোংরামি নেই। ইসমাইল সেই কাজ গ্রহণ করে। খুবই কম দিনের কাজ, কিন্তু ভাল পয়সা পাবে, যদি জার্মান মহাশয় খুশি হন। কেননা তুর্কী-ধনীর উদ্দেশ্য জার্মান ধনীকে খুশি করে তার কাছ থেকে একটি বৃহৎ ঠিকাদারি আদায় করা। ইসমাইলের ইচ্ছা এতে করে সে যে পয়সা পাবে, তাতে তার স্ত্রীর অনেক দিনের একটি শখ মেটাবে—একটি টেপ রেকর্ডার কিনে দেবে।

সে কাজ শুরু করে। প্রতিদিনই ভাল পয়সা পায়। একদিন অসময়ে তাকে ডাকতে আসে মালিক স্বয়ং—বাইরে বিকট গাড়ীতে তিনি ও সেই জার্মান অতিথি বসে। সেদিন ইসমাইল বাড়ীতে ছিল না। তার সুন্দরী স্ত্রী বড় গাড়ী দেখার ও বড়লোক দেখার লোভ সামলাতে না পেরে যতটা সম্ভব সেজে বাইরে আসে। যুবতীটির ওপর চোখ পড়ে মালিকের। সেদিনই তার অপকর্মের সঙ্গী মিড্‌ল্‌ম্যানদের সঙ্গে সে পরামর্শ করে এই মেয়েটিকে জার্মান সাহেবের কাজে লাগান যায় কিনা। মিড্‌ল্‌ম্যানরা জানে কাজটা কঠিন, কেননা মেয়েটির স্বামী খুব সাচ্চা লোক। কিন্তু মেয়েটি? সেও খুব সতী, কিন্তু তার লোভ বড় বেশি! তারা মেয়েটিরই আত্মীয় একজন বর্ষীয়সী মহিলাকে লাগায় মেয়েটিকে একটি কাজ দেবার নাম করে সাহেবের কাজে লাগাতে। নায়িকা টোপ গেলে। স্বামীর উপার্জিত পয়সায় তো অন্নবস্ত্র জোটা ভার, শখ সাধ তো মিটবে না—নিজে রোজগার যদি করা যায় ক্ষতি কি? নানা সময় স্বামীর অনুপস্থিতিতে, আত্মীয় বাড়ী, বন্ধুদের বাড়ী যাবার নাম করে সে বাইরে যায়। রাত করে ফেরে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে সে আত্মীয়ের বাড়ী যাবেই; যাবে সেজেগুজে এবং ফিরবে দেরী করে।

একদিন সে ফিরল খুবই দেরী করে। সেদিন খুব সাজসজ্জা করেছে। এদিকে ঘরে কারোর খাওয়া হয়নি। ইসমাইল সেদিন খেপে উঠল। রাগে বৌকে ব্যভিচারিণী বলে উঠল, ঘর থেকে বার করে দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। কারণ সে ভদ্রলোক। পরে বৌকে আগেও যা বারবার বলেছে আবার তা বলল। এখানেই ছবির মূল থীম গুণে রেখেছেন। ইসমাইল বলল, তারা নিপীড়িতশ্রেণীর মানুষ, উচ্চবিত্তশ্রেণী তাদের শত্রু। কিন্তু শুধুমাত্র বড়লোকরাই শত্রু নয়, আরো শত্রু আছে আমাদের নিজেদের মধ্যে, এইসব মিডল্‌ম্যান। তাছাড়াও শত্রু আছে আমাদের ভিতরে, মনের ভিতরে। এইসব উপভোগ্য বস্তুসামগ্রীর প্রতি বড়লোকসুলভ লোভ, যে লোভ গোপনে আমাদের ক্ষয় করে দিচ্ছে, ক্রমশঃ আমরাও আমাদের শ্রেণীশত্রুর সাগরেদ হয়ে পড়ছি। তার স্ত্রী যে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী যায়, যে তাকে রঙীন জীবনের স্বপ্ন দেখায়—সেও শত্রু। ওই রঙীন জীবনের স্বপ্ন একটা আফিম, সেটাও একটা শত্রু। এর থেকে যদি সাবধান না হয়, তবে একদিন সেও সেই জার্মান মেয়েটির মত বেশ্যায় পরিণত হবে, যে জার্মান মেয়েটিকে সে একদিন নগ্নদেহে দোতলার বারান্দা থেকে আত্মহত্যায় উদ্যত হতে দেখেছিল! বৌকে তার ঘটনা সে বলেছিল। বৌটি সব শোনে এবং কাঁদতে থাকে। অবশেষে সে বলে সে আর ঘরের বাইরে যাবে না।

গুণে এই ছবিতে দুটি জার্মান চরিত্রকে এনেছেন। একটি নিপীড়িত চরিত্র, সেই আত্মহত্যায় উদ্যত রমণী ও অন্যটি শোষক চরিত্র, এই জার্মান ধনী। জার্মানরা একদা তুরস্ক অধিকার করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু গুণের কাছে সেজন্য জার্মান মাত্রই খারাপ নয়। সত্যকার শ্রমজীবী আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় গুণে বলেন, নীতি হিসেবে নয়, শ্রেণী হিসেবে মানুষের বিচার করা দরকার। এই ছবিতে প্রথমদিকে দেখি কয়েকজন তুরস্কের শোষকশ্রেণীর লোক একটি নিপীড়িতা জার্মান তরুণীকে বেশ্যায় রূপান্তরিত করেছে, এখানে এই তুর্কীরা বা স্বদেশবাসীরাই 'শত্রু'। অন্যত্র দেখি একজন জার্মান ধনী তুর্কী ধনীর শোষণের হাত শক্ত করতে এসেছে—এখানে জার্মান ধনীটিই 'শত্রু'। এখন বোঝা যায় সেই আত্মহত্যায় উদ্যত মেয়েটিকে জার্মান দেখিয়ে গুণে মানুষের জাতিগত বাস্তবতার ওপর শ্রেণীগত বাস্তবতার সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

যাই হোক, পরের দিন ইসমাইল তার কাজে যায়। সেদিন জার্মান লোকগুলিকে আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান দেখানোর আয়োজন হয়েছে। ইসমাইল তাদের সঙ্গে ঘোরে। এবং জানতে পারে জার্মানরা কালই অন্য দূরের শহরে চলে যাচ্ছে। ইসমাইলের চাকরি শেষ। ইতিমধ্যে অন্য একটি খবর সে শুনল—যে মিডলম্যানদের একজন তাকে এই কাজটি দিয়েছিল, যার স্ত্রী তার স্ত্রীর আত্মীয়—তারাও জার্মান সাহেবদের সঙ্গে অন্য শহর দেখার জন্য ও জার্মানদের দেখাশোনা করার জন্য যাচ্ছে আজকের বাসে। তার

এটা ভাল লাগল না, কোথায় যেন কি একটা অশুভ ইঙ্গিত পেল !···তার কাজ শেষ হয়ে গেল। পুরো টাকা দিয়ে তাকে বিদায় দিল তুর্কী ঠিকাদারটি। ইসমাইল ছুটি পেয়ে প্রথমে ছুটল একটি বড় দোকানে। সেখানে সে কিনল একটি টেপ রেকর্ডার, তার বৌয়ের অনেক দিনের শখ সে মেটাবে। কাল রাতে তাকে অনেক গালিগালাজ করেছে!

বাড়ীর পথে যেতে যেতে সে দেখল একটি লাক্সারি বাস ছাড়ছে, তাতে চেপে আছে তার স্ত্রীর আত্মীয় মহিলা ও তাদের পরিবারের লোক। জার্মান সাহেবের সঙ্গী হবে তারা। গুণে আমাদের নিয়ে গেলেন বাসের মধ্যে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম বাসের মধ্যে ইসমাইলের স্ত্রীও রয়েছে। তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে ইসমাইল পথ থেকে তাকে দেখতে না পায়। তার স্ত্রীর সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডার।

ইসমাইল বাড়ীতে এল, এসে শুনল তার স্ত্রী বাপের বাড়ী যাবার নাম করে গৃহ-ত্যাগী হয়েছে। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। স্ত্রী তার সন্তানকেও ফেলে গেছে। উদ্দেশ্য হয়ত বেশ কিছু টাকা উপার্জন করে ফিরে আসবে। ইসমাইল এবার বুঝতে পারল সেই বাসেই তার স্ত্রীও ছিল। সে এরকম যে একেবারে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু সে ছোটাছুটি করল না। সে তার সন্তানকে নিয়ে ভাবতে লাগল। তার মনে কোন ক্ষোভ নেই, শুধু স্ত্রীর জন্য তার বেদনা বাজছে বুকে। মেয়েটাও 'শত্রু'র দলে নাম লেখাল! উপভোগ্য বস্তু-সামগ্রীর লোভে, ভাল জামা কাপড় সাজসজ্জা রেডিও ও টেপ রেকর্ডার বাড়ী টাকা— এসবের লোভে নিপীড়িতশ্রেণীর আর একটা মানুষ বিকিয়ে গেল। ইসমাইল প্রতিজ্ঞায় স্থির করল, নিজের সন্তানকে আর এভাবে বিকিয়ে দিতে দেবে না। তাকে শেখাবে শত্রু কারা, শত্রু কোন্ কোন্ লোভের চোরা পথে আমাদের অন্তরটা দুর্বল করে দেয়, বিভ্রান্ত করে। শোষণ যেখানে স্পষ্ট অত্যাচারের চেহারা নিয়ে আসে তখন তাকে চেনা যায়, তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ হয়। কিন্তু শোষণ যখন আফিম হয়ে আসে ও আমাদের নেশাগ্রস্ত করে চরিত্র নষ্ট করে দেয়, তখন তার সঙ্গে লড়াই অনেক বেশি কঠিন। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে নিপীড়িতশ্রেণীর, বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ যে দুর্বলতা ও লোভের ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে বাস করছে, সেই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে গুণে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর 'এনিমি' ছবির মধ্যে। আমরা এ ছবি দেখার পরে, কম বা বেশি, নিজেরা নিজেদের অপরাধী মনে করি—কেন না আমরাই কি দোষমুক্ত ?

এ ছবির নারীচরিত্র গুণের প্রথম তিনটি ছবির, বিশেষত 'এলিজি' ও 'দ্য হার্ড' ছবির নারী-চরিত্রের মত নয়। তাহলে গুণে কি নারীর প্রতি সেই সশ্রদ্ধ মনোভাব পরিত্যাগ করেছেন ? অবশ্যই তা নয়। ইলমাজ গুণে ভাববাদী চলচ্চিত্রকার নন। তিনি বস্তুবাদী, বাস্তবতাবাদী। শুধু একটি অভাবী মেয়ের, দুর্মর লোভের কাছে আত্মবিক্রয়ের

ছবি তুলে এঁকেছেন বলেই সমগ্র নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন, একথা বলা মূর্খামি। বরং তুলে এটাই দেখিয়েছেন যে, গরীব তৃতীয় বিশ্বের মধ্যশ্রেণীর নারীরা উচ্চবিত্ত সমাজের লোভের হাতে বেশি vulnerable অর্থাৎ সুখ ভোগের লোভে নিজের শ্রেণী-চরিত্র হারানোর সম্ভাবনা খুব বেশি। এরও কারণ এই যে, সমাজে নারীরা এতকাল ধরে বঞ্চিত ; পুরুষের মত বৃহত্তর জগতের অভিজ্ঞতা তাদের থাকে না, চিন্তার প্রসার, ভাল মন্দ বোধ তাদের তত জাগ্রত হয় না ; ফলে উপভোগ্য বস্তুসামগ্রী বাড়ী গাড়ী সাজপোশাকের লোভ গৃহবন্দী অসহায় তাদের বড় বেশী লুব্ধ করে। বৃহত্তর সমাজের শক্তিগুলির সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের শ্রেণী সচেতনতার মান পুরুষদের তুলনায় দীন হওয়ায়, দুর্মর লোভ তাদের আগে আক্রমণ করে—এটা ঘটনা। অবশ্য এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি, স্বামীর চেয়ে স্ত্রীরাই বাড়ী গাড়ীর লোভে বেশি কাতর। অর্থভিত্তিক সামাজিকতার মিথ্যা গর্ববোধ গৃহবন্দী, শিক্ষার সুযোগ-না-পাওয়া, বৃহত্তর জগতের অভিজ্ঞতায় দীন মধ্যশ্রেণীর মহিলাদের বেশি আক্রমণ করে তাদের সহজ শিকারে পরিণত করে। এদেশেও এটা ব্যতিক্রম নয়। এর জন্য নারী মোটেই দায়ী নয় ; দায়ী তাদের গৃহবন্দী করুণ অবস্থা, দায়ী এই সমাজব্যবস্থা ; দায়ী বরং সেই পুরুষ যে তার স্ত্রীকে বৃহত্তর সমাজ সচেতনতায় (যা মূলতঃ রাজনৈতিক সচেতনতা) শিক্ষিত করতে পারে না। 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দিরের প্রতি সর্বজয়ার অবিচার, যেমন সর্বজয়া যে সমাজব্যবস্থা ও অশিক্ষার শিকার —তার ফল, এখানেও 'এনিমি' ছবির নায়িকা যা করে, তাও তাব চারিদিকের অবস্থারই পরিণাম। এবং কিছুটা নায়কেরও ব্যর্থতা। ছবির শেষে যে জন্য নায়ক বেদনাহত হয়, এবং প্রতিজ্ঞা করে সন্তানের ক্ষেত্রে এ জিনিষ সে ঘটতে দেবে না। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য, এর জন্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও যথেষ্ট দায়ী, যে ব্যবস্থার ফলে ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয় "লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।" অর্থাৎ গাড়ী ঘোড়া চাপার জন্যেই যেন লেখাপড়া শেখার দরকার। শিশুকাল থেকে বড়লোক হওয়ার লোভ, এবং সেজন্যই লেখাপড়া—এটাই শেখান হয়। শিক্ষার মূল ভূমিকাকে ছোট করে শুধু তাকে অর্থ উপার্জনের উপায়মাত্র করে তুলে প্রথম সর্বনাশ ঘটান হয়। এবং এটাই হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আজ থেকে প্রায় দুশ' বছর আগে, ধনতন্ত্রীযুগের প্রথম দিকেই মহাকবি গ্যেটে এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে, "এখন থেকে আমি 'কি' তার পরিচয় বহন করবে আমার কি কি আছে তাই দিয়ে ; কত টাকা, কটা বাড়ী, গাড়ী, পোশাক, আমার 'খেতাব' এসব দিয়ে। বড় হওয়া নয়, বড়লোক হওয়া—Being নয়, Having হবে এই ভয়ঙ্কর যুগের মন্ত্র।"

ধনবাদী যুগের এই সর্বনাশা মন্ত্র আমাদের শত্রুরা নিপীড়িত শ্রেণীর ওপর প্রয়োগ করে চলেছে আজও। গুণে চমৎকারভাবে, খুব সহজ ভঙ্গীতে সেই কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রসঙ্গত আগেই বলা হয়েছে, এর মূল আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে; প্রথম সর্বনাশটা ঘটান হচ্ছে সেখানেই। ভারতবর্ষে একমাত্র পশ্চিম বাংলায় বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার সেই ভ্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু সংস্কার করেছেন এবং সেই জন্যেই শত্রুদের সবচেয়ে বেশি আক্রমণ এই বামফ্রণ্ট পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের ওপর গুণের 'এনিমি' একথাও আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

আরো দুটি কথা গুণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—(১) নারীমুক্তি ও নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া সমাজের মুক্তি নেই। মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন : 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ।' মাও-এর এই শ্লোগান যে কতবড় সত্য 'এনিমি' ছবি দেখে তা মনে পড়ে। নায়ক ছিল রাজনৈতিক সচেতনতায় দৃপ্ত, কিন্তু তার অর্ধাঙ্গিণীর সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল দীন—এই অন্তর্বিরোধের চোরাপথে নায়কের সংসার নষ্ট করে দিল শ্রেণীশত্রুরা। (২) দ্বিতীয় কথাটা হল, আমাদের মূল্যবোধ আমাদের চিন্তা-বোধের জগতে, আমাদের বাসনা কামনার জগতে ধনবাদী সমাজের ভাবধারা, লোভ কামনা বাসনার শিকড় বহুদিন ধরে প্রোথিত হয়ে আছে, যাকে বলা হয়েছে 'শোষকের ভাবমূর্তিকে অন্তরান্বিত—internalise করা'—একে দূর করা শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক বিপ্লবেই সম্ভব নয়। মাও-সে-তুঙ যাকে বলেছেন 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব', তার আত্যন্তিক প্রয়োজন। তা না হলে পোল্যাণ্ডে যা ঘটছে তার পুনরাবৃত্তি এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিতেও হতে পারে। সেই দিক থেকে গুণের 'এনিমি' ছবির নায়িকা শুধু আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিরাজমান একটি অশুভ প্রতিক্রিয়ারই প্রতীক নয়, বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই এর প্রতিরূপ পাওয়া যাবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাই এত প্রয়োজনীয়। তার মানেই এই নয় যে, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব—যা ব্যর্থ হয়েছিল নানা কারণে—তার মতই হতে হবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া কোন আর্থ-সামাজিক বিপ্লব দীর্ঘকালের জন্য সফল হতে পারে না। ইলমাজ তার 'এনিমি' ছবির নায়িকার যে চিত্রকল্প রচনা করেছেন—যে 'ইমেজ'—তা বিশ্বের কাছে এক ভয়ঙ্কর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে! রাজনৈতিক ছবি হিসেবে গুণের 'এনিমি' ছবি তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

সদ্‌গতি

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

দূরদর্শনের টাকায় সত্যজিৎ রায় সদ্‌গতি ছবি তৈরি করেছিলেন। প্রেমচন্দের গল্প নিয়ে পঞ্চাশ মিনিটের রঙিন ছবি।

ছবিটি তোলার পর অনেকদিন গেলেও দূরদর্শন ছবিটি দেখায় নি। কী কারণ হতে পারে? সন্দেহ প্রকাশ করা হতে লাগল, ভারত সরকার ভয় পেয়েছেন, ছবিটি দেখান হবে না। ছবিটি তোলার সময়েই শোনা গিয়েছিল, উত্তর ভারতের কয়েকটি গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন ছবির বিরুদ্ধে, কেননা, ছবিটিতে দেখান হচ্ছে, বর্ণহিন্দুরা কীভাবে চামারদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলত। 'তুলত', কেননা সেই আপত্তিকারীরা জানালেন, প্রেমচন্দের কাহিনী একসময়ে সত্যি হলেও এখন আর নয়, অতএব ছবিটি তোলার প্রয়োজন নেই, অযথা বর্ণহিন্দু তপশীলী জাতিদের মধ্যে অপ্রীতি খুঁচিয়ে তোলার নতুন কোন কারণ ঘটে নি।

সত্যজিতের ছবিটি চেপে দেওয়া হচ্ছে, এই আশঙ্কার কারণটি কী? দূরদর্শনের কর্তৃপক্ষ জেনেশুনেই প্রেমচন্দের কাহিনীটি পছন্দ করেছিলেন। তাহলে তাঁরা জানতেনই গল্পের কাহিনীটি কী? অতএব, ছবি চেপে দেওয়া হচ্ছে বলে যাঁরা সন্দেহ করছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন প্রেমচন্দের কাহিনী পড়া এক, আর চাক্ষুষ দেখা অন্য। সত্যজিতের হাতে পড়ে নিশ্চয় প্রেমচন্দের লেখা গল্প চামারদের বা অত্যাচারিতের মনে আগুন ধরিয়ে দেবে। সুতরাং ছবিটি চেপে দেওয়া যাক। সাহিত্য থেকে ফিল্ম শক্তিমান্, এই জাতীয় একটা ধারণা চালু আছে কোনো কোনো মহলে। সেই ধারণাটিও নিশ্চয় ছিল চেপে দেওয়া হচ্ছে সন্দেহের পিছনে।

পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন যে তিনি জানেন, সত্যজিতের সদ্‌গতি চেপে দেওয়া হচ্ছে, তখন দূরদর্শনের কর্তাব্যক্তি একগাল হেসে জানিয়েছিলেন, সেরকম কোনো অভিপ্রায় তাঁদের নেই। দেরি হচ্ছে, তার কারণ, দূরদর্শনের সবকটি কেন্দ্র থেকে এক দিনে ছবিটি দেখানোর বন্দোবস্ত তাঁরা করছেন। তাঁরা একথাও বলতে পারতেন, সদ্‌গতি যখন একবারই দেখানো হবে, রোজ রোজ নয়, তখন অত হুড়োহুড়ি করার কী আছে। তাঁরা জানালেন, আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর করেই তাঁরা ছবিটি দেখাবেন। তাই দেরি হচ্ছে। তবে আর দেরি নেই।

আর দেরি হয় নি। সমস্ত কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো সদ্‌গতি। তার আগে, দেখানো হলো সত্যজিতের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা খুব খুশি হলেন, রাজ্যের চাপে পড়ে কেন্দ্র জব্দ হলো।

দূরদর্শনে দেখানোর আগেই অবশ্য. এখানে ওখানে, সদ্‌গতি দেখান হয়েছিল। তবে, তাঁরা তো মুষ্টিমেয় ফিল্মবোদ্ধা, তাঁদের দিয়ে তো বিপ্লব হবে না, দরকার লক্ষ লক্ষ টেলিভিশন দর্শকদের দেখানো, যাতে বিপ্লব ত্বরান্বিত হতে পারে। গরীব চামারদের, হরিজনদের অবশ্য টেলিভিশন নেই, তপশীলী জাতি উপজাতিরা টেলিভিশন দেখে না, তবুও যাঁরা উত্তেজিত হয়েছিলেন সদ্‌গতি চেপে দেওয়া হচ্ছে ভেবে, তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন, বিপ্লবের একটি ধাপ পেরনো গেল।

কলকাতা শহরের খবরের কাগজে প্রকাশ, যেদিন সদ্‌গতি দেখান হলো দূরদর্শনে, সেদিন বিকেলে এবং সন্ধ্যায় রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, সবাই টেলিভিশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। উত্তর ভারতের এক চামারের দুঃখে কলকাতার লোকেরা সেদিন নাকি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

যাঁরা বড়ো পর্দায় রঙিন ছবিটি দেখেছিলেন তাঁরা কিন্তু টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য আফ্‌শোষ করলেন, টিভিতে ছবিটি তেমন জমল না, রঙ্‌ মার খেয়ে গেল, ডিটেলস হারিয়ে গেল। ছবিটি তোলা হয়েছিল টিভির পর্দার জন্য, এবং তখন যখন ভারতীয় দুরদর্শনের রঙিন ছবি দেখানোর কোন পরিকল্পনা ছিল না। কয়েকজন লোক টিটকিরি দিলেন, সত্যজিৎ নতুন মিডিয়াটি আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভক্তরা জানালেন, রঙিন ছবির দরকার ছিল, বিদেশে তো রঙিন টিভি, সেখানে তো রঙেই দেখানোর দরকার। দূরদর্শনেরও টাকার দরকার, হয় তো সেজন্যেই তাঁরা রঙে রাজি হয়েছিলেন। অবশ্য বিদেশের টিভির জন্য ছবিটির স্বত্ব কার, খোঁজখবরে প্রয়োজন।

সদ্‌গতি দেখানো হলে, হালের যা রীতি, সত্যজিতের পক্ষে বিপক্ষে দুদলের লড়াই শুরু হোলো। একদল লোক খ্যাতিমান্‌ পরিচালকের শক্তিমত্তার নতুন প্রকাশ দেখে যেমন মুগ্ধতর, আর এক দল লোক খ্যাতিমানের খ্যাতি খসিয়ে দিতে তেমনই বদ্ধপরিকর। হিন্দিবিশারদেরা জানালেন, সংলাপের হিন্দি হাস্যকর, গ্রামবিশারদেরা জানালেন, গ্রামের চেহারা আদৌ ফোটে নি, বাচ্চা মেয়েটি নিশ্চয় কোনো ইংলিশ-মিডিয়ম স্কুল থেকে ধার করে আনা। বিপ্লব-বিশারদেরা জানালেন, গ্রামের হরিজনেরা বামুনের বদমাইশি সহ্য করে নিল, এই চেহারা দেখানো অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা। ইতিহাসবিশারদেরা জানালেন, হরিজনরা কখনোই চুপ করে বামুনের বামনাইগিরি আর সহ্য করে না, অতএব আজকের এই সংগ্রামশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে সত্যজিৎ গ্রামবাসীর সংগ্রামকে ব্যঙ্গ করছেন। মনস্তত্ত্ববিশারদেরা জানালেন, চামারটির লাশ সারারাত বৃষ্টিতে পচল, গ্রামের লোক নির্বিবাদে বাড়িতে শুয়ে থাকল লাশ সরাবে না এই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আর ভোরবেলা বামুন সেটা বিনা প্রতিরোধে পাচার করে দিল, এরকম একটা অবান্তর ব্যাপার কী করে যে পরিচালকদের মাথায় আসে!

অন্যদিকে ভক্তরা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন কখন লো অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা ধরে দুখীকে, কখন বামুনের পা ঢোকে ফ্রেমের বাঁ দিক থেকে, কখন দুখীর তামাক চাওয়ার পর কাট করে ক্যামেরা চলে যায় ঘাসিরামের খাওয়ার দৃশ্যে, কখন "চামারপল্লিতে গোঁড় আসে, ঘর থেকে ঝুরিয়া বেরিয়ে আসে—তারপর আসে ঘাসি। সাউণ্ডট্রাকে তখন মেঘগর্জন। মিডশট থেকে ক্লোজে ঝুরিয়া, গোরুর গলার ঘণ্টার শব্দ—শব্দ বাড়তে থাকে। ঘাসির কথা শোনা যায়। মিডশটে ঝুরিয়া, পিছনে গরুর পাল, ঘণ্টা, পায়ের শব্দ, ঝুরিয়া পড়ে যায় জলকাদার মধ্যে। গোরুর পাল পিছন থেকে তাকে পেরিয়ে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝুরিয়া। অসামান্য সিনেমাটিক এই সিকোয়েন্স তীব্র ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করে", কখন ক্যামেরা স্থির হয়ে থাকে প্রায় সাত সেকেণ্ড কাঁধে বিঁধে থাকা কুড়ুলের উপর।

সত্যজিৎ রায়ের দুঃখ এদেশের লোকেরা চলচ্চিত্র বোঝে না, তাঁর উপযুক্ত সমালোচনা করতে পারে সাহেবরা। মনে পড়ে, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথেরও এমন একটা অবস্থা হয়েছিল, তাঁর শিল্পের কদর এদেশে না হলো তো না হলো, সাগরপারের লোকেরা প্রশংসা তো করছে। আরো মনে পড়ে স্তুতি-নিন্দা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্য, পুরোটাই তুলে দেওয়ার লোভ সামলানো যাচ্ছে না :

"কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

যত লিখছি কাব্য

ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।

ইহার উপরে আর কথা চলে না। বাঙ্গালাদেশে কবির ভাগ্যে নোংরা সমালোচন একেবারেই ফলে নাই, এমন কথা আমি বলিতে না পারি। কিন্তু ইহাও স্থির যে, এত অ-নোংরা. শুচি সমালোচন এদেশের কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। এত স্তুতি, এত স্তব, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা. এত অল্প সমালোচনা, এত স্তাবকের হনুকরণ, স্তুতি ও সমালোচকের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন্ কবি লাভ করিয়াছেন ? তবু ভরিল না চিত্ত ? বাঙ্গালী যে 'রাজা ও রানী'র মত ক্রমাগত বলিতেছে, একান্ত তোমারই আমি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশের ভালোবাসার অত্যন্ত অবিশ্বাসী।"

সদ্‌গতির চুলচেরা বিশ্লেষণ হবেই। গবেষক দেখেছেন, গোরুর পালের অর্থ ছবির প্রথমে একরকম, পরে অন্যরকম ; এই ছবির বৃষ্টির তাৎপর্য পথের পাঁচালীর বৃষ্টি, অপুর সংসারের বৃষ্টি অথবা মহানগরের বৃষ্টির তাৎপর্য থেকে ভিন্ন, হরিহর থেকে গঙ্গাচরণ থেকে ঘাসিরামে উত্তরণের মধ্যে দেখা যায় সত্যজিতের পুরোহিত সংক্রান্ত মানসিকতার সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিন্যাস ; অরণ্যের দিনরাত্রি-তে শোষিত আদি-

বাসীর বিকৃত রূপ করেছিলেন সত্যজিৎ, হীরকরাজার দেশে-তে শ্রমিক-কৃষক পেয়েছিল ইতিবাচক ভূমিকা, সদ্‌গতির গোঁড় চরিত্রে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী চরিত্র ফুটে উঠল, প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে। গবেষকের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায় যখন তিনি লক্ষ্য করেন ছবিটির গড়ন এবং তার ব্যঞ্জনা। ঘাসিরাম এবং দুখীদের জীবন তাঁর প্রথমে মনে হয় সমান্তরাল পরে মনে হয় মুখোমুখি। দুখীর হাত থেকে ছুটে যাওয়া কুড়ুল পড়ে বামুনের পায়ে। সেটা গবেষকের মনে হয়, প্রতীকী তাৎপর্যের বাহন : দুখীর জমাট ক্ষোভ, শক্ত কাঠের মতো গ্রামীণ সংস্কারকে বিদ্ধ করতে পারছে না বলেই, কুড়ুলের রূপ নিয়ে ছিটকে পড়ে বামুনের দিকে। এটা সচেতন প্রতিবাদ না, ক্ষোভের প্রকাশ। দুখী প্রতিবাদী চরিত্র না, কাঠকে সে বিদ্ধ করেছে নিজেকে চূড়ান্ত ভেবে মেরে, কিন্তু এটা আত্মহনন নয়, নিজেকে শেষ করেছে, তবে কাঠকেও সে হার মানিয়েছে, লক্ষ্যভেদ করা কুড়ুলের উপর ক্যামেরার স্থির থাকা মানে প্রতিবাদের মর্ম গাঁথা ইত্যাদি।

সদ্‌গতি দেখে কারো কারো মনে হয়েছে, এটা কিছু হয় নি। কেউ কেউ গদগদ হয়েছেন, এবং আতিশয্যে অনেক কিছু, মধ্যে মধ্যে পরস্পর বিরোধী হলেও, আবিষ্কার করেছেন। এই দুয়ের মাঝেও একটি পথ আছে। ছবিটিতে ত্রুটিবিচ্যুতি আছেই, সমালোচকেরা যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, সেসব ছবিতে আছেই। তা সত্ত্বেও ছবিটি বরবাদ হয়ে যায় না। আবার যেসব অসাধারণ ব্যঞ্জনা ভক্তরা খুঁজে পাচ্ছেন সেসব না থাকলেও ছবিটির গুরুত্ব আদৌ কমে না।

ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অচ্ছুত হলেও ঘটনাপ্রবাহের চালিকা শক্তি অস্পৃশ্যতা বা অশুচিতাবোধ নয়। গল্পটি মনে করা যাক। একটি চামার সবে রোগ থেকে উঠেছে; তার মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য তার বাড়িতে পুরোহিতের আসা দরকার। পুরোহিত আনতে হলে কিছু উপঢৌকন দরকার। রুগ্ন শরীরেও চামারটি ঘাস কাটছে। পাছে যেতে দেরি হয় তাই অভুক্ত অবস্থায় সে চলেছে পুরোহিতের বাড়িতে, কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলে। তার স্ত্রী চিন্তিত, রোগা মানুষটা না খেয়ে চলল। পুরোহিতের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, পুরোহিতের মনেই নেই সে কথা দিয়েছিল চামারের বাড়িতে যাবে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরুল না, খেয়েদেয়ে সে বেরুবে। এতক্ষণ বসে বসে চামারটি কী করবে, তাই তাকে বলা হোল নানারকম ফাইফরমাস খাটতে এবং শেষে কাঠ কাটতে। বামুনকে খুশি রাখা দরকার তার নিজেরই গরজে, অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে চামারটি কাঠ কাটতে গেল। কাঠ কাটার অভ্যাস নেই, পুরনো শক্ত গুঁড়ি, অভুক্ত শরীর, সবে রোগ থেকে উঠেছে, কাঠ কাটতে না পারলে বামুন যাবে না, সর্বশক্তি দিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে চামারটি মারা গেল।

গল্পের এই প্রথম ভাগ। আমরা যারা প্রেমচন্দের গল্পটি পড়ি নি, কলকাতার মানুষ,

গ্রাম চামার পুরুত ইত্যাদির সঙ্গে যাদের পরিচয় সাহিত্য ইতিহাসে পড়ে বা ফিল্ম দেখে, তাদের কাছে সদ্গতি ছবিটির শুরু হয় আর পাঁচটি ছবির মতোই। সম্প্রতি ফিল্ম জগতে ফ্যাসন হয়েছে, গ্রামের দুঃখদুর্দশা নিয়ে ছবি করা, সদ্গতিও সেইভাবে শুরু। সদ্গতি নাম দিয়ে ছবির শুরু, সুতরাং মনে একটা চিন্তা খচ্খচ্ করতেই থাকে, কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। তবে সেটা কী জাতীয়, আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

এখানে বলে রাখা উচিত, এই আলোচনা মূলতঃ সত্যজিতের ইংরেজি স্ক্রিপ্ট অবলম্বনে লেখা। টেলিভিশনের ছোটো পর্দায়, সাদায়-কালোয়, সত্যজিতের অনেক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়েছে, অনেক কিছুই ফোটে নি, সকাল দুপুর রাত্রির আবহ রঙে যেভাবে হয়ত ফুটেছিল অনুমান করা যায়, তা কিছুই বোঝা যায় নি। সুতরাং, সত্যজিৎ কী দেখিয়েছেন তার আলোচনা না করে বলা ভালো কী দেখাতে চেয়েছিলেন তার আলোচনা এটা।

চামারের কাহিনী, অতএব ঘরের চালে ছাগলের চামড়া শুকোচ্ছে, বাচ্চা ছাগলের সঙ্গে খেলছে। চামারের বউ চামারকে সকালবেলায় ঘাস কাটতে দেখে অবাক হচ্ছে, ঘাস যে পুরুতের জন্য ঘুষস্বরূপ সেটা চামারকে বলতে হচ্ছে। পুরুত আসবে, অতএব বউকে পাতার আসন তৈরি করতে হবে পুরুতের বসার জন্য, কেননা চামারের খাটে সে বসবে না, বর্ণহিন্দুদের কেউ চামারকে খাট ধারও দেবে না। অস্পৃশ্যতার ব্যাপারটি সত্যজিৎ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। এগুলো অবশ্য প্রায় অঙ্কের সূত্র ধরে করা, ছবিটির বৈশিষ্ট্য এখনও ফোটে নি। সেই অঙ্কের নিয়মেই, চামার এবং তার বউ জিনিস-পত্র কেনার সূত্রে কিছু কথাবার্তা বলে, উদ্দেশ্য কিছু মজা পরিবেশন করা, আবহাওয়াটা তরল করে রাখা ভবিষ্যতের শোচনীয়তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে যাতে, হয়ত দুঃস্থ চামারদের জীবনেও হাসিঠাট্টা আছে সেটাও বলে রাখা।

চামারটি তাড়াহুড়ো করে বামুনের বাড়ি যখন পৌঁছল, বামুন তখন ধীরে সুস্থে অঙ্গ-সজ্জা করছে, পূজোর প্রস্তুতিতে। চামারের আগমনের কারণ জানতে পেরে বামুন তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এটাই ছবিটির কেন্দ্রবিন্দু। চামারের সংস্কার, তার মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য বামুনকে দরকার, বামুনও বাগে পেয়ে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। বামুনকে দোষ দেওয়া যায় না, চামারকে দেখে সে অবাক হয়, চামারের কথা শুনেও বোঝা যায় না, বামুন কথা দিয়েছিল, সে আজই যাবে। যদি কথা দিয়েও থাকে, চামারের বাড়িতে প্রস্তুতির ঘটা দেখে মনে হয় কথা আগে তারা পেয়েছিল, তবু চামারটি হয়ত প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিতে ভরসা পায় নি। কিন্তু যে করেই হোক বামুনকে আনতে হবেই এই ধর্মসংস্কারই চামারের কাল হলো। ঘর ঝাঁট দেওয়া, খড় এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া এবং কাহিল শরীরে কাঠ কাটতে কাটতে তার হাঁফ

ধরা—এই পর্যন্ত গল্পটি ধীরে এগিয়েছে। চামার কাজ করছে, বামুন আত্মার কথা বলছে গাঁয়ের লোকদের, ভোঁতা কুড়ুলে শান দিচ্ছে চামার, বামুন মধ্যাহ্ন ভোজনে, দম নেওয়ার জন্য চামার ছিলিম টানছে, বামুন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায়, চামারের গায়ে ঘাম, বিরাট গুঁড়িতে কুড়ুল পিছলে পিছলে যাচ্ছে, চামারের যত আক্রোশ এসে পড়ছে কাঠের উপর, কুড়ুল ছুঁড়ে ফেলছে, কুড়ুল এসে পড়ে এক পদচারী বামুনের পায়ে, চামার আঁতকে ওঠে, রাগে ক্ষোভে হতাশায় তার চোখে জল এসে যায়, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, বামুনের বকুনি খেয়ে উঠে পড়ে মরিয়া হয়ে কাঠ কোপাতে কোপাতে মরে পড়ে যায়। এই অংশটিতে, কুড়ুলের ঘন ঘন কোপে গল্পের গতি তীব্র হয়ে ওঠে, শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়ে দর্শককে বিমূঢ় করে দেয়।

গল্পের এখানেই শেষ। পরবর্তী অংশে আর তাৎপর্যময় কিছু ঘটে না, যদিও সদ্‌গতি নামকরণ বোঝানোর জন্য গল্পটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া দরকার। চামারবস্তির লোকেরা লাশ সরাবে না, বামুনেরা লাশ পড়ে থাকায় আপত্তি জানায়, সারা রাত বৃষ্টি পড়ে, চামারের বউ একা একা লাশ আগলায়, কিন্তু তারপর ভোর রাতে কী কারণে লাশ ফেলে সে চলে যায়, পুরুত সেই সুযোগে লাশ টেনে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসে, গঙ্গা-জল ছিটিয়ে লাশ পড়ে থাকা জায়গাটি পবিত্র করে তোলে।

আমরা যারা এই গল্পের সঙ্গে যুক্ত নই, চামার নই, বামুনও নই, ছাবটি দেখে অস্বস্তিতে পড়ি, কেননা বাগে পেলে কাজ করিয়ে নিতে ছাড়ি না, আমাদের এই অভ্যাসটির গায়ে আঁচড় পড়ে। কাঠের গুঁড়ির গায়ে চামারটি কুড়ুল মেরে মেরে হয়রান হয়, তখনই মনে হয়, যুগ যুগ ধরে ধর্মের সংস্কার জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের উপর চেপে আছে। তার চাপেই আমরা মারা যাচ্ছি, কুড়ুল তাতে বসে না, বসার কথাও নয়, হঠাৎ রাগে সেই সংস্কার দূর করা যায় না। এই দুটো সাদা কথা সাদাভাবেই তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে আর সেই সরল সত্যের জন্যই ছবিটি স্মরণীয়।

✓ঋত্বিক ঘটক : যুক্তিতে, তর্কে এবং গল্পেও

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋত্বিককুমার ঘটকের কাজের আলোচনা করতে গেলে মনে পড়ে বালজাক প্রসঙ্গে লুকাচের বিশ্লেষণ : বালজাকীয় চরিত্রাবলী তাদের অতিনাটক, রোমান্টিক অতিরঞ্জন, অবাস্তববাদী অদ্ভুতত্ব নিয়েই ফল্গুস্রোতের মত যে সমাজবাস্তব বহে যায়, তাকে প্রকাশ

করে, সামাজিক শক্তিসমূহের অবস্থানকে দেখায়। অবশ্যই বালজাক ও ঋত্বিককুমার তুল্য-মূল্য নন, তবু। আবার তাঁর ছবির যে অভিঘাত দর্শকদের ওপর তীব্র হয়ে পড়ে, তা ঠিক ভেবেচিন্তে যুক্তির কাঠামোয় সৃষ্টি করা নয়। মনে পড়ে মার্ল-পন্টির ভাবনা : শিল্প একটি প্রাথমিক—প্রাকৃতিক, অব্যবহিত ও স্বজ্ঞাত উপায়ে জীবনকে বোঝবার ক্রিয়া। আমাদের মৌল অভিজ্ঞতাগুলির সাড়া হিসাবে শরীর-কল্পনার সংগঠন করে শিল্প একটি বাহ্যিক ইশারা। আমাদের ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্কেতগুলিই আমরা ব্যাখ্যা করি ফিল্ম দেখবার প্রক্রিয়ায়। প্রথমাবধিই ঋত্বিক ঘটক ব্যক্তির সঙ্কটকেই সামনে নিয়ে আসেন—একটি বিশেষ ব্যক্তির মূর্ত প্রতিমায় তিনি ধরেন চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবকে, তাই সমূহের বিপ্লবী "জেস্‌চার" তাঁর ফিল্মে থাকে না। আসে ব্যক্তির দর্পণে ভয়ংকর ভাঙনের ছবি। এই ব্যক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীই চূড়ান্ত রূপ নেয় তাঁর শেষ কাজ "যুক্তি তক্কো আর গপ্পো"য়।

এই কাজটির তাৎপর্য এইখানে যে, ছবিটি একদিক থেকে তাঁর পূর্ববর্তী কাজগুলির বিপরীতধর্মী। যুক্তি ও তর্ক, তাঁর ছবির মূল উপাদান কখনই ছিল না। প্রাথমিক তীব্র অভিঘাতে এ ছবিগুলি আমাদের বিচলিত করেছে তাদের আবেগের প্রত্যক্ষ সংক্ষোভে। Christian Metz-রা ফিল্মকে ন্যারেশণ হিসাবেই দেখেন।[১] ঋত্বিকের ছবিতে তাঁরা যে সিনট্যাগমেটিক সংগঠনের [অর্থাৎ কার পরে কি এল] কথা বলেন তা দুর্বলই। জীবনের প্রাথমিক আবেগে ঋত্বিক গল্পনির্ভর ন্যারেশণকে হেলায় তুচ্ছ করেন প্রথমাবধিই, অথচ আবার এটাও তিনি জানেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ ভাঙনে গল্প সংযোগের একটি মূল্যবান মাধ্যম, খানিকটা ব্রেখটের নাটকের মতই নানা এপিসোড তিনি ফিল্মে অন্বিত করেন।[২] অর্থাৎ গল্প ঋত্বিক ব্যবহার করেন নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী। এ দিক থেকে যুক্তি তক্কো তাঁর আগেকার কাজের ঐতিহ্য বহন করে : Story element being incidental. আবার Metz যাকে প্যারাডিগম্যাটিক সংগঠন বলেন, তা ঋত্বিকের ফিল্মে যথেষ্ট বর্তমান : এ সংগঠন ন্যারেটিভের ওপর নির্ভরশীলও নয় : অনুপুঙ্খের নির্বাচনে, বিশেষ অর্থপ্রয়োগে এই সংগঠন তাৎপর্য পায়, কখন, কার পর আসছে বড় কথা নয়। ঋত্বিকের ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার এই ধরনের সংগঠন, বা তাঁর ছবিতে পাহাড়ের অনুষঙ্গ (যেমন মেঘে ঢাকা তারার শেষে), কোমলগান্ধারে রেললাইনের সেই দ্রুত অকস্মাৎ শেষ হয়ে যাওয়া।

যাকে সেমিওটিক আলোচকরা কোড বলেন, ঋত্বিকের ছবিতে তার ব্যবহার প্রচুর : আর মেঘে ঢাকা তারা থেকে যুক্তি তক্কো অবধি একই বিষয়ের বিস্তারে, পুনরাবৃত্তিতে এই কোডগুলি আমাদের চেনা হয়ে যায়। শুধু বহির্আবরণে কেমন চরিত্রর পরিবর্তন দেখান, তা বোঝা যায় মেঘে ঢাকা তারায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর নিরঞ্জন রায়ের ফ্ল্যাটে দেখা করতে যাওয়ায়—দরজাটা ফাঁক হয় ; তারপর পা থেকে, ডোরাকাটা পাজামা ধরে আমাদের দৃষ্টি ওপরে ওঠে। পোশাকের কোডে চরিত্রটির সুবিধাবাদী বাস্তবতা ধরা পড়ে। যেমন যুক্তি তক্কোয় নাম-কোড ব্যবহার করেন, নীলকণ্ঠ, দুর্গা, বঙ্গবালা. নচিকেতা। যুক্তি তক্কোয়, কোড ব্যবহার আরও আছে। তবে আগের ছবিগুলি সম্পর্কে ঋত্বিক কখনই যুক্তি তর্কের কথা বলেন নি : As the film suggests, this is a film of arguments... I won't call it didactic, but it suspiciously veers round that genre. Those of us who are interested in Visual Cinema will find this one frightfully boring. This film is conversational and I have tried to disallow romanticism as the only point in the art of creator. It is attack against me and also against others who are also a part of this life . ...I try to steer clear of all beautification (in the so called usage of the term......) This is a statement by a profoundly frustrated person...I want to convey my personal, individual reaction about things in or around me. I am trying to convey that. For a mass media, this is a very dismal picture.

আগেও অবশ্য ঋত্বিক বলেছেন, ফিল্ম মূলতঃ ব্যক্তিগত স্টেটমেণ্ট। শেষ বিচারে সব শিল্পই তাই। কিন্তু যুক্তি তক্কো গভীরভাবে এক ব্যর্থ ব্যক্তির স্টেটমেণ্ট। এর সঙ্গে যুক্তি-তর্ক সমন্বিত এই ছবি প্রায় ডিডাকটিক, নীতিশিক্ষামূলক। এই আলাপমূলক ছবিটি থেকে তিনি রোমাণ্টিকতাকে বাদ দিতে চেয়েছেন, প্রচলিত অর্থে সৌন্দর্যসৃষ্টি থেকে দূরে থেকেছেন। এ ছবি তাঁর নিজের বিরুদ্ধে, তাঁর জীবনের যারা অংশ তাদের বিরুদ্ধেও। নিজের ও চারিদিকের জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই ঋত্বিক জানাতে চান। এর ফলে ভিস্যুয়াল সিনেমায় যাদের উৎসাহ, তাদের কাছে যুক্তি তক্কো ভয়ঙ্করভাবে একঘেয়ে হবে আবার এই ব্যক্তিগত ছবি ফিল্মের ম্যাসমিডিয়ার পক্ষে অন্ধকারময় বিষণ্ণ চিত্রই বহন করে। বস্তুতঃপক্ষে এই বিবৃতিটিই প্রচ্ছন্নভাবে ফিল্মতত্ত্বের একটি ঘোষণা : আগে যে বিজড়িত হওয়া সমাজের অংশীদার হওয়া, সংগ্রামের অংশীদার হওয়ার কথা বলতেন, এখানে ঠিক সেভাবে আর বলছেন না। ব্যর্থ হতাশ ব্যক্তির এক প্রতিক্রিয়া তাঁর মূল বিষয় : অবশ্যই এই ব্যক্তি ভীষণভাবে আত্মসচেতন, সে অর্থে আধুনিক। আসলে

ঋত্বিকের নন্দনদৃষ্টি, জীবনদৃষ্টিতেই একটা দ্বন্দ্ব বরাবর আছে : শিল্প যে ব্যক্তিগত স্টেটমেণ্ট এটাও যেমন তাঁর কাছে সত্য, তেমনি এই স্টেটমেণ্টটি সংগ্রামে-সংযোগে-মানুষকে সচেতন করার কাজে নিয়োগ করতে হবে, এ বিশ্বাসও তাঁর আন্তরিক। এই দ্বিতীয় বিশ্বাসই তাঁকে করে তুলত রোমান্টিক, কারণ যে কোন বিদ্রোহ-প্রতিবাদের অন্তর্গত থাকে এই রোমান্টিক য়ুটোপিয়া, এই রোমান্টিকতা মার্কসের দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষায় গৃহীত। যুক্তি তক্কোতে যে আত্মহননের আলাপ তিনি করলেন, সেখানে এই য়ুটোপিয়া নেই যা ছিল মেঘে ঢাকা তারা / কোমলগান্ধার / সুবর্ণরেখার শেষে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলার এক শুদ্ধ যন্ত্রণায় সব শেষ হয়ে যায় : দৃষ্টিনন্দনও হতে দেন না ছবিটিকে, মাঝে মাঝে মনে হয় কাঁচা, বারবার আটকে গেছে স্রোতটি। কিন্তু সেটি ইচ্ছাকৃত—কেবল তর্ক জমে কেবল কথা বলা।

অথচ এ ছবিকে ঋত্বিকের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ছবির ধারা থেকে, বিচ্ছিন্ন বলা যায় না। ঋত্বিক ব্যক্তির দর্পণেই শ্রেণীকে প্রতিবিম্বিত করেন : শ্রেণী সম্পর্কে কোন যান্ত্রিক অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণার দ্বারা তিনি চালিত হন না। হন না বলেই বারবার তাঁর ফিল্মে অ্যালিগরি নির্ভর চিন্তাপদ্ধতি দেখি। শ্রেণীচেতনাও অনেকটাই এই চিন্তাজাত, কারণ এতে টাইপ ও সমাজ-দলের বিন্যাসেই ব্যক্তিকে দেখা যায়। যুক্তি তক্কোতে মূল চরিত্র নীলকণ্ঠ আউটসাইডার, তার জীবনের প্রক্রিয়ায় সে সংসার ও সমাজ সীমান্তের মানুষ : এই বাইরের মানুষ বলেই তার ঘুরে ঘুরে একটা অভিজ্ঞতার সিমফনী গঠন করা বাস্তবসম্মত মনে হয়, নচেৎ তাতো অবাস্তব। কিন্তু শেষে সে ফেরে আবার স্ত্রী-পুত্রের কাছে, অবশ্য তার ফেরাটা চূড়ান্ত হয় সেই অরণ্যচ্ছায়ায়, যেখানে এই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে এমন কিছু যুবকের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ; সেটাই তো ঈপ্সিত সংসার, ঐ সংগ্রামে, এই পচা সমাজ-সংসারকে চরম প্রত্যাখ্যানে। বাইরের মানুষটি সংসারে ঘর ফেরে, এভাবে : প্রায়বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সিনেমার পর্দা জুড়ে তার সর্বযন্ত্রণাহর বোতলটি ঢেলে দিয়ে। এ এক যাত্রা : বিচ্ছিন্নতা থেকে সংযোগে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমবেত হওয়ায়। এ পটভূমিতে নচিকেতা ও বঙ্গবালার পারস্পরিক আকর্ষণ বৃক্ষের মূলে অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবনের প্রাথমিক আবেগ উদ্ধৃত, বৃক্ষের মতই শিকড়-ডালপালা সমেত ধরা দেয়। এ যাত্রাটাই যুক্তিতে তর্কে, বিচ্ছিন্ন গল্পে ফিল্ম হয় : যাত্রার দীর্ঘ কিন্তু আপাতবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি সামাজিক শক্তিগুলিকে, সভ্যতার টানাপোড়েনকে দেখায়। জোতদারের গুলিতে পণ্ডিতের মারা যাওয়া, কিংবা ছৌমুখোশের ঘরে সংস্কৃত-প্রাকৃতর প্রায় হানাহানি—এক একটি স্তর। কারুর কারুর কাছে মনে হয়েছে, নীলকণ্ঠর কোন সমাজ আশ্রয় নেই, তিনি নিজ চৈতন্য নির্ভর—কিন্তু এই স্বসমুখ ব্যক্তির ধারণা ঋত্বিকের কোনদিনই ছিল না। আসলে

ঋত্বিক দেখান কোথায় গেলে আত্মসচেতনতার, চৈতন্যের যে বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা, তা দূর হবে : যে আপসহীন জীবনবোধে তিনি তাঁর ছন্নছাড়া জীবনেও ভাস্বর ছিলেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই যেন ঋত্বিক দেখিয়ে গেলেন তাঁর এই টেস্টামেন্ট-এ।

গোড়া থেকেই ছবিটিতে একটি অ্যালিগোরিক্যাল ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে : চরিত্রের নামগুলিই তার প্রমাণ। আর একটি "পার্সোনা"র ক্ষেত্রে চরিত্রের এই ব্যাখ্যা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে : যুক্তি তক্কো তাই নীলকণ্ঠর প্রেক্ষবিন্দু, ব্যাখ্যাই ব্যবহার করা হয়েছে। এরজন্যই অস্তিত্বের অন্তর্সত্য থেকে ইতিহাসের বহির্জগতে যাবার নির্মম পথটির ধাক্কা ছবিটিতে বার বার খেতে হয়। আপাতমসৃণতা উবে যায় এই ধাক্কায়, দৃষ্টিনন্দন থাকে না কিছুই। আর ঋত্বিক যে অ্যালিগরির দ্বারস্থ হন, তার কারণ, গভীরতর : চতুষ্পার্শের শিকড়হীন অন্ধকারকেই তিনি আক্রমণ করেন অ্যালিগরিতে। হ্বাল্টারের বেঞ্জামিনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বলতে পারি, বস্তু নিজে যখন তার অর্থ আর প্রক্ষেপণ করতে পারে না, তখন অ্যালিগরিস্ট-এর ঈপ্সিত অর্থই সে নেয়। অ্যালিগরিস্ট তার অর্থে বস্তুকে অর্থবান করে। তার হাতে বস্তু রূপান্তরিত হয়। লুকনো অর্থের জগতের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। এই শক্তিতেই ঋত্বিক তাঁর বাস্তবকে পরিবর্তিত করেন, অর্থবান করেন : নিজের জীবনকেই বুঝি অর্থময় করেন শিল্পের অ্যালিগরিতে—মৃত বস্তুকে জীবনদান করেন অ্যালিগরির প্রণোদনায়। আধুনিকের চিন্তায় অ্যালিগরিকে বিসর্জন দিয়ে প্রতীকীবাদকে আনা হয় : যুক্তি তক্কো প্রতীক থাকে না, প্রতিমা থাকে না, থাকে বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন বিচিত্রমুখী মুহূর্তগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা আনার অ্যালিগরির প্রেরণা। আজকের ভারতীয় বাস্তবে, প্রতীকের গীতিময়, তাৎক্ষণিক, সময়ের মুহূর্ত নির্ভরতা অবান্তর। প্রকাশের প্রতীকী স্বাধীনতা এখানে কোথায়? আত্মজীবনীমূলক যুক্তি তক্কো অ্যালিগরি আরও প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে, অ্যালিগরিতে সাধারণভাবে মানবজীবন কেবল প্রকাশ পায় তাই নয়, ব্যক্তির জীবনীমূলক ঐতিহাসিকতা আসে সব থেকে প্রাকৃতিক আবার অর্গ্যানিকভাবে, বিকৃত ভাবে। যন্ত্রণা ও ক্ষয়ের পটভূমিতেই অ্যালিগরি অর্থময় হয়ে ওঠে। মেঘে ঢাকা তারা ও সুবর্ণরেখায় ব্যবহৃত অ্যালিগরি, যুক্তি তক্কো আর উপাদান থাকে না; সামগ্রিক ভাবেই হয়ে ওঠে। যুক্তি তক্কোর সমগ্র কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে অ্যালিগরির দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর : থেমে থাকা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলি গতি পায়, ধারাবাহিকতা পায় শিব-দুর্গা-নচিকেতার অনুষঙ্গে, অন্তস্তরে বঙ্গবালার দুর্গা হয়ে ওঠার মুহূর্তে।[৩]

---

৩ এখানে কিন্তু স্মরণীয় ঋত্বিক সচেতনভাবে মৌল প্রতীক চান, অ্যালিগরি বা রূপক নয়। তাঁর 'চলচ্চিত্র-চিন্তা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। কিন্তু ফিল্মের বাস্তব প্রয়োগে, অন্ততঃ যুক্তি তক্কো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অ্যালিগরিক্যাল।

এই অ্যালিগরির মধ্যেই ঋত্বিকের মহামাতার ধারণা তাৎপর্য পায়। ঋত্বিক তাঁর এই মহীয়সী মাতার ধারণা পান ইয়েটস-এর কাছ থেকে। প্রবন্ধ লিখে ঋত্বিক ঘটক এই মহীয়সী মাতার প্রত্নপ্রতিমার যে ব্যাখ্যা করেন, তাতে মনে হয়, সমগ্র ব্যাপারটা তাঁর কাছে স্বায়ু ও অবচেতনের অনুচ্চার প্রচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন। মহীয়সী মাতার মৌল প্রতীকটিকে তিনি দুভাবে দেখেছেন : বরাভয় ও ভয়ঙ্করী। কিন্তু বাস্তব কাজে ঋত্বিক মহীয়সী মাতাকে স্বায়ু দৃষ্টিতে দেখেন না : যুক্তি তক্কে বরাভয়, ভয়ঙ্করী রূপের সঙ্গেই আসে পুনর্জন্মের চেতনাটি। পুরাণ ও পুরাণপ্রতিমা আধুনিক জগতে সর্বত্রই লভ্য : প্রচ্ছন্নভাবে, মূলরূপ হারিয়ে, ধর্মীয় খোলস খুলে তারা আছে আমাদের চারপাশে। সময় সম্পর্কে আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতেই তার পুরাণমনস্ক ব্যবহার পাওয়া যায়। মহীয়সী মাতার প্রত্নপ্রতিমার অন্বেষণে, পুরাণের অনুষঙ্গে নিজের ও যুগের যন্ত্রণাকে বাঁধবার প্রচেষ্টায় ঋত্বিক আধুনিক : ব্যাখ্যা করার সময় যতই সামূহিক অবচেতনা বা চেতনার কথা বলুন, কার্যত, ছবিতে, খুবই আত্মসচেতন ও ইতিহাস সচেতনভাবেই তিনি এদের ব্যবহার করেন। মির্চা ইলিয়াদের ভাষায়, পুরাণ অনটোজেনেটিকের সঙ্গে ফিলোজেনেটিককে যুক্ত করে।[৪] সমাজে যখন সংগ্রামের সব আলো প্রায় নির্বাপিত : (যুক্তি তক্কের নীলকণ্ঠের চোখে বর্তমান যেমন ভাবে ধরা দেয়) তখনই পৃথিবী-মাতা, মহীয়সী মাতার পুরাণ আসে—ফিরে যেতে চায় তারই কাছে। পৃথিবীমাতার মৃত্যুর দেবী হওয়া, বরাভয় থেকে ভয়ঙ্করী হওয়া কিন্তু কোন বিরোধ নয়, এখানে মৃত্যুর দেবীও সৃষ্টির অফুরাণ-উৎস। ঋত্বিকের ছবিতে তাই সেই মায়েদের মৃত্যু শেষ নয়, নতুন জন্মের সঙ্গে যুক্ত। একটি জীবনের উৎসর্গ থেকেই জীবন তার জন্ম নতুন করে নেয়। ঋত্বিক এই মহীয়সী মাতার পুরাণের সঙ্গে ভারতীয় উমা-পার্বতী, নীলকণ্ঠ-দুর্গার পুরাণকে মেলান। আবার এর সঙ্গে মিলিয়ে দেন দেশকে, লোকজীবনের মাতৃমূর্তিকে। পুনর্জন্ম আসে তাঁর এই প্রক্রিয়াতেই—বঙ্গবালা মাতৃমূর্তিতে অভিষিক্ত হয় চৌনাচের মুখোসের মধ্য দিয়ে। এই রিক্তা, সর্বস্বান্ত মেয়েটিই পেয়ে যায় তার নতুন পার্সোনা, এটা ঠিক বাস্তব নয়, ঋত্বিকেরই, নীলকণ্ঠেরই কল্পনায় এই পুনর্জন্ম আসে। আর কল্পনার বাস্তব বলেই ঋত্বিকের গলায় গানও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে : কেন চেয়ে আছ গো মা। ঐ পুনর্জন্মের মাতৃদেবী, শক্তিমাতার দিকে তাকিয়েই ভৎর্সনা করে যেন সে : ঐ শক্তির আধার যারা তাদের প্রতিই এই ভৎর্সনা, তার আগে আমরা যুবক নীলকণ্ঠ ও দুর্গার

৪ ইলিয়াদ চমৎকার বলেন : Every Primordial image is the bearer of a message of direct relevance to the condition of humanity, for the image unveils aspects of ultimate reality that are otherwise inaccessible.

প্রেমের আবেগ ও আবেশে দেশকে একাত্ম হয়ে যেতে দেখেছি : অঙ্গে অঙ্গে বাঁশী বাজাবার ধ্বনিতে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অ্যালিগরি-মিথ ইত্যাদিতে ঋত্বিক কি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে এড়াতে চান নি? যান্ত্রিক মার্কসবাদে মনে হতেই পারে যুক্তি তক্কে তিনি পলাতক, অবক্ষয়ী চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু মার্কসের সৃজনশীল আকাশে এ ধরনের যান্ত্রিক সমীকরণ বাতিল। শিল্পের জটিল প্রক্রিয়ায় জীবন আসে নানা স্তরে, নানা ভাবে। আজকের ভয়ঙ্কর চরিত্রহীন পরিবেশে একটি মানুষের, মদন তাঁতীর মত আপসহীনতা দেখানো তো প্রগতির চূড়ান্ত : আপসহীন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে জীবনের শুদ্ধতার জয়ই ঘোষণা করে। আর তার মৃত্যু হচ্ছে কখন ও কোথায়—বিশুদ্ধ আপসহীন বিশ্বাসের এক সংগ্রামের পর্বে, যেখানে মানুষটি মরে গেলেও বিশ্বাসের অগ্নিগর্ভ বন্দুকটি চলতে থাকে—এই যুবকটির আত্মদান তো আমাদের ভ্রান্ত সাম্যবাদী আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নীলকণ্ঠর মৃত্যুও কি তাই নয়—কিংবা ধরুন, সেই বিখ্যাত সাহিত্যিকের কথা যিনি বাণিজ্যিক সাহিত্যপত্রে আর এক মৃত্যু বরণ করেন, কিন্তু সচেতনভাবে জানান, এই মৃত্যুবরণের দায়িত্ব কি তাঁর একার? কেন তাঁকে এ পরিণতি মেনে নিতে হয়? তাছাড়া, যুক্তি তক্কে শ্রেণী অবস্থান তো চমৎকার আসে দুটি মৃত্যুতে। জোতদারের হাতে নিহত হয় পণ্ডিতমশায়, আর পুলিশের গুলিতে নীলকণ্ঠ : শোষণের অত্যাচারের দুটি স্তম্ভকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন তিনি। সকালবেলার আলোয় নীলকণ্ঠ সত্যের মুখ দেখতে চেয়েছিল : এ শুধু পুত্রের মুখ দেখা নয়, এ সত্যকে দেখা। ঐ গুলিবিদ্ধ হওয়াই তো সত্যকে দেখা : সব জ্বলছে, তার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে। ঈপ্সিত জগতে, স্বর্গে প্রবেশের আগে আগুনের শুদ্ধিকরণ চাই : সত্যের মুখ দেখার সময় এই অগ্নির জ্বালাই নীলকণ্ঠর সর্বাঙ্গে : মহীয়সী মাতার পুনর্জন্মে কি তাঁর কোমলগান্ধার দেশ কি স্বর্গ ফিরে পাবে। নীলকণ্ঠর আগুনের বৃত্ত সমগ্র দেশকে ঘিরে : এই জ্বালাই নির্মাণ করতে পারে মুক্তির মহামিলনের পটভূমি।

মৃণাল সেনের 'কিউবিক' ছবি

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির নাম 'তসবির আপনি আপনি'। পরিচালক মৃণাল সেন। সবেমাত্র প্রথম প্রিন্টটি কলকাতায় এসেছে। ২০ আগষ্টের দুপুরবেলা ছবিটি দেখান হল কলকাতার তথ্য-

কেন্দ্রে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'তিনজন' থেকে এই রঙীন হিন্দি ছবিটি বিশেষভাবে দূরদর্শনের জন্যেই মৃণাল তৈরী করেছেন। 'তসবির' মৃণালের প্রথম টিভি-ফিল্ম। প্রথমে গল্পটা নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক। 'তিনজন' একেবারে আক্ষরিক অর্থে ছোটগল্প। দেখেছি গল্প যত ছোট হয়, তাতে ডিটেলের কাজ যত কম থাকে, চরিত্র আর সংলাপের ব্যবহারে যত ছিমছাম হয় কাহিনী, মৃণাল সেন তত সহজ, অনাড়ষ্ট বোধ করেন সেই কাহিনী থেকে ছবি করতে। আসলে তাঁর প্রয়োজন, গল্পের কাঠামোটুকু। কিংবা তাও নয়, কাহিনীর কেন্দ্রীয় ভাবনার আভাস বা কোনও ঘটনা বা সংলাপ থেকে বিচ্ছুরিত এক ঝলক ইঙ্গিত—এইটুকু থেকেই তিনি শুষে নিতে পারেন চলচ্চিত্রের উপাদান।

সুনীলের 'তিনজন' এমনই একটি গল্প।

সুনীলের লেখা, বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্প কিংবা মাঝারি-ক্যানভাসের উপন্যাস, আধুনিক চলচ্চিত্রের খুব কাছাকাছি। মেজাজে, চরিত্রায়নে, সংলাপের শৈলী ও বিন্যাসে এবং নাটকীয়তার সযত্ন বর্জনে সুনীলের গল্প প্রায় মাতৃজঠরের মতই ধারণ করে আধুনিক চলচ্চিত্রের ভ্রূণ—এতটাই বলতে আমার লোভ হচ্ছে। ঐ 'আধুনিক' বিশেষণটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুনীলের অধিকাংশ ছোটগল্প এমনভাবে হয়ে ওঠে যেখানে ও হেনরি, মোপাসাঁ বা মম-এর ধরনে কোন ধাক্কা, চমক বা অপ্রত্যাশিত পরিণতির বিস্ময় নেই। যেন আমাদের আটপৌরে জীবনের যে কোনও সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি তৃতীয় মাত্রা। সুনীল তাঁর গল্পে সেইটুকুর আভাস দিয়ে যান মাত্র। 'আধুনিক' চলচ্চিত্রও ঠিক তাই করে। সুনীল যেমন তাঁর গল্পে গল্প বলেন না, অন্তত সনাতনী ভঙ্গিতে, ঠিক তেমনি আধুনিক চলচ্চিত্রও মুড়ো-পেটি-লেজা নিয়ে অ্যারিস্টটলের আজ্ঞানুসারে কাহিনী বিস্তারে নিয়োজিত হয় না। সেই গুরুভার থাকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ওপর। আধুনিক চলচ্চিত্র, সুনীলের গল্পের মতই, একটি অতি মামুলি ঘটনা, অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা, কিংবা ছাপোষা জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের ভঙ্গি থেকেই জন্ম নিতে পারে। সুনীলের ছোটগল্পে ঘটনার সীমিত পরিধিকে যেমন ছাপিয়ে ওঠে অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা, তেমনি আধুনিক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যেও থাকে এক ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি বা তারল্য, যা ছুঁচের মুখে গেঁথে তোলা অসম্ভব। এই কারণেই, আধুনিক চলচ্চিত্রের এমন অব্যর্থ শিকারউদ্যান হতে পারে সুনীলের গল্প। বিশেষ করে টি-ভি ফিল্মের। বিশেষভাবে সুনীলের প্রেমের গল্প। মজা লাগে ভাবতে মনীষার দুই প্রেমিক, বা আগামীকাল-এর মত মুকুরচিকন গল্প নিয়ে কি ইণ্টারেষ্টিং টিভি ফিল্মই না হতে পারে।

'তিনজন' অবিশ্যি প্রেমের গল্প নয়। কিন্তু প্রেম একেবারে নেই, তাও নয়। তবে

আপাতভাবে এ-গল্প প্রেম, যৌনতা ও রাজনীতি বর্জিত। কিন্তু একান্তই আপতিক এই বর্জন। সমস্ত গল্পটিকেই আমি বলব voyeurism বা নপুংসকতার এক তির্যক, ব্যঞ্জনাময় বিশ্লেষণ। প্রেমের ব্যর্থতায় যে ভয়েরিজম-এর জন্ম, তারই চূড়ান্ত, সর্বগ্রাসী রূপ আমরা দেখতে পাই নায়কের মানসিক অনিশ্চয়তা, প্যারানয়িয়ার মধ্যে। গল্পের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করছে রোম্যান্টিক অহঙ্কার, পলায়নী প্রবণতা, বিষাদ, আতঙ্ক, হতাশা, আত্মধিক্কার এবং অবচেতন মনের ব্যর্থ আস্ফালন। এক যুবককে ঘিরে এই গল্প। কিংবা বলা যায়, এই গল্প গড়ে উঠেছে অফিস-বস-এর ঘরে এই যুবকের তিনবার যাওয়া-আসা নিয়ে। দু-বার মনে মনে যাওয়া। আর একবার সে সত্যিই যাচ্ছে। তিনবারই সে যাচ্ছে শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। এই তিনবার যাওয়া-আসা যেন প্রিজম-এর তিনটি তল, যেখান থেকে ছিটকে পড়ে একই ঘটনার বর্ণময় ব্যঞ্জনা। মৃণাল সেন প্রায় বাজপাখির মতই ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছেন তাঁর 'তসবির আপনি আপনি'র বীজ এই ব্যঞ্জনা থেকেই। বাস্তব এবং অবাস্তব, কল্পনা এবং ঘটমান বর্তমান এমনভাবে ছবির মধ্যে বিভিন্ন পরতে মিশিয়ে দিয়েছেন মৃণাল সেন যাতে ছবির জমি বা টেক্সচারে আসে অনন্যতা, অথচ কোনও রকম গিমিকের ধাক্কায় ছবিটির স্বতঃস্ফূর্তি যেন না নষ্ট হয়। রিয়েলিটি এবং আনরিয়েলিটির এই দ্বন্দ্বকে আরও শরীরী করে তুলতে মৃণাল তাঁর ছবিতে নিয়ে এসেছেন এক লেখককে যিনি মূল গল্পে অনুপস্থিত। চমৎকার এই উদ্ভাবনা। এর ফলে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বই শুধু গড়ে ওঠে নি, স্যাটায়ার বা শ্লেষের একটি তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয়েছে ছবিটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যে। এই শ্লেষের সূত্র ধরেই ক্রমশ তৈরী হয় 'তসবির আপনি আপনি'র অন্তিম অ্যাম্বিগুইটি বা দ্ব্যর্থবোধ। বাস্তব-অবাস্তব, রিয়েল-আনরিয়েলের টেনশন মৃণালের ছবিতে গড়ে ওঠে নি কোনও ইয়েটসীয় অর্থে। তাঁর ছবির নায়ক বাস্তব পৃথিবী থেকে পালিয়ে শিল্পের নির্বেদের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে না। বরং তাঁর ছবির লেখক (যিনি শিল্পের প্রতিনিধি) বাস্তব সমস্যা, প্রাত্যহিক জীবনের চ্যালেঞ্জের কাছে শেষ পর্যন্ত নিজেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। যে মুহূর্তে শিল্পী নিজেকে প্রায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী, ঘটনা-প্রবাহের স্রষ্টা ঈশ্বরের মত মনে করেন, সেই মুহূর্তেই কিন্তু মৃণাল তার পায়ের তলা থেকে কার্পেট টেনে নেন। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, লেখকই এ-ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রের অল্টার-ইগো বা বিরোধী সত্তা। আমি কিন্তু সেভাবে দেখতে চাইছি না। মনে হয় না মৃণালের ছবি অত মোটা দাগের ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সাড়া দেবে।

ছবির একটা পর্যায়ে লেখক যুবকটির জীবন যেন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। ছেলেটির অনিশ্চয়তা, অসহায়তা, দুর্বলতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে লেখক তাকে প্রায় পুতুলের মত ব্যবহার করতে চাইছে। ধীরে ধীরে তার ঘাড়ে

'রিয়েলিটির' নাম করে চাপিয়ে দিচ্ছে নিজের মনের মত ঘটনাবলী—যা ঘটেনি, কিন্তু লেখকের মতে যা ঘটা উচিত। সুতরাং 'তসবির আপনি আপনি'র টেক্সচার-এ তিনটি তল গড়ে উঠেছে—এক : সত্যি সত্যিই বাস্তবে যা ঘটেছে, দুই : কেন্দ্রীয় চরিত্রটি যেভাবে বাস্তবকে নিজের মত করে সৃষ্টি করে নিতে চাইছে, তিন : লেখক যেভাবে তার কল্পিত একটি আদর্শ 'ভূমিকাকে' কেন্দ্রীয় চরিত্রটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, তাও আবার সোজাসুজি গড়ে উঠছে না। বলা যায়, এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলে জন্ম নিচ্ছে শ্লেষাশ্রয়ী এক দ্যোতনা, যা ছবিটির যে কোনও চরম ব্যাখ্যাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। কিভাবে মৃণাল তাঁর সমস্ত ছবিটির মধ্যে বুনে দিয়েছেন শ্লেষের ব্যঞ্জনা, তা একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে, কারণ এই বুননের মধ্যেই রয়েছে ছবিটির 'টেক্সচারাল' অনন্যতা। ছবির নায়ক ব্যর্থ প্রেমিক। তার বন্ধু বাজি ফেলে জিতে নেয় তার প্রেমিকাকে। ছেলেটি তার এই ব্যর্থ ভালবাসার কাহিনী চাপে পড়ে শোনাতে বাধ্য হয় লেখককে। কিন্তু ছেলেটি কাহিনীর শেষটুকু বলে না। আমরা দেখি ছেলেটির বন্ধু মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমায় যায়। তারপর পর্দা জুড়ে মেয়েটির বধুবেশী একটি স্টিল ছবি। তারপর রাতের অন্ধকার বুলেটের মত আলোয় আর প্রলয়ের মত শব্দে দীর্ণ করে উড়ে যায় প্লেন। পরক্ষণে চলে আসি লেখকের বুকফাটা হাসিতে (প্লেনের শব্দ হাসির মধ্যে ডিসলভ্ করে যায়)। লেখক হাসতে হাসতে বলে, তোমার মত নপুংসক ছেলের ভাগ্য ত এমনিই হবে। তোমার বন্ধু তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে পালাবে—এ ত জানা কথা। ছেলেটি জানায়, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, সুদূর দুবাইয়ে। অন্য একজনের সঙ্গে, যাকে তারা কেউ চেনে না। অর্থাৎ, লেখকও তার কল্পিত ঘটনাকে ছেলেটির জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছে। এইভাবেই যেন, শিল্পীর বাস্তব-বোধেও অবাস্তবের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে অসুখের মত। শ্লেষ আরও ঘন হয়ে ওঠে যখন দেখি ছেলেটির বিছানা থেকে কিরোর ভাগ্যগণনার বই উঠে যায় স্বয়ং লেখকের হাতে। শিল্পী যেন নিজেই চালিয়ে নিয়ে যায় ঘটনাপ্রবাহ, তৈরি করে চরিত্র, ভাগ্য, মূল্যবোধ। অথচ, তার নিজের জীবন-বিষয়ে অনিশ্চয়তা, এক ধরনের ভীতিই তাকে ঠেলে নিয়ে যায় কিরো নির্ভরতায়। এই শ্লেষাত্মক ব্যঞ্জনা অব্যর্থ। কখনও কখনও মৃণাল আরও সূক্ষ্ম। যেমন, যে দৃশ্যে ছেলেটির প্রেমিকাকে নিয়ে তার বন্ধু সিনেমায় যায়, আমরা ঐ যুবক ও মেয়েটিকে দেখি লো অ্যাঙ্গেল শটের সামনে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। যুবক যেন তখন নিজের শরীরী ও মানসিক মাপের চেয়ে অনেক বড় হয়ে ওঠে। সে যেন সত্যিই বাস্তব পৃথিবীর অধীশ্বর, হাতের মুঠোয় তার জীবন ও ভাগ্য। কিন্তু বাতাসের মত পাতলা শ্লেষ মুহূর্তে ছড়িয়ে দেন মৃণাল, যখন দেখি যুবক মেয়েটিকে নিয়ে চলে যায় একটি 'হিন্দি' সিনেমার অন্দরমহলে। এ কি বাস্তবের হাত ধরে আবার

অবাস্তবের মধ্যে পালান নয়? ছবির শেষের দিকে লেখককে যখন বাস্তব সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি হলে কি করতে, লেখক তখন বলে, একটা 'স্ট্যাণ্ড' নেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত 'স্ট্যাণ্ড' না নিলে জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আমরা। আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে ঐ 'স্ট্যাণ্ড' শব্দটি ব্যবহার করেছেন মৃণাল। মধ্যবিত্ত জীবনবোধ এবং অসহায়তার শেষ আশ্রয় 'স্ট্যাণ্ড' নেওয়ার এই ভঙ্গুর ক্লিশের মধ্যেই যেন নিহিত রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই কতবার, কত না ভিন্ন প্রেক্ষিতে 'স্ট্যাণ্ড' নেওয়ার কথা ভেবেছি, অথচ যে মূল্যবোধ, জীবনচেতনা থেকে গড়ে উঠতে পারে কোনও ব্যাপারে স্পষ্ট, সোচ্চার 'স্ট্যাণ্ড' নেবার মনোবল এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা, তা কি আমাদের মধ্যে সবসময় আমরা পাই? লেখক ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে প্রায় সব-সময়েই দেখা হচ্ছে এক সুররিয়েলিষ্টিক বা পরাবাস্তব পরিবেশে। ছাদের মত এক বিপুল বাতায়ন যেন। ওপর থেকে ঝোলান আলোর একটা কিউবিক প্যাটার্ন গড়ে ওঠে এই অন্ধকার সংলাপ-বাতায়নে। আলোর এই কিউবিক প্যাটার্নের পরিপূরক যেন এই বিশাল সংলাপ-কক্ষের প্রতিটি আসবাব। প্রতিটি আসবাবের মৌলিক উপাদান হল ঘনক বা কিউব। মৃণালের এই কিউবিজম বা ঘনবাদের দ্বিমাত্রিক তাৎপর্য হল, এক: ঘনককে লেখক ও যুবকের মধ্যে গড়ে ওঠা টেনশনের প্রতীক হিসেবে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে এই দ্বন্দ্বের মৌলিক চরিত্রটা আভাসিত হয় কিউবের মত 'বেসিক ফর্ম'-এর মাধ্যমে। দুই: ঘনক এখানে মৃণালের ছবির বহুমাত্রিক তাৎপর্যেরও প্রতীক। এই ঘনবাদের মূল উপাদান শুধু 'কিউবিক স্ট্রাকচারই' নয়, আলোর ব্যবহারও এই 'কিউবিক ট্রিটমেণ্টকে' নানাভাবে সাহায্য করেছে। কিউবের মত মৌলিক গঠনের মধ্যে যেমন পাই এক ধরনের কঠোর নিয়মনিয়ন্ত্রিত, প্রায় যান্ত্রিক সরলীকরণ, তেমনি মৃণালও তাঁর ছবিটিকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসেন আপাত সরল, অতি-নিয়ন্ত্রিত একটি স্ট্রাকচারের মধ্যে। অথচ, কিউবের সংশ্লেষে যেমন গড়ে ওঠে মাতিস বা পিকাসোর ছবি, ঘনকের সীমিত, কঠোর পরিধি যেভাবে মুহূর্তে গলে যায় ছবির বিস্তৃত ব্যঞ্জনায়, তেমনি মৃণালের ছবিতে লেখক ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের সংলাপ-দৃশ্যগুলির দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা ছাপিয়ে ওঠে ঘনকের জ্যামিতিক নিয়ন্ত্রণ। কিউবিজম-এর ব্যবহার ভারতীয় চলচ্চিত্রে সচেতনভাবে হয়ত এই প্রথম। ইয়েটস্-এর অন্তিম অধ্যায়ের কবিতায় যেমন 'ভায়ার'-এর ব্যবহার তাৎপর্যে গভীর বিস্তারী, তেমনি মৃণালের 'তসবির আপনি আপনি' ছবিতে ঘনকের প্রতীকী ব্যঞ্জনা দূরস্পর্শী।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি : সত্যজিতের দাবা খেলা ?

দীপেন্দু চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' দেখে দর্শকেরা বেশ গম্ভীর মুখে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করছে, এ কথা শুনেছিলাম, এবং পরে ছবিটা দেখার পর নিজেই চারপাশে তাকিয়ে তা প্রত্যক্ষ করেছি। নীরব গম্ভীর মুখের অর্থ বেশ জটিল হয় সাধারণত। হতে পারে দর্শকেরা বিমূঢ়, কিংবা বিরক্ত, কিংবা হতাশ, কিংবা এমনই অভিভূত যে ভাষার উচ্ছ্বাস অবান্তর। আবার এমনও অনুমান করা হচ্ছে যে পরিচালকের আন্তর্জাতিক খ্যাতি (বিশেষ করে অক্সফোর্ডের ডিগ্রি), তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ছবিটির ভ্রূণাবস্থা থেকে দেশব্যাপী একটানা প্রচার (যে কাজে একজন প্রখ্যাত কবিও নেমে পড়েছিলেন , এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছবিটির অপরিচিত জটিল আঙ্গিক, সব মিলিয়ে শতরঞ্জ দর্শকদের (সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিশেষজ্ঞ যারা) বুদ্ধিমানের কৌশল অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য এ কৌশলের সীমারেখা প্রেক্ষাগৃহের দোরগোড়া পর্যন্তই ছিল। ঘরে বাইরে এবং চিত্র-বিশারদদের যথাস্থানে এখন শতরঞ্জ সম্বন্ধে সবাই শতমুখে যুক্তি-তর্কে-গপ্পে প্রায় মীর আর মীর্জার মতই মশগুল। একটি শিল্পকর্মের প্রভাব যদি এরকম হয় তবে একটি বিশেষ স্তরে তার অসাধারণ সাফল্য স্বীকার না করার উপায় নেই।

শতরঞ্জ নিয়ে শত কথা হচ্ছে, কিন্তু জনৈক দশ আনার (পুরনো হিসেবে) দর্শককে এমন একটি মন্তব্য করতে শুনেছি যা অনুধাবনযোগ্য—মাইরি, সত্যজিৎ সে সারাক্ষণ দাবা খেলাই দেখিয়ে গেল। ছবিটি যে তাঁর ভালো লাগেনি, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে হয় শতরঞ্জের মূল কথাটা তিনি নিজের অজান্তেই ধরে ফেলেছেন।

শতরঞ্জের প্রথম সাফল্য এখানেই।

শতরঞ্জের বিষয় দাবা খেলা, যেমন আক্ষরিক অর্থে তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে, আর দাবা যেহেতু সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের খেলা তাই ছবিটিও ভাবে ও ভঙ্গীতে সত্যজিতের দাবা খেলা। উচ্চমানের খেলা। হয়তো অনেকের নাগালের বাইরে সেই হেতু।

এ ছবিতে একটানা কোনো কাহিনী নেই। দুই জায়গীরদারের দাবা খেলায় বুঁদ হয়ে থাকার মত এক বিন্দু ঘটনা এ ছবির কেন্দ্রবিন্দু, যার চার পাশে আবর্তিত হয় এক এক রকমের দাবা খেলা—এক বিরহী নারীর স্বামীকে শতরঞ্জ থেকে নিজের কাছে টেনে আনার মর্মান্তিক অসফল খেলা, আর এক নারীর সেই সুযোগে স্বামীকে প্রতারিত করার সফল খেলা, একদিকে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির আত্মবিস্মৃত শিল্পসম্ভোগের খেলা, অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে উট্রামের কূটনৈতিক খেলা। এমন কি, অযোধ্যার সাধারণ মানুষও খেলায় আত্মহারা—তাদের আকাশে ঘুড়ি, মাটিতে ভেড়া ও

মুরগীর লড়াই। খেলা, খেলা, খেলা—খেলাই ঘটনা এখানে, খেলাই প্রতীক। স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' কে কেউ কেউ যেমন একটি expanded metaphor বলে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যজিতের শতরঞ্জও যেন তাই।

এ ছবিতে সত্যজিৎ নিজের ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুন পথ খনন করেছেন। তাঁর আগের ছবিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অবয়ব ছিল অপরিহার্য, এ ছবিতে কুশীলব শুধু ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তের উপকরণ, সেই উপকরণকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেন একজন অদৃশ্য সূত্রধার যিনি আমাদেরই ইতিহাস চেতনা। ফলত ঘটনার immediacy কাম্য হয়ে ওঠে নি পরিচালকের কাছে। যা ঘটছে তা আগেই ঘটে গেছে, এবং যা এখনও ঘটেনি অথচ ঘটবেই তাও ঘটে গেছে শতাধিক বছর আগে—এই ঐতিহাসিক সর্বজ্ঞান সূত্রধারের, এবং সেটাই ছবির গোটা অঙ্গের সীমারেখা। অন্যথায় ছাড়াছাড়া উপাখ্যানের সমষ্টি, শতরঞ্জ এইভাবে তার কাম্য ঐক্যসূত্র পেয়ে যায় একদিকে ইতিহাসের কোরাসে, অন্য-দিকে দাবাখেলার ক্রমবর্ধমান ব্যঞ্জনায়। শুধু ভারতীয় ছবিই নয়, সত্যজিতের অন্য কোনো ছবিও গঠন-প্রক্রিয়ায় এমন দ্বিমুখী হয়ে ওঠেনি। inner structure আর outer structure-এর এমন অতি-সচেতন সমন্বয় ছবিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এবং সাফল্যও।

ছবিটির আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অন্যতম এর আগাগোড়া মন্থরগতি। বোধহয় পরিচালকের উদ্দেশ্য ছিল, দাবা খেলার মত প্রায় নিশ্চল খেলার মাধ্যমে একটি গোটা সমাজের শাসকশ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক গতিহীনতা ফুটিয়ে তোলা, তাই ক্যামেরা প্রায়ই অনড়। এমন কি শেষ দিকে বৃটিশ সৈন্যের আগমনকে ক্যামেরা শুধু কাল্লুর স্থিরদৃষ্টি দিয়ে দেখে—সৈন্য সামন্ত ভাগে ভাগে কাল্লুর দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে চলে যায় আর ক্যামেরা এক জায়গায় স্থির থাকে, যেমন থাকে দাবা খেলায় আত্মমগ্ন দুই জায়গীরদার। লক্ষণীয়, সত্যজিতের ক্যামেরা অধিকাংশ সময় ওয়াজেদ আলি, মীর-মীর্জা, ও উট্রামের ঘরে আবদ্ধ থাকে, বাইরের দৃশ্যের ফ্রেমিংও এমন যে তাতে কোনো প্যানর‍্যামিক ব্যাপ্তি ধরা পড়ে না। পার্সপেক্‌টিভের এই সংকীর্ণতা অনিচ্ছাকৃত নয়, উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কে পরিচালক দূরবীক্ষণের বদলে অণুবীক্ষণে ধরতে চান। শটগুলির মেজাজ অনেকটা তাই স্লাইডের মত।

সত্যজিতের আর কোনো ছবি বোধহয় সংলাপে এতটা সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম নয়। সূত্র-ধারের গ্রন্থনা তো আছেই, প্রতিটি চরিত্রের প্রতিটি কথাই অপরিহার্য, এবং কথাগুলো এমন বহুমুখী ব্যঞ্জনায় ভরপুর যে অসংখ্য শটের কাজ একটি কথাতেই সম্পূর্ণ হয়। তবে মাঝে মধ্যে সংলাপের সূক্ষ্মতা দাবার সূক্ষ্ম চালের মতই 'কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের জন্য' বলে মনে হয়। সাধারণ দর্শক যদি শতরঞ্জের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে কষ্ট পায়

তবে তার জন্য শুধু এর জটিল আঙ্গিকই দায়ী নয়, সংলাপের মাত্রাতিরিক্ত পরিমিতি ও সূক্ষ্মতাও দায়ী। তবে এই সাধারণ দর্শকের দাবীকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলে শতরঞ্জের সংলাপ সত্যজিতের অসাধারণ কীর্তি বলে অভিনন্দিত হওয়া উচিত। উর্দু ভাষীরা কি বলবেন জানি না, তবে 'এক্ষণে' প্রকাশিত ইংরিজি চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়েছে সত্যজিৎ যদি নাটক রচনায় হাত দেন তবে বাংলা নাটকের একটা দীর্ঘদিনের অভাব দূর হতে পারে। একটি উদাহরণ : একটি সাধারণ আলাপে দাবা খেলার বিদেশী আইনকানুনের প্রসঙ্গ থেকে রেল ও টেলিগ্রাফের প্রসঙ্গ চলে আসে, আর মীর ও মীর্জার প্রতিক্রিয়ায় ফুটে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধ এবং একই সঙ্গে ভারতীয় সামন্ত প্রভুদের আত্মঘাতী উদাসীনতা।

সত্যজিতের কৃতিত্ব, তিনি এমন একটি ঐতিহাসিক ছবি করার সময় আমাদের প্রথাগত ধারণা ও প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি মীর ও মীর্জার বিবিদের সুন্দরী করে তোলেননি। 'মুঘল-এ-আজম' গোছের রোম্যান্টিক পরিবেশ রচনা করে দর্শকদের অভিভূত করতে চান নি, এমনকি 'জলসাঘরের' রোম্যান্টিক অতীত কাতরতার পুনরাবৃত্তি ঘটাননি। অন্যান্য ভারতীয় চিত্রপরিচালকদের সঙ্গে সত্যজিতের পার্থক্য এখানেই। এতগুলো ছবি করেও তিনি নিজের সফল কলাকৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেন না। শতরঞ্জ আবার তা প্রমাণ করলো।

শতরঞ্জকে কেউ কেউ এপিকধর্মী বা ক্ল্যাসিক্যাল রীতির ছবি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ছবিতে এপিকের বিশালতার চেয়ে অণুবীক্ষণের প্রবণতাই বেশী, তাই এত ডিটেলের প্রাধান্য, তাই মাত্র কয়েকটি মানুষকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, একটা গোটা জাত, গোটা সমাজের মাঝখানে তাদের পাই না। শতরঞ্জের ভাবে, ভঙ্গীতে, এবং রঙের ব্যবহারে যে পরিচ্ছন্নতা তা ক্ল্যাসিক্যাল হলে অ্যানিমেশনের ব্যবহারকে বলতে হয় ছন্দপতন. বোধহয় এই অংশটুকুতে সত্যজিৎ নিজেরই অজান্তে একটা স্থূলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন। ছবির কোরাস গ্রীক কায়দায় টীকা-টিপ্পনী দিলেও পরিশেষে তার বক্তব্যে বা কণ্ঠে কোনো ব্যথা-বেদনা-প্রার্থনা-ভর্ৎসনা বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো হুঁশিয়ারী শোনা যায় না, গ্রীক কোরাসে যা নাকি অবশ্যকর্তব্য। আসলে 'শতরঞ্জ' পূর্বপরিচিত কোনো রীতিই পুরোপুরি অনুসরণ করেনি, শতরঞ্জ বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ— ডকুমেন্টারি রীতি, গ্রীকনাটক, প্রতীকবাদ, সব কিছুর। এই মিশ্রণের সাফল্য সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ অপ্রতুল নয়। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে সূত্রধরের ভূমিকা সম্বন্ধে। তিনি প্রথম দিকে যতটা মুখ খোলেন পরে ততটা নয়, তিনি ওয়াজেদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী বেশ রসিয়ে বলেন, গোটা অযোধ্যাই যে নানান খেলায় মগ্ন তাও বলেন পর্যাপ্ত পরিমাণে irony যোগ করে, কিন্তু এই সব খেলার বাইরে তখনকার মানুষেরা আর

কিভাবে জীবনযাপন করত সে ব্যাপারে নির্বাক থাকেন। এদিকে ডালহৌসীর একটি চিঠিও আমাদের নাকের ডগায় তুলে ধরা হয়, তাই আশা জাগে আরো অনেক কিছু তুলে ধরা হবে, যেমন ঐ খেলায় মগ্ন ভারতীয় রাজা উজীরের অধীনে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এলাকায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের তথ্য। কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রায়ই করা হয় তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন—তাঁর ইতিহাস রচনায় সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা নেই; ইতিহাস তাঁর কাছে রাজাদের কাহিনী, উলুখাগড়ার নয়। ছবির শেষের দিকে কাল্লুকে যদি এই উলুখাগড়াদের প্রতিনিধি হিসেবে ধরতে হয় তবে তাকে মনে হয় একটা ফাউ। সূত্রধর বলবেন কদিনের মধ্যেই অযোধ্যা বৃটিশদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর আমরা দেখি তখনও দুই জায়গীরদার দাবা খেলায় মগ্ন। শুধু তাই নয়, এবারে দাবা খেলাটা বিদেশী নিয়মে শুরু হয়েছে। সত্যজিৎ বোঝাতে চাইছেন যে ভারতীয় শাসকবর্গ বিনা প্রতিরোধে কেমন বৃটিশ শাসন মেনে নিয়েছেন। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যায় সেটাই ছিল প্রধান দিক। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভারত জুড়ে যে-বিদ্রোহটি হয়েছিল তার মানসিক প্রস্তুতির কোনো চিহ্নই কি আজকের ঐতিহাসিকেরা দেখতে পান না ১৮৫৬ সালে? আমি ঐতিহাসিক নই, তাই একটি বিদ্রোহের জন্য যে বেশ কিছুটা আগে থেকে তার মানসিক (subjective) আয়োজন চলে এমন একটা ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করার সাহস রাখি না। সত্যজিতের সূত্রধর অযোধ্যার অতীতকে টেনে আনেন বর্তমানকে সহজবোধ্য করার জন্য, অযোধ্যার ভবিষ্যতের কথাও উল্লেখ করেন ১৮৫৬ পর্যন্ত, কিন্তু অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—সিপাহী বিদ্রোহ—তা ১৮৫৭ সালে ঘটলেও সূত্রধর তার ধার কাছ দিয়ে যান না।

এর কারণ, সত্যজিতের মতে,—The Mutiny was not sparked off by the Annexation, but by the Enfield rifle rubbing both Hindus and Moslems the wrong Way. The stored up discontent resulting from the Annexation provided fuel at a later stage.

যদি মেনে নিই সত্যজিতের উপজীব্য অযোধ্যার শাসকবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতা যা কিনা ফিউডাল অবক্ষয়ের লক্ষণ তবে হয়তো সিপাহী বিদ্রোহের প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে তাঁর দৃষ্টি থেকে, কিন্তু annexation এর ফল ঐ যে stored up discontent সেটা কেন তিনি একবারও দেখালেন না? (একটি শটে জনৈক সৈনিকের অসন্তুষ্ট মুখই কি শিল্পের খাতিরে যথেষ্ট?) আরো গভীরে সেনাদলের

অসন্তোষ দেখানো কি অনৈতিহাসিক ঘটনা হত, না কি অ-নান্দনিক ? সত্যজিতের সূত্রধরও তো অন্তত তাঁর নেপথ্য ভাষণে এর উল্লেখ করতে পারতেন।

'Shatranj Ke Khilari is not about Wajid, nor is it aimed to build up a case for the Mutiny'—সত্যজিতের এই মত অনুসারেই সিপাহী বিদ্রোহের (এবং তা কিন্তু শুধু সিপাহীদের নয়, রাজাদেরও) কিঞ্চিৎ সংকেত থাকা উচিত ছিল, কারণ শতরঞ্জ ওয়াজেদের কাহিনী না হয়েও ওয়াজেদকে অনেকখানি দেখিয়েছে, সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে কোনো 'case' না সাজিয়েও ঘটনা হিসেবে তার সঙ্গে annexation এর যোগসূত্রটি তথ্যের দিক থেকে জানানো যেতে পারতো এবং তাতে ছবিটির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হত বলে মনে হয় না। কিন্তু সত্যজিৎ নিজের প্রতীকধর্মী আঙ্গিকে নিজেই আটকে গেছেন। যে ছবির বক্তব্য এই যে ভারতীয় শাসকবর্গ হয় নাচ-গান, নয় দাবায় দ্রবীভূত, যার ফলে অস্ত্রে মরচে ধরছে, সেখানে অস্ত্র ধরার ঘটনা দেখালে (এবং ইতিহাসে তা ঘটে থাকলেও) ছবির বক্তব্যই বদলে যাবে, দাবা খেলার মত স্থাণু মানসিকতার প্রতীকটাই ভেঙ্গে যাবে, অতএব ছবি শেষ হোক ১৮৫৬ সালে। বিদেশী চিত্র বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে সাধারণ দর্শকরা, এইটুকুই জানুক অর্থাৎ যা তাঁরা এতদিন পর্যন্ত জেনে এসেছেন—ভারতীয়েরা বৃটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে, ভেড়ার লড়াই দেখতে দেখতে, এবং অবশ্যই দাবা খেলতে খেলতে। সত্যজিতের সূত্রধরকে তাই মনে হয় উট্রামের দেশ থেকে ধার করে আনা। এরকম একটা আক্ষেপ থেকেই যায়, যেহেতু এ ছবিতে সত্যজিৎ তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনা-প্রবণতার অজুহাত তো রাখেনই নি, বরং ডকুমেণ্টারি ভঙ্গী গ্রহণ করায় তথ্যনির্ভরতার আশ্বাস ক্রমেই বাড়ে, ফলে আশ্বাসভঙ্গের অভিযোগটির সুযোগ তিনিই করে দেন। যাঁরা বলেছেন, এ ছবির নান্দনিক দিকটাই বিবেচ্য, ঐতিহাসিক সত্যতা অত বড় ব্যাপার নয়, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে সত্যজিতের আঙ্গিকই তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করছে। যে-ছবিতে একটি ঐতিহাসিক দলিলের ক্লোজআপ থাকে সেখানে তথ্যের দিকটা আপনা থেকেই বড় হয়ে দাঁড়ায়। সত্যজিতের ব্যর্থতা তিনি তথ্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে তাকেই পাশ কাটিয়ে পালাতে চেয়েছেন। এতে অবশ্য তাঁর শিল্পবোধ বেঁচেছে এমন তৃপ্তি যাঁদের তাঁদের আইজেনষ্টাইনের আইভ্যান দ্য টেরিব্‌লের কথা স্মরণ করতে বলি। তুলনা করলেই সত্যজিতের শিল্পগত ফাঁকটা কোথায় তা ধরা পড়বে। ফাঁকটা আঙ্গিকের মধ্যেই যেহেতু বিষয়টা ঐতিহাসিক এবং যেহেতু তা একজন ব্যক্তির কাহিনী নয়, একটা গোটা দেশের কাহিনী। সত্যজিতের স্লাইড-মাফিক শট, চারদেওয়ালে-আটকে-থাকা-চিত্রনাট্য, একটি স্তরে একটা মস্ত ফাঁকি বলে মনে হয়—সেটা হল বাস্তবতার স্তর। তাঁর এ ছবিতে মকবুলরা কোথায় কিভাবে থাকে দেখা যায় না। এমন কি মকবুল একটা

ছায়াপথ থেকে হঠাৎ উদিত হয় ('অপরাজিত'তে সর্বজয়া রাঁধুনীর কাজ নিয়ে জনৈক ধনীর প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরটিতে যখন প্রথম ঢোকে তখন সামাজিক বৈষম্যের চেহারাটা আমাদের সঠিক জায়গায় আঘাত করেছিল)। শতরঞ্জে লখ্‌নৌ-এর বাজারে কাল্লু যায় কিন্তু বাজার দেখা যায় না, কাল্লুর বাড়িতে মীর-মীর্জারা তামাকের জন্য ঢুকলেও ক্যামেরা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে (স্মরণীয়, সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী'তে অপুদের পরিত্যক্ত বাড়িটা পর্যন্ত দেখিয়েছেন, বাস্তবতার প্রতি তাঁর অনুরাগ তখন ছিল আন্তরিক), জায়গীরদারদের অন্দরমহল বলতে আমরা একটা করে ঘর দেখি, দেখি তাঁদের একটি করে স্ত্রী, তাঁদের সংসারের আর কাউকে দেখা যায় না, লখ্‌নৌ-এর গলির ছবি তোলা হয় ওপর থেকে এমনভাবে যাতে পাশের দৃশ্য মাত্র একফালি দেখা যায় ('চারুলতা'য় চারুর দূরবীণ দিয়ে পুরনো কলকাতার রাস্তা এভাবেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু দৃষ্টিপথের সীমারেখা এখানে দূরবীণের লেন্সের তাই রাস্তার খণ্ডিত দৃশ্যে ওপর থেকে পাল্‌কির ছবি নতুন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল, শতরঞ্জে তা হয়ে থাকলো ফাঁকি দেবার সরল কৌশল), ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনো পরিবেশ তৈরি হয় নি, শুধু দৃশ্য জুড়ে আছে উট্রাম, একজন ব্যক্তি, যিনি আবার বিবেক দংশনে খিদে হারিয়েছেন ; কোম্পানীর সৈন্য ফাঁকা মাঠ দিয়ে আসে, কিন্তু লখ্‌নৌ-এ ঢোকার আগেই ছবির যবনিকাপতন হয় কারণ ওই দৃশ্যটা দেখানো একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

হয়তো সত্যজিতের আত্মপক্ষ সমর্থনে এটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গোটা ছবিতে জানলা দিয়ে দেখার মত একটা আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন, তাই আমরা সবকিছুই এক ঝলকে যতটুকু জানলায় ধরে ততটুকুই দেখতে পাই, তার বেশী দাবী করার নির্দেশ এখানে নেই। তা যদি হয় তবে প্রশ্ন ওঠে, এই কাটা কাটা প্রায় স্লাইড মাফিক ঘরোয়া দৃশ্যমালার প্রয়োজন হল কেন একটা ঐতিহাসিক ছবিতে, যেখানে দিশী ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও আপামর জনসাধারণের ভূমিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ? কেন একটা প্যানোর‍্যামিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হল না ? ষ্টুডিও ও অন্যান্য বাস্তব অসুবিধে এড়ানোর জন্য ? অর্থের অভাব ? ছবির নির্মাণপর্বে যেরকম প্রচার হয়েছিল তাতে মনে হয় না সত্যজিৎ এরকম বাস্তব সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারতেন না, বিশেষ করে যখন এতটা অর্থব্যয় তাঁর অন্য কোন ছবিতে হয় নি, বিশেষ করে যেখানে একজন বিদেশী খ্যাতনামা অভিনেতার জন্য এতটা খরচ হয় ? দিশী অভিনেতাদের খ্যাতিও সত্যজিতের অন্যত্র ব্যয়সংকোচনের একটা কারণ হতে পারে অথচ শতরঞ্জে তাঁদের যে-ভূমিকা ও অভিনয়ের সুযোগ তা কম নামী অভিনেতাদের দিয়ে করালে বোধহয় ছবির পটভূমিকা রচনায় আরো অর্থব্যয় করা যেত। আমজাদ খানের অভিনয় দেখে মনে হয় নি যে তিনি অপরিহার্য ছিলেন, একমাত্র তাঁর গব্বর সিং ইমেজের বাণিজ্যিক দিকটি ছাড়া।

আরো একটি মজার ফাঁকি, ওস্তাজেদের বহুখ্যাত শিল্পসম্ভোগ দেখানোর জন্য যেভাবে গান ও নাচ আনা হয়েছে তাতে সত্যজিৎ নিজেই তাঁর 'জলসাঘরের' পাশে এখানে হেরে গেছেন। গান ও নাচ কোনো কিছুরই অনুরণন বেশীক্ষণ থাকে না। এর কারণ অবশ্য এই যে সত্যজিৎ এখানে আবেগ অনুভূতির কাছে কোনো আবেদন রাখতে চাননি, একে-বারে অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকতা দিয়ে তিনি একটি দেশকে ছলে বলে দখল করার ঘটনাকে টুকরো টুকরো করে দেখিয়েছেন। আবেদন রেখেছেন দর্শকের মাস্তিষ্কের কাছে। বিষয় যখন দাবাখেলা তখন দর্শকদেরও তিনি যেন দাবাড়ুর মতই মস্তিষ্কচর্চায় দক্ষ বলে ধরে নিয়েছেন, তাই শতরঞ্জ দেখে দর্শকের মস্তিষ্ক যতটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, অনুভূতি ঠিক ততটাই ঠাণ্ডা থাকে। দেশটার পরাধীনতার কথা সত্যজিৎ এতটা নির্লিপ্ততা নিয়ে বলতে পারেন তাতে মনে হয় তিনি হয় বর্তমানে শিল্পচর্চাকে দাবাখেলার মতই মস্তিষ্কের ব্যায়াম বলে মনে করছেন, কিংবা হয়তো এই রীতিটি বিদেশীরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে সার্থক বলে মনে করছেন, তাই। আশংকা হয় সত্যজিৎ কি একেবারে 'বিদেশী' হয়ে যাচ্ছেন শুধু শিল্পচেতনায় নয় স্বদেশচেতনাতেও? তাই স্বদেশের পরাধীনতায় তিনি শুধু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফোটাতে পারেন, ক্রুদ্ধ বা ব্যথিত হবার ক্ষমতা রাখেন না। ঐ সব অনুভূতি আজকের পাশ্চাত্যে শিল্পবিচারে একেবারে বাতিল হয়ে গেছে কিনা জানি না, তবে স্বদেশের অপমানে খ্যাতনামা বিদেশীরাও শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রে একটু ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় না দিয়ে পারেন না এমন প্রমাণ প্রায়শই মেলে। এই সেন্টি-মেন্টটুকু যদিও বা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাহ্য করা হয়, মহৎ শিল্পীর চেতনায় তার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ শিল্পকর্মে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দ্বৈতসঙ্গীত না হলে তা বৈজ্ঞানিক দলিলের সামিল হয়ে উঠতে পারে।

সত্যজিৎ মহৎ শিল্পী, তাই বাঙালী ভাবালুতাকে পশ্চিমী মননশীলতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে শিল্পের প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রচনা করতে পেরেছেন অধিকাংশ ছবিতে। 'জলসাঘর' যদি তাঁর সবচেয়ে ভাবপ্রবণ ছবি হয় তবে শতরঞ্জ' সেই ছবি যেখানে সত্যজিৎ আবেগকে বশে আনতে গিয়ে পুরোপুরি বাদ দিয়ে ফেলেছেন, মস্তিষ্কের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। সূত্রধরের দূরত্ব এখানে কখনো দূর হয় না তাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও। রঙীন সুদৃশ্য শতরঞ্জের মত সত্যজিতের ছবি চোখের খিদে মেটায়. শতরঞ্জের খেলার মতই এ ছবি মস্তিষ্কের ঝড় তোলে, কিন্তু মন ভরে না—একেবারে আটপৌরে ভাষায় বলছি, কারণ মহৎ শিল্পের মূল কথা সেটাই, মন ভরে তোলা।

তাই সেই অশিষ্ট যুবকের উক্তিটিতেই ফিরে যেতে হচ্ছে—সত্যজিৎ শতরঞ্জে আগা-গোড়া একটা দাবা খেলাই খেলিয়েছেন ; (শুধু এইটুকু যোগ করতে চাই) এবং সত্যজিৎ নিজেই এখানে একজন দক্ষ দাবাড়ু (এই অর্থে ছবিটি অসাধারণ একটি এক্স-

পেরিমেন্ট)।

বিশ্বচলচ্চিত্রের দক্ষ দাবাড়ুরা এ ছবির 'চাল'কে অবশ্যই স্বাগত জানাবে, আশা করা যায়।

কলকাতা '৭১

ধ্রুব গুপ্ত

'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'
'City of Procession', 'Nightmarish', 'Squalid'

"আকাশকুসুম" থেকে শুরু করেই মৃণাল সেন অস্থির ভাবে এমন একটা কিছু করছেন যাকে "toying with technique" বলা যেতে পারে—এর মধ্যে গল্পের আদি মধ্য অন্ত'র classical structure-টাকে ভাঙ্গার চেষ্টা, দ্রুত দৃষ্টি কোণের পরিবর্তন, flash forward, ব্রেখটিয় কায়দায় illusion ভাঙ্গা, ছবির স্পুলছেঁড়া, audienceকে সম্বোধন, freeze ইত্যাদি নানারকম ব্যাপার আছে। এখন এগুলোর তত্বগত সমর্থনে যদি বলা হয় যে আধুনিকত্বের এইগুলিই একমাত্র অপরিহার্য লক্ষণ এবং আদি মধ্য অন্ত formula বজায় রেখেও আধুনিক ভাল ছবি করা যায় না বা করলে তা literary film হয় তবে তা তর্ক সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আমাব কাছে সে তর্কের চেয়েও অনেক মূল্যবান প্রশ্ন হল এই যে মৃণাল সেন তাঁর কাজের মধ্যে এই জাতীয় পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করছেন কিনা, তাঁর সৃষ্ট ছবি তাঁর অস্থিরতাকে কার্যত সমর্থন করছে কিনা।

"প্রতিনিধি" করবার সময় মৃণাল সেন আন্তনিয়নির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন—শারীরিক violence-এর চেয়ে অন্তর্লীন violence-কে চিত্রিত করাকে তিনি অধিকতর অভিপ্রেত মনে করতেন। বহুদিন পর তাঁর ছবি "কলকাতা ৭১" দেখে মনে হয়—তিনি সেদিক থেকে বদলেছেন—ঝুঁকেছেন গদারের দিকে। এতে দোষের কিছু নেই—চলচ্চিত্রের মত শিল্পের ক্ষেত্রে cross fertilization সবসময়েই স্বাগত—কিন্তু আবার বলছি কাজে সেটা কতটা ফল দিয়েছে সেটাই বড় কথা।

"কলকাতা-৭১" দেখে মনে হয়—ত্রুটিহীন না হওয়া সত্বেও এছবিতে সুফল ফলেছে।

হাওড়া ব্রীজের লং শট দিয়ে শুরু করে মৃণালবাবু কলকাতার বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর একটা কোলাজ মত তৈরী করেই রঙিন দৃশ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সুহাসিনী মুলেকে দেখান, সঙ্গে সঙ্গে উঁচু জায়গা থেকে কলকাতার skyline-এর একটা slow

track শট intercut করে দেখানো হয়—এখানে আনন্দশংকর সুন্দর ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত রচনা করেন—এই দৃশ্যটি conceptual দৃশ্য হিসাবে হৃদয়গ্রাহী—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' এই লাইনের স্মারক। মেয়েটি ময়দানে এসে থমকে দাঁড়ায় —একটি মৃতদেহ দেখে (মৃতদেহটি frame-এর বাইরে), নেপথ্যে আকাশবাণীর ঘোষক-এর কণ্ঠে একটি অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের ময়দানে মৃতদেহ পাওয়ার ঘোষণা।

এই হল ছবির মুখবন্ধ। এরপর টাইটেল—তারপর কাল্পনিক বিচারালয়-এর সাহায্যে মৃণাল সেই এই ছবিকে তার পূর্ববর্তী ছবি "ইন্টারভিউ"র সঙ্গে সংযুক্ত করেন। Statue ভাঙ্গার অপরাধে রঞ্জিতের বিচার হচ্ছে। এই অংশটিকে ভীষণ প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। পূর্ববর্তী ছবির কৈফিয়ৎ দেওয়ার—rationalization করবার কোন প্রয়োজন এ ছবিতে ছিল বলে মনে হয় না—আর দৃশ্যটি অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ। আলাদাভাবে sequence-টিতে বেশ কিছু গুণ রয়েছে। ডামিটিকে দোদুল্যমান অবস্থায় ভাল ব্যবহার করা হয়েছে—Employees' Union-এর শোভাযাত্রার ব্যাপারটিও বেশ মজার—কিন্তু মনে হয় না মূল ছবির শরীরের পক্ষে এর কোন প্রয়োজন ছিল—এবং যতই না সনাতনী গল্পের চেহারা ভাঙ্গা হোক, একটা ছবি যখন তৈরী হয়েছে তখন সেই বিশেষ ছবির ধর্ম অনুযায়ীও, তার logic অনুযায়ীও একটা নির্দিষ্ট চেহারা প্রত্যাশিত।

এর পর থেকেই ছবিটি সেই নির্দিষ্ট চেহারা পেতে থাকে। Central Theme হিসাবে "দারিদ্র্য, হতাশা ও বঞ্চনা"কে বেছে নেওয়া হয় এবং ১৯৩৩, ১৯৪৩, ১৯৫৩ এবং ১৯৭১-এর চুটি গল্পের মাধ্যমে সেই themeকে চিত্রায়িত করা হয়। ১৯৩৩ ও ১৯৪৩ এবং ১৯৫৩-র চিত্রণ হিসাবে মৃণাল সেন সনাতনী গল্পের থেকে উপাদান আহরণ করে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করেন। প্রথমটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আত্মহত্যার অধিকার"। Visually এখানে দারিদ্র্য বেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত—বিশেষ করে মায়ের মুখটি, কোলে শিশু এবং ছাতা ধরে থাকা মেয়ে—এই অংশে অভিনয়ের সংলাপ অংশটি কিঞ্চিৎ দুর্বল—একটু chaotic লাগে। লাইন করে আশ্রয় নিতে যাওয়ার দৃশ্যে music একটু arty লাগে এ ছবির ধর্মে, কিন্তু শেষটি খুবই গভীরতার সঙ্গে চিত্রিত এবং সেখানে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখটি সুব্যবহৃত। মারি সিটন সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে তাঁর বইতে বলেছেন যে inner psychologyকে বাহ্যিকরূপ দেবার মত উপযুক্ত physical type বাছায় সত্যজিৎ Eisenstein ও বিশেষ অর্থে Leonardo de Vinciর সঙ্গে তুলনীয়। এই physical type বাছা অতি দুরূহ কাজ—সত্যজিৎ সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতার সঙ্গে করেছেন। এই ছবির আগে মৃণাল সেনকে এ ব্যাপারে এতখানি সফল হতে আমি দেখিনি, বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত physical type ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কিন্তু এখানে ১৯৪৩ সালে (প্রবোধ সান্যালের "অঙ্গার")র চিত্রণে মাধবী চক্রবর্তী

ও বিনতা রায়ের মুখকে মৃণালবাবু অসামান্য সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এখানে গল্পের depictionএ প্রচলিত পদ্ধতিই অবলম্বন করেও তার মধ্যে নেপথ্য বিবরণী এবং যে চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে তখন তাকে দেখানো অথচ sound trackএ সেই কথাগুলিকেই রেখে দেওয়া ইত্যাদিও রাখা হয়েছে—কিন্তু সেটা এখানে বড় কথা নয়, এই অংশে সমস্তক্ষণ একটা ভয়ঙ্কর কি ঘটবে বা ঘটেছে সেই আবহাওয়া একটা চাপা violence চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করে রাখা হয়েছে। শেষে একটা প্রচণ্ড denouement—যেখানে মা মেয়েকে charge করে এই অংশে মাধবী ও বিনতার অভিনয় অবিস্মরণীয়। এদের দুজনের চূড়ান্ত সফল filmic অভিনয়ের পাশে অনুভার দাঁত খোটা মাথা নাড়ানোর ভঙ্গিগত আতিশয্য একটু বেমানান এবং অশোক মুখার্জীর প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি জোর করে স্পষ্ট করে শোনানো ও 'শ' কে 'shsh' উচ্চারণের থিয়েটারী রীতি বেসুরো লাগে।

পরবর্তী অংশটি সমরেশ বসুর "স্মাগলার" গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত। এ অংশটিতেও সনাতনী narrativeকে মোটামুটি রক্ষা করেও তার মধ্যে ব্যতিক্রম রাখা হয়—যেমন গৌরাঙ্গকে পুলিশ ধরার ঘটনাটি অকস্মাৎ মৃণালবাবু গল্পের মাঝখানেই দেখিয়েছেন, এছাড়া ছেলেটির মুখের close upএর সঙ্গে তার ছেলেবেলার "কিৎ কিৎ" খেলার দৃশ্যের সংযোজন ইত্যাদিতে সে জাতীয় narrative ভাঙ্গার কোন নিদর্শন নেই। ট্রেন থেকে নেওয়া বাইরের কিছু দৃশ্য বাদ দিলে এবং ট্রেনের যাত্রীদের ব্যবহারজনিত কিছু দৃশ্য সামান্য edit করলে বলা যায় এটিও একটি অনবদ্য রচনা। ছেলেটির মার চরিত্রে অবতীর্ণ হন গীতা সেন—তার মুখখানিও অসামান্য filmic quality সম্পন্ন, তার কণ্ঠের "গৌরাঙ্গরে" ডাকটিও বাঞ্ছিত atmosphere সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে—ঘুমন্ত ছেলেকে থাপড়াতে থাপড়াতে আধশোয়া অবস্থায় ওর একটি শট্ রয়েছে mid close, সেখানে ওর মুখের রেখায়, চোখের ইঙ্গিতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অস্তিত্বের সংগ্রামে পর্যুদস্ত সকল মায়ের একটি universal চেহারা ফুটেছে—আরো ব্যাপকভাবে যা একমাত্র অপু চিত্রে সর্বজয়ার মধ্যে লভ্য।

ঠিক এরপরই মৃণাল সেন এ আসেন—ছবির styleও হঠাৎ বদলে যায়। দুটি episode (ঠিক কাহিনী বলা যায় না এদের) এর সাহায্যে মৃণালবাবু ১৯৭১-কে ধরেন। প্রথমটি একটি ধনী ব্যবসায়ীর পার্টির দৃশ্য—এতে তাপসবাবুর তৈরী psychedelic আলো এবং আনন্দশঙ্করের pop music চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। একটি বৃদ্ধার মুখ পার্টির চরিত্রটি বেশ ভাল establish করে, কিন্তু তারপরই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পার্টির অন্যান্য চরিত্রগুলির কথোপকথনে কিছুটা কৃত্রিমতা এসে যায়। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি দেখিয়ে সেটা অজিতেশ কেন dining roomএ

রাখেন অন্য ঘরে না রেখে তাই নিয়ে একটা উপভোগ্য ব্যঙ্গ এখানে সন্নিবিষ্ট—কিন্তু অন্যান্য dialogueগুলি কিঞ্চিৎ trite। ব্যাপারটা visually খানিকটা interesting হতে পারে quick cutting এর দায় ভাগে, কিন্তু পার্টিতে এমন সব মুখ দেখানো হয় যেগুলি পার্টির চরিত্র রক্ষা করে না—physical type বাছতে মৃণাল সেন এখানে সফল হননি—বিশেষ করে আগেকার অধ্যায়গুলিতে উনি যে স্তরের সফলতা অর্জন করেছেন এ ব্যাপারে তার তুলনায় এই ব্যর্থতা পীড়াদায়ক। কেবল একটি মেয়ের মুখে box collection করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে মেয়েদের ice cream খেতে চাওয়ার কথার সঙ্গেই কাট করে refugeeদের অমানুষিক দুর্দশার দৃশ্যের দ্রুত ট্র্যাকিং বেশ কার্যকরী হয়। সঙ্গীতের তালে তালে আশা-হতাশা ইত্যাদি কথার সংযোজনও বেশ কার্যকরী হয়—হঠাৎ spool ছিঁড়ে মৃণালবাবু দর্শকদের shock দিতে অন্বিষ্ট হন এবং তার পরেই আসে সেই ছেলেটি—অন্ধকারে তার কণ্ঠস্বর "ভয় পাবেন না"। সে নিজে ভয় পেয়ে দৌড়োয়—প্রাণ রক্ষার জন্য দৌড়োয়—এখানে মৃণালবাবু আবার conceptual level ব্যবহার করেন, কারণ ছেলেটি দৌড়োয় শহরে, বনে সমুদ্রের ধারে, মাঠে ময়দানে। তাকে তাড়া করছে পুলিশ। সরাসরি পুলিশ না দেখিয়ে এখানে মৃণালবাবুকে styliza-tion-এর আশ্রয় নিতে হয়—model, negative-এ ballet ইত্যাদি। যেহেতু এখানে episodeটি naturalistic নয়, তাই styleএর মধ্যে সেটা মোটামুটি মানিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি যাকে গুলী করা হয় ময়দানে, এখানে round up করার ব্যাপারটা রয়েছে কিন্তু সে যে ব্রেখটিয় বা গদারিয় কায়দায় দর্শকদের সোজা উদ্দেশ্য করে "এত নির্লিপ্ত কেন" ইত্যাদি বলে দর্শকদের sensibilityর ওপর আঘাত দিতে চায়, মনে হয় না এটার প্রয়োজন ছিল—ছবির termsএই সেটা উনি দিতে পেরেছিলেন—এই over-statementএর কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্ধকারে ছেলেটির মুখ-গাল বেয়ে রক্ত, অস্ফুট আর্তনাদ—এ সবই যথেষ্ট ছিল—দেবরাজ রায়ের মুখটি এখানে আবার অসামান্য সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত। সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী কাহিনীগুলিকে একসূত্রে গাঁথাও বেশ কার্য-করী হয় এবং সবশেষে ময়দানে দেবরাজের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহর শটের সঙ্গে sound trackএ radioর অনুষ্ঠান আরম্ভের time signal চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। এইভাবে রেশ রেখে যাওয়ার কাজ মৃণাল সেনের আর কোন ছবিতে এতখানি সাফল্যের সঙ্গে করা হয়নি।

দেবরাজের মৃত্যুতে কি বোঝালো যে বিপ্লব 'মৃত'? আজকাল একটা particular ছবির শেষ দৃশ্য দিয়ে এ জাতীয় আক্ষরিক অর্থ বার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, অর্থাৎ ছবি যে open ended হতে পারে এই চিন্তা এখনও আমাদের মাথায় আসেনি —"কাঞ্চনজঙ্ঘা"র মত ছবি তৈরী হবার পরও নয়। "ইন্টারভিউ" ছবিতে ডামি ভাঙার

মধ্যে যে violence depicted তাতে একটি চরিত্রের anger—একটা personal levelএ protestএর রূপ নেয়, তাতে বিপ্লবের জয় সূচিত হয় না. তেমনি "কলকাতা ৭১"এর এই ছেলেটি যে "হাজার বছর ধরে দারিদ্র্য বা লাঞ্ছনার" ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে—সে প্রকৃতপক্ষে একটি চরিত্র নয়, একটি concept—একটা দৃষ্টিভঙ্গি। সেই ছেলের মৃত্যু দেখিয়ে ছবি শেষ করা মানেই একথা বলা হয় না যে "বিপ্লব" মৃত হল। যারা "ইন্টারভিউ"র শেষ দৃশ্য দেখে উদ্বাহু হয়ে বিপ্লবের জয় হয়েছে বলে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা হয়তো এবার মাথায় হাত দিয়ে বলবেন মৃণাল সেন একি করলেন? কেননা একটি ছবির scopeএ সেই ছবির চরিত্র ও তার open-end-এর ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করতে আমাদের সরল রৈখিক চিন্তাপদ্ধতি এখনও প্রস্তুত হয়নি।

হ্যামলেট

নবারুণ ভট্টাচার্য

কোজিনৎসেভের হ্যামলেট অসাধারণ। কারণ শেক্সপীয়রের সাহিত্যকে এত দক্ষতার সঙ্গে 'Visual content'-এর জগতে অনুবাদ করা হয়েছে যে কখনও হ্যামলেট কাব্যরসের অনুভব কমে গেছে বা থমকে যেতে হয়েছে, এরকম ঘটেনি। অথচ এরকমও মনে হয়নি যে দূর কোনো ক্লাসিক পৃথিবীর চিত্ররূপ আমাদের শুধুমাত্র অজানা আগ্রহের টানে বসিয়ে রেখেছে। হ্যামলেট অসম্ভব সমসাময়িক, অত্যন্ত মানবিক। কারণ, মানবিকতার শর্তই হল কারাগার চূর্ণ করা, পৃথিবীটাকে পাল্টানো—হ্যামলেট সেই চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখে নি। টাইটেলের পাথর আর মশালের আগুন—কারাগার আর মুক্ত চেতনার এক নিঃশর্ত ডায়ালেকটিক। হ্যামলেট বনাম অন্যায় আর ত্রাসের রাষ্ট্রশক্তি। উইটেন-বার্গের ছাত্র হ্যামলেট, মার্টিন লুথার, ড. ফসটাস। হ্যামলেটের মধ্যে রেনেসাঁস ও প্রোটেস্টান্ট বিশ্বচেতনা মিশে যায়। হিউম্যানিটাস বনাম ফেরিটাসের লড়াই। আজকের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?

ছবির শুরুতে প্যারালেল ট্র্যাকিং শটে হ্যামলেট যখন ঘোড়া ছুটিয়ে আসে তখন আকাশের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ, অশুভ সম্ভাবনার এই পরিবেশ আকাশ, মেঘ, পাথুরে জমির নিজস্ব রঙে নির্মমভাবে ছবির মুড তৈরি করে দেয়। ডিপ ফোকাস লেন্সের ব্যবহারে বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। এ ছবির নির্মাণ একেবারেই কায়দা-বর্জিত কিন্তু এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা আমার কাছে আইজেনস্টাইন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ বলে মনে

হয়েছে। এই ছবির মনতাজ-পদ্ধতি নতুনতর—শটের কাটিং পয়েন্টে না কাটার ফলে সম্পূর্ণ নতুন এক rhythm তৈরি হয়েছে। এবং হ্যামলেটের অনেক সংলাপ দৃশ্যের সঙ্গে এক counterpoint ও tension সৃষ্টি করেছে যার ফলে হ্যামলেটের চিন্তার জগতে পৌঁছতে দর্শকদের অনেক সুবিধা হয়েছে। একই ফ্রেমের মধ্যে দ্বান্দ্বিক উপাদানগুলি সাজানোর একটি সার্থকতম উদাহরণ এই ছবি। অভিনেতাদের সঙ্গে হ্যামলেটের দৃশ্যগুলি যার প্রমাণ—সেখানে মুকুট, হ্যামলেট, অভিনেতারা সকলেই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে যুক্ত। আরও বিস্ময়কর যে প্রতিটি অংশের ও অংশগত দৃশ্যের মধ্যে পরিচালকের কি পরিমাণ চিন্তা কাজ করেছে! যেমন প্রেতাত্মার দৃশ্যের আগে ঘোড়াদের ভয় পাওয়ার দৃশ্যটির কোনো তুলনা নেই। ম্যাকবেথের সেই ঘোড়া। লাগাম ছিঁড়ে ঘোড়ার ছুটে যাওয়ার ছবিটি দেলাক্রোয়াব ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং তারপরে স্লো-মোশনে হ্যাম-লেটের পিতার প্রেত আসে। যন্ত্রণায় করুণ এক মুখবর্মের নিচে আমরা যেন কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাই। এই অংশে আমার কাছে যেটা অসাধারণ লেগেছে সেটা হল—"বিষ"—এই ভয়াবহ কথাটি উচ্চারণের সময় অন্ধকার সমুদ্রের ওপর ক্যামেরা থেমে যায়, যেন সমুদ্র বিষ হয়ে গেছে। এই দৃশ্য আমার কাছে এপিক। গাট্রুডের ঘরে পোলোনিয়াসকে হত্যা করার দৃশ্যে ভারি পর্দা ছিঁড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওপারে মাথা-বিহীন কয়েকটি ম্যানেকিন দেখা যায়—রাণীর পোশাক ঠিক ঠিক মাপে রাখবার জন্য ঐ ম্যানেকিন। হ্যামলেটের এই অনিচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষী ওরা কারা? কবন্ধ রাষ্ট্রশক্তি? মানে খোঁজবার বাতিক বলে প্রমাণিত হবার পূর্ণ সুযোগ যদিও এখানে রয়েছে, তবুও ঐ দৃশ্য বিস্ময়কর।

সমস্ত ছবিতে পাথর আর কঠিন পাথুরে মাটি, সমুদ্র, এলসিনর দুর্গের দাঁতওয়ালা গেট—শুধু নিমজ্জিত ওফেলিয়ার দৃশ্যে একটা গাছ দেখা যায়, শ্যাওলা, ছোট ছোট মাছ। এর পরেই কবরের দৃশ্য—যোরিকের খুলি হাতে নিয়ে হ্যামলেটের চূড়ান্ত প্রশ্ন—কঙ্কাল-মস্তকের চোখের কোটর দিয়ে ঝুর ঝুর করে বালি পড়ে, ক্লাউনের কান্না নিয়ে তামাশা করার মতো। কফিনের ওপর পেরেক ঠোকার শব্দ বুকের মধ্যে গিঁথে যায়... সমস্ত ডেনমার্ক কারাগার, কিন্তু কারাগারের আকাশে একটা পাখী সমস্ত আকাশ বেড় দিয়ে উড়ে যায়...হ্যামলেটের শেষ জবাব সে তরবারিতেই দেয়—ক্লদিয়াসের ঘৃণ্য চক্রান্তে জীবন দিতে হলেও হ্যামলেট প্রমাণ করে যে বুদ্ধিজীবীরাও প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরতে জানে।

কোজিনৎসেভ ডেনমার্কের জনগণকে দেখিয়েছেন—প্রথম যখন ক্লদিয়াসের নতুন বিবাহের কথা ঘোষণা করা হয় এবং শেষ যখন হ্যামলেটের মৃতদেহ দুর্গের বাইরে নিয়ে আসা হয়। যদিও হ্যামলেট এদের অনেক কাছের লোক তবুও দুর্গের ভেতরের জগৎ

এদের কাছে অপরিচিত। তারাই ডেনমার্ক। হ্যামলেটকে তারা চুপ করে দেখে, একটা ছোট ছেলে শুধু নড়াচড়া করে। জনগণের সঙ্গে হ্যামলেটের এই ব্যবধান কোজিনৎসেভ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। দুর্গের ভারি দরজা খোলবার যাঁতাকলে শ্রমিকদের রোমান ক্রীতদাসদের মতো দেখায়। ক্লদিয়াসের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করে হ্যামলেট এদের পক্ষ নেয়, তা সে জেনেই হোক, অজ্ঞান্তেই হোক। সম্ভবত হ্যামলেট জানত, কারণ সেই তো বলেছিল যে ডেনমার্ক কারাগার। হ্যামলেটকে তার দেশ ও সময়ের মধ্যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এমন কি বিষে শরীর থিতিয়ে আসার সময়ে হ্যামলেট যখন আড়ষ্ট পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, সেখানেও কথা অনেক কম, "the rest is silence" ভীষণ নগ্ন ও স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। হ্যামলেট যেন হাত তুলে কোনো এক দিক নির্দেশ করতে গিয়ে থেমে যায়। এই মুহূর্ত অসীম শুধু ট্রাজেডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এবং গভীর অর্থবহ।

হ্যামলেটের ভূমিকায় ইলোখেনতি স্মোকতুনোভস্কির অভিনয় এক আশ্চর্য বিস্ময়। স্বরকার সোস্টাকোভিচের সঙ্গে কোজিনৎসেভের যোগাযোগ নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ থেকে চলে আসছে। সোস্টাকোভিচের সঙ্গীত এই চলচ্চিত্রের এক অসাধারণ সম্পদ। ওফেলিয়ার নাচ শেখার সময় তারযন্ত্রের মিষ্টি বাজনা হৃদয় স্পর্শ করে। আবার পিতার প্রেতাত্মা দেখবার সময় ও হ্যামলেটের শেষ যাত্রার সঙ্গীত একেবারে অন্যরকম।— রাজকীয়, গম্ভীর ও অতলস্পর্শী। এক্সপ্রেশনিষ্ট পর্যায়ের 'দা নোস' এবং মহান 'লেনিনগ্রাদ সিম্ফনি'-র স্রষ্টার হ্যামলেট সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাজকীয় ষ্ট্র্যাভিনস্কির কোনো কোনো সঙ্গীতাংশ মনে পড়ে। অলিভিয়ার সংস্করণে হ্যামলেট ফাঁকা সিংহাসনের দিকে উঠে যায়। অতএব, হাতে থাকে শূন্য বা অস্তিত্ববাদের ফাঁকা আস্তিন। কোজিনৎসেভের হ্যামলেট শুধু বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীল ভূমিকাটুকুই পালন করে না—পৃথিবীর পাল্টানোর চেষ্টায় সে মার্কসের ভাষায় মানবিক মুহূর্তগুলির চিরায়ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, মানুষের activity, essence ও action-কে সমার্থক বলে প্রমাণ করে। মানুষ যেখানে যুক্তিতে মহান, সৃষ্টি ক্ষমতায় অপরিসীম···

রুষ হ্যামলেট

বীতশোক ভট্টাচার্য

হ্যামলেট, রুষ হ্যামলেট দেখলাম আবার, স্মৃতির শুশ্রূষা হলো। ট্র্যাজিক সংবিৎ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও অন্তত এটুকু বলা যায়।

এই হ্যামলেট আমায় বিশেষভাবে প্রাচ্যস্বভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্ররা যেভাবে দেসদিমোনা, শকুন্তলা ও মিরান্দার সরল সমীকরণ করতেন তেমন সুলভ সমাধানের স্পষ্টতা নেই এখানে। তবু একটা এপিক স্কেলের ব্যাপার আছে, রুষরা উপন্যাস দিয়ে তার কিছুটা মেপেছেন, তাঁদের শেকৃসপিআর চর্চা আরেকটা পরিমাপ। জর্মানরা এবং রুষরা যেভাবে তাঁকে নিয়েছেন, নিতে পেরেছেন, বলতেই হয়, তেমন আর কেউ না। আর আকস্মিকও বলা চলে না যোগাযোগটাকে। প্রাণের বিশাল প্রাচুর্যের সঙ্গে শেকৃসপিআর মেলেন, মহাভারত মেলে। হ্যামলেট হোরেশিও কবর খুঁড়িয়ে মানুষটি বারবার একটি টানটান বৌদ্ধ বেদনার তারে ঘা দেন। এটাকে প্রাচ্য কেন বলছি, জিগেস করলে অবশ্য এখনই বলতে পারবো না। ইতিহাসের বিড়ম্বনা এই হ্যামলেটের রুষ অনুবাদের জন্য এঁদের নির্ভর করতে হয়েছে পাস্তেরনাকের উপর। তরুণ হ্যামলেটের মুখ এখানে পাস্তেরনাকের আদলে তৈরি মনে হয়। পাস্তেরনাকদের সময়টা এরকমই একটা মূর্ত ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্ত। তাঁর সঙ্গীরা একে একে খশে গেলেন। পাস্তেরনাক একা রাত জেগে বসে রইলেন। জিভাগো হ্যামলেটের এক আধুনিক রুষ সংস্করণ বোধ হয়। পাস্তের-নাকের জীবনের বিনিময়ে জিভাগোর জীবন ও কবিতা পাওয়া গেলো। জীবন ও শিল্পের এই বিনিময় আছে খুব কম লেখকের রচনায়। রিলকে মান পাস্তেরনাকের মতো জর্মান রুষ মানস ছাড়া তার বিশেষ খোঁজ পাই না। হ্যামলেটে জীবন এবং শিল্পের অবিরল স্থান-বিনিময় আছে, এবং এই তৃতীয় মাত্রাই হ্যামলেটকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে মনে হয়।

ওকা উরি কথা

ঈশ্বর চক্রবর্তী

ভোর হচ্ছে।

ভোর হচ্ছে? ভোর হবে কেন। ওদের জীবনের অন্ধকার কি কেটে গেল যে ভোর হবে। অসমতল ভূমি আর চতুর্দিকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মতো ছড়িয়ে আছে বড় বড় সব পাথর, মাঝে ছোট্ট কুঁড়েটি; সেখানে ভোর হয়—এক মনোরম প্রত্যূষ। প্রকৃতি মুক্ত-স্বভাব, তার আলোটুকু বাবুদের ভাঁড়ারে বন্দী হয়নি; ভেঙ্কায়ার অতি ক্ষুদ্র আস্তানাটির মধ্যে ভোরের আলো পৌঁছে যায়। ঘুম ভাঙে ভেঙ্কায়ার, শুরু হয় আরেকটি অন্ধকার দিন। প্রকৃতিতে ভোর হওয়ার কারণ বুঝতে পারি ভেঙ্কায়া ঘুম থেকে উঠেই যখন বিরক্ত হয়। এক বিকট চপেটাঘাতে গায়ে-বসা কোন মশা বা

মাছিকে সে পিষ্ট করে দেয়। ঘুম থেকে উঠেই বিরক্ত কেন ভেঙ্কায়া ? আরেকটা দিন—রাতের চেয়েও অন্ধকার যা, সমাজের সাথে আরেকটা দিনের লড়াই, নিয়ম শাসন ও বঞ্চনার সমাজে আরও একটা দিনের বাঁচার চেষ্টা। ঘেন্না ধরে গেছে ভেঙ্কায়ার। এই সমাজের মুখে (ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে) সে পেচ্ছাব করে।

"নে, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।" কিংবা "ঘুম ভাঙলো তো আবার ঘুমো।" ছেলেকে বলে ভেঙ্কায়া। জেগে থাকলেই যে "কামের কলে" ধরা দিতে হবে।

কামের "কল" কেন ? কাম—কর্ম, সে তো যজ্ঞ। সে যজ্ঞে নিজেকে নিষ্কাম—অর্থাৎ ফল কামনা না করে, সঁপে দিতে হবে : এ-ই তো ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের বাণী। অশিক্ষিত গ্রাম্য ভেঙ্কায়া সমাজের প্রচার ও ধর্মের অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং বুদ্ধিহীন ও অপারগ বিচারে আজীবন কাজ করে যাবে ও ঠকে যাবে—এ-ই তো হওয়া উচিত। কিন্তু ভেঙ্কায়া হঠাৎ অন্য কথা বলে কেন ?

বলে ; কারণ ছবির পরিচালক মৃণাল সেন।

১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন গ্রামে গিয়ে তুলেছিলেন 'ভুবন সোম'। তার আগে ১৯৫৯-এ যিনি 'বাইশে শ্রাবণ' করেছেন—যে ছবিকে একটা রাজনৈতিক চরিত্র দিতে পেরেছেন, তিনি হঠাৎ তুললেন 'ভুবন সোম'। সমসাময়িক কলকাতায় তখন চলেছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। এবং একই সময়ে 'ভুবন সোম' পেল ভূয়সী প্রশংসা। বিশেষ মহল থেকে যখন মৃণাল সেনের তৈরি একটি অরাজনৈতিক ছবি প্রশংসিত হয়, তখন তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৃণাল সেনও চিন্তিত হলেন, একজন সংগ্রামী পরিচালক নিজের সাময়িক অসতর্কতায় আহত হলেন, কারণ তাঁর কলকাতায় যখন রাজনৈতিক এক চরম উত্তেজনা চলেছে তখন তিনি কোন 'রসঘন মিষ্টি ছবি' তৈরি করে রসের কারবারীদের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য ছবি করতে আসেন নি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, আর 'ভুবন সোম নয়, আসুক অন্য কিছু'। অর্থাৎ রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করলেন।

সুতরাং তৈরি হল 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা ৭১', 'পদাতিক', 'কোরাস'। শহর-জীবনের রাজনৈতিক ছবি করতে গিয়ে তাঁকে সমস্যার নাভিমূলে—অর্থাৎ গ্রামে, যেতে হয়েছে বারবার। শহর-জীবনের ফাঁকে ফাঁকে ছবিতে এসেছে গ্রাম—শোষণের মূল বীজ যেখানে প্রোথিত। গ্রাম আর শহর মিশেছে সঙ্গত ভাবেই ; গ্রামে শহরে শোষণের অভিন্ন রূপ ধরে ফেলেছেন তিনি। কৃষিভিত্তিক দেশে শোষণ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের পথ ধরে শহরে এসে পৌঁছয়, মূলতঃ এক হলেও বাহ্যতঃ স্থানভেদে শোষণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে শহরে। রাজনৈতিক আন্দোলনে শহরের ভূমিকা থাকে অগ্রণী, সুতরাং আন্দোলন শহরে

দানা বাঁধলে একজন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার সে আন্দোলনের ব্যাখ্যা দিতে বসে গ্রামের দিকে চোখ রাখবেনই, কারণ সমস্যার স্থানিক আলোচনা সেরে তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন না, বরং একটি বৃহত্তর পর্যালোচনা কিংবা তার ইঙ্গিত তিনি রাখবেন। সমস্যার গভীরে নাড়া দেবার পথটি তাঁকে জানতে হয়ই। সমস্যার গভীরতা—যা ভাববাদী শিল্পীদের কাছে অব্যক্ত মায়াময় অজাগতিক, বস্তুবাদী শিল্পীর কাছে সমস্যার মূল কারণ। রাজনৈতিক শিল্পী যদি মার্কসবাদী হন, তবে সমস্যার মূলে পৌঁছতে তার সামাজিক বিচার করেন, রাজনীতিকে অর্থনীতি দিয়ে বিচার করেন। সে ক্ষেত্রে গ্রামই হয়ে ওঠে তাঁর ছাবর জন্মভূমি, শহর শুধু প্রয়োজনবোধে সে ছবির বাসস্থান।…'ইণ্টারভিউ থেকে পদাতিক এই তিনটি ছবিতে পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে কলকাতা। কলকাতা এই তিনটি ছবিতে শারীরিক ভাবে উপস্থিত আগাগোড়া। কিন্তু তিনটি ছবিতেই, অন্তত আমি এই ভাবেই দেখেছি, কলকাতার শারীরিক উপস্থিতি এসেছে নেহাৎই একটা excuse হিসাবে। চেষ্টা করেছি কলকাতার এই শারীরিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গোটা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেহারার আন্দাজ পাওয়ার, বিশ্লেষণ করার এবং ব্যাখ্যা করার এবং ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেশের এই realityকে এক সঠিক perspective-এ এনে দাঁড করানোর (—মৃণাল সেন)।' অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিচালক হিসেবে এবার তিনি তাঁর কর্তব্যের কথা ঘোষণা করলেন। বারেবারে গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রবণতায় বোঝা যায়, রাজনৈতিক চেহারাটার একটা সামাজিক চরিত্র (যা থেকে গোটা দেশের সামাজিক চরিত্র বোঝা যাবে, কেননা ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান ও কৃষিভিত্তিক দেশ) তুলে ধরতে চান। সামাজিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হলে, তার বিচার হবে অর্থনৈতিক। এই ছবি—'ওকা উরি কথা'র বিচার করেছেন পরিচালক অর্থনীতি দিয়ে।

রাজনীতি সচেতন এক পরিচালকের ছবি যখন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষিত এবং পরিচালক যখন কর্তব্যপরায়ণ, তখন তার ছবির একটি প্রধান চরিত্র তো ও কথা বলতেই পারে। ভেঙ্কায়া 'কাম'কে বলতে পারে 'কল'।

আমরা এবার দেখব, ভেঙ্কায়া এ কথা বলতে পারল কেন।

এই ছবির পটভূমি গ্রাম। কাহিনী শোষণের। সুতরাং ব্যাখ্যা সাধারণভাবেই অর্থনৈতিক। শোষণের যন্ত্র শ্রম এবং লক্ষ শ্রমিক। ভেঙ্কায়া একজন শ্রমিক—কৃষিশ্রমিক। সে শোষিত, ভয়ঙ্কর শোষণে বিধ্বস্ত। যে সমাজে সে বাস করে তা আধাসামন্ততান্ত্রিক এবং সে কারণেই কুৎসিৎ সংস্কারগ্রস্ত। সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজে ভাববাদী দর্শন ও ধর্মের আফিম সাধারণ মানুষকে তার শোষিতাবস্থার কারণ নির্ণয়ে অপারগ করে রাখে। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে শেখে, সেক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক শিক্ষা পায়; ফলে সে তার শোষিতাবস্থার কারণ বোঝে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

অন্তত মানসিক প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু ভেঙ্কায়া, সে যে সামাজিক অবস্থায় বাস করে সেখানে বসে সে কী করে অর্থনৈতিক বিচার বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে? হয়ত পারে না সে, যদি সে একজন শ্রমিক মাত্র হয়। এখানে, ভেঙ্কায়া একজন শ্রমিক হলেও, তার এক অতিরিক্ত বিশেষণ আছে, সে সর্বহারা। সুতরাং সামাজিক সংযোগ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। শ্রম-ব্যবসা তার জীবিকা। শ্রমিক হিসেবে সে দাস-শ্রমিক নয়, স্বাধীন শ্রমিক। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সে শ্রম দিয়েছে, 'শ্রম—যা জৈব দেহের —মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির কার্যকলাপ।' বঞ্চিত হয়েছে সে একইসাথে চিরকাল। একজন মুক্ত শ্রমিক, যে সমাজের যাবতীয় আচার থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত সেক্ষেত্রেই যেক্ষেত্রে সে সমাজের কাছে প্রয়োজনীয়। তার জৈবদেহ যখন শোষণে নিষ্পেষিত, তার মস্তিষ্ক কোন উদ্ভট ভাবরসে তথা ভাগ্যের পরিহাসের রহস্যে শান্তি খোঁজে না। তা যদি হত, তবে একজন রাজনৈতিক পরিচালকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত; পরিচালকের partisan হবার সুযোগ ও মার্কসীয় শিক্ষা ব্যর্থ হত। বরং ভেঙ্কায়া কিংবা তার মত একজন লক্ষ করবে বঞ্চনার ইতিহাস, সে বুঝতে পারবে তারই শ্রমে মুনাফা লুঠছে মালিক। কেননা মালিকের সম্পদের 'উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকের শ্রম-সময়ের জমাট রূপমাত্র।' '···যেখানেই সমাজের একটি অংশ উৎপাদনের উপকরণগুলির একচেটিয়া মালিক হয়, সেখানে শ্রমিক স্বাধীন কিংবা গোলাম যা-ই হোক না কেন, তাকে নিজের ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক শ্রম-সময়ের সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু বাড়তি শ্রম-সময় দিতে হয়।' শ্রমিকের শ্রম থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজি। কেননা 'প্রাকৃতিক সম্পদের কোন নিজস্ব মূলধন নেই। অর্থাৎ···স্থির মূলধন শূন্য।···উৎপন্ন মূল্য=শ্রমমূল্য+উদ্বৃত্ত।' অর্থাৎ শোষণের এই কুৎসিৎ রূপ সে ধরে ফেলবে। কাম—শ্রম তার কাছে হবে এক ভয়ংকর কল, যে কলে সে তথা একজন শ্রমিক নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত। এই কলে ধরা দিতে ঘৃণা হবে ভেঙ্কায়ার; তাই তার ছেলে কিষ্টাকে সে অভিজ্ঞস্বরে সাবধান করে দেবে, 'কামের কল পাতা আছে সংসারে, এমন কল—ঢুকলি কি মরলি।'

যাকে দিয়ে পরিচালক সমাজজীবনের শোষণের এক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়েছেন, তাকে দিয়ে পরিচালক তার প্রতিবাদও করাতে পারেন। না-ও করাতে পারেন। না-করালে পরিচালকের চরিত্র কিছু কলুষিত হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে করিয়েছেন। করাতেই হয়েছে, কারণ এখানে প্রতিবাদই গল্পের প্রাণ; শোষণের যে-রহস্যের কথা ভেঙ্কায়ার মুখে শুনি তা এই গল্পের শরীর—সেটা আগে থেকেই ছিল। তাই ছবির শুরুতেই সে-কথা শুনি। পরে যেটা আসছে, সেটাই আসল। অর্থাৎ প্রতিবাদ।

বঞ্চনার এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভেঙ্কায়া প্রতিবাদ জানায় কাজে যোগদান না-করে। পারতপক্ষে কাজ করতে চায় না সে। তার এই প্রতিবাদে সামিল হয় তার ছেলে

—যে তার মন্ত্রশিষ্য, কিষ্টা। কাজ না করে প্রতিবাদ জানানো যায়, কিন্তু খাদ্য জোটে না। ক্ষিধে পাবে, জৈবিক নিয়ম এটা। আর তাহলেই আবার ছুটতে হবে খাদ্যের সন্ধানে অর্থাৎ যোগ দিতে হবে কাজে। কাজে যোগ দিতে চরম ঘৃণা তার। অতএব, যতক্ষণ পারো ঘুমিয়ে থাকো, কিংবা 'জোয়ান-মরদ কিষ্টাকে ক্ষিধে জয় করা শিখতে হবে।' কিন্তু তবু কাজে যোগ দিতে হয়, দিতে হয় বাঁচার তাগিদে। বিস্তৃত মরুভূমির মতো এক মাঠ, শেষ হয় না মাঠ—যা এদের বঞ্চনার জীবনের মতো, এদের অসহায়তা আর রিক্ততার মতো ; তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে বাপ-বেটা কাজের খোঁজে। অর্থাৎ শোষণের ফাঁদে পা বাড়ায় বাধ্য হয়েই। শোষণ এবং প্রতিবাদ পাশাপাশি চলে। এ-নিয়েই তো গল্প, এখান থেকেই তো কাহিনীর শুরু। এই দৃশ্যেই পরিচয় লিপির ব্যবহার, সুতরাং, অনিবার্য।

২

খালি গা পরণে নেংটি বাপ-বেটা দু'জনেরই। সর্বস্ব-খোয়া প্রতীকী চেহারা। ভেঙ্কায়ার মাথায় শাদা কালো লম্বা চুল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মতো ঝুলে রয়েছে মুখের চারপাশে। মুখে তার চরম ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের ছাপ। এই দুটো—ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তার লড়াইয়ের অস্ত্র। এই দিয়ে সে মাঝে মধ্যে সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। সে লড়াই চলে কোন নির্জন প্রান্তে, অতি গোপনে, কখনোবা শুধু মনে মনেই। কখনো হঠাৎইবা সে আরও কোন ধারালো অস্ত্র আবিষ্কার করে ফেলে : 'জানোয়ার তাড়াতে (মানুষের) জানোয়ার হওয়া লাগে।' কিন্তু এই অস্ত্র সে বড়ো একটা ব্যবহার করে না। কেবল ভাবে সে। কেননা যতক্ষণ সে গোপনে প্রতিবাদ জানায় ততক্ষণ সে মোটামুটি নিরাপদ। এই প্রতিবাদ কারো স্বার্থে আঘাত করলেই সে আঘাত ফিরে আসবে তার গায়ে—এ-কথা ভেঙ্কায়া ভালোই জানে। সুতরাং ব্যঙ্গ কর, বিদ্রূপ কর সমাজটাকে। এবং তাও যথাসম্ভব গোপনে। কিষ্টার চুরি-করা আম খুব রসিয়ে খায় ভেঙ্কায়া, কারণ এ-তো তারই পরামর্শ—জানোয়ার তাড়াতে জানোয়ার হওয়া লাগে, অর্থাৎ তোমারটা যে চুরি করেছে তুমি তারটা চুরি কর। কেড়ে খাবার সাধ্য বা সাহস তার নেই, সুতরাং চুরি করার মধ্যেই এক চরম বিজয়ের পুলক বোধ করে ভেঙ্কায়া। আবার পঞ্চায়েত যখন কিষ্টার চুরির বিচার করতে বসে ; নির্বিকার শুনে যায় ভেঙ্কায়া বিচারের সিদ্ধান্ত। অদ্ভুত এই লোকটা। সমাজের অবিচারগুলি যতই সে ধরে ফেলে, কেমন একটা মজা পেয়ে যায় সাথে সাথে। কখনো মনে হয় যেন এক ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী সে ; সমাজটার, সমাজের মানুষগুলোর ভূত বর্তমান ভবিষ্যত যেন সব জেনে গেছে। মানুষগুলোকে অসার এই সমাজটার শিকার হতে দেখে যেন এক অদ্ভুত রস পেয়ে যায়। পঞ্চায়েতের বিচারের প্রহসন আর নতুন রঙ দেয় না। বিচারের অসারতার মধ্যে কোন

নব উপলব্ধির মজা পেল না ভেঙ্কায়া ; সে জানে পরক্ষণেই যখন কোন গরীব গৃহস্থের বাড়ি থেকে জমিদারের লোক জোর করে কোন 'বকরী' নিয়ে যাবে ভেট হিসেবে, তখন এই বিচারকেরা দরিদ্র গৃহ-বধুটিকে 'বিধাতার নিষ্ঠুর লীলা' কিংবা 'অদৃষ্টের ফের' ইত্যাদি বাণীতে এক আবেগবহুল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে। এ-সবের মধ্যে ভেঙ্কায়ার মতো এক অভিজ্ঞ সর্বহারা আর কোন মজা পায় না নতুন করে। নির্বিকার দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু বকরীর শোকে পাগলের মতো যখন চিৎকার করে অসহায়া মেয়েটি, সেই অকৃত্রিম কান্নার বহু-পরিচিত আবেগও তার মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি করে। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ভেঙ্কায়া। অর্থাৎ সেই শাণিত বিদ্রূপে সে জনমনুষ্যহীন এক প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এক তীব্র লড়াই বাধিয়ে দেয়। নিজের পরণের নেংটিটাকে অদৃশ্য শত্রুর দিকে বাড়িয়ে ধরে চিৎকার করে তাকে জিজ্ঞেস করে যে সে তার এই নেংটিটাকেও নিয়ে নেবে কিনা।

এইভাবে যেমন চলে শোষণ, তেমনি প্রতিবাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা আঁটে ভেঙ্কায়া, প্রতিশোধেরও—গোপন প্রতিশোধের, চুরির। এমনিতে লোকটা দার্শনিক ; মদ খেলে মুখ থেকে তার যেন তত্ত্বকথা বেরোয়। নেশার ঘোরে তার উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের কথা সশব্দেই ঘোষণা করে বসে সে। বলে ফেলে, 'যে কাজ (এমন কাজ) করে, সে আহাম্মক।' বাপের সিদ্ধান্তের সপক্ষে জনমত তৈরি করতে লেগে যায় কিষ্টা ; কারণ সে জানে তার বাপ যা বলেছে তা অকাট্য বাপের সাথে ছেলের মতের কোন পার্থক্য নেই। ছেলে যেন বাপের চরিত্র প্রকাশের সহায়ক। সমাজ ও সমাজবিরোধী বাপের মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। বাপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সে যেন ধীরে ধীরে সমাজের দিক থেকে সরে এসে বাপের দিকে ঝুঁকছে। অসহায় মানুষগুলোর প্রতি দরদ আছে ভেঙ্কায়ার। ফলে সে বুঝতে পারে, এখন নেশার ঘোরে সবাই তার কথা মানলেও কাল সকাল হলেই যখন পেটে টান ধরবে, 'সব ব্যাটা আহাম্মক বনে যাবে।' কিন্তু তা বলে সে তার এই নতুন উপলব্ধির কথাটা প্রচার করা থেকে বিরত হবে না, অন্তত যতক্ষণ তার নেশা আছে। এ এক মস্ত আবিষ্কার, মাতব্বরদের চালাকি ধরে ফেলে তাদের খুব ঠাকয়ে দেওয়া গেছে। সুতরাং মহাজনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সে যে আসল কথাটা বুঝে ফেলেছে তা জানিয়ে দেবার লোভ হল তার। কিন্তু অন্ধকারে নেশার ঘোরে দরজা খুঁজে পেল না। অর্থাৎ দরজা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিবাদ জানাবার পথ আসলে বন্ধ। সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে ভেঙ্কায়া বুঝত সে কথা। সেক্ষেত্রে সরবে প্রতিবাদ জানাবার লোক সে নয় ; অতটা আহাম্মক সে নয়। বরং প্রতিবাদ গুমরে মরত তার বুকের মধ্যেই, তাতেই তো যথেষ্ট তৃপ্তি পায় সে। যে প্রতিবাদ নিষ্ফল, তার মধ্যে এক নিজসৃষ্ট তৃপ্তি নিয়ে মশগুল থাকবে সে। তার বেশি সে কী করতে পারে। তার দার্শনিক জীবনের এক মহান উপলব্ধি 'আহাম্মক খেটে মরে, মাতব্বরে

খায়'—এটা সে আবিষ্কার করা মাত্র আনন্দে মশগুল। কিন্তু ওইটুকুই তো ; এ-কে প্রচার করে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব তার নয়। সমাজ সংস্কারক বা বিপ্লবী সে নয়। এক বিচারপ্রবণ মানুষ সে, প্রতিবাদী, হয়ত বা প্রতিশোধী। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সে লড়াইয়ের ময়দানে নয় ; যুদ্ধ চলে শুধু তার মস্তিষ্কে, বিবেকে। প্রকাশ্য প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের ক্ষমতা বা সাহস তার নেই, সুস্থ মস্তিষ্কের ভেঙ্কায়া। ভীরু, সতর্ক। মদ্যপ মাতাল যখন, গানও গেয়ে ফেলতে পারে সে তার প্রতিবাদের ভাষায়। এটা বিবেকের কথা, নেশার ঘোরে অসতর্ক মুহূর্তে স্বতস্ফূর্ত বেরিয়ে আসতে পারে। আবার গান গাইতে গাইতে যখন জমিদারের মুখোমুখি পড়ে যায়, ভীরু ও চতুর ভেঙ্কায়া মুহূর্তে নতজানু হয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করে। এটা তার বিবেকহীনতা নয়, লড়াইয়ের কৌশল। নিতান্ত একাকী যোদ্ধা অস্তিত্বের সাথে সাময়িক সমঝোতা করে।

শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেই সবটুকু মজা মেলে না তার। সুযোগ মতো তীক্ষ্ণ শ্লেষ ছুঁড়ে মারে বাণের মতো। ছেলের বিয়ে করার শখ হলে এবং ভাঙা চালা ঘরটিকে নতুন করে সাজাতে চাইলে আতঙ্কিত হয় ভেঙ্কায়া, কারণ পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন সামাজিক আপোষহীন জীবন তার, নিরাসক্ত তার কালাতিপাত—যেখানে বেপরোয়া সে, মুক্ত। নিজেকে প্রত্যক্ষ শোষণ থেকে যেন সে এভাবেই বাঁচিয়েছে। এমন জীবনে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ভয় পায় সে। এমন জীবনে শৃঙ্খলা তার কাছে সামাজিক শৃঙ্খল যেন, যেন দাসত্বের বন্ধন। অমোঘ অসহায়তায় ক্রমশঃ সমাজের প্যাঁচে জড়িয়ে যেতে চায় ছেলে—এ দেখে আশঙ্কিত হয় ভেঙ্কায়া। তার ভাঙা ঘরে ঈষৎ নতুনত্ব দেখে মোড়ল খুশি হয়। সে এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে বাঁচতে হলে মানুষের মতো বাঁচা চাই। অর্থাৎ ঘরটা ঠিক করার মধ্য দিয়ে তাদের বাঁচার যে আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাতে খুশি হয় মোড়ল। এরা বেঁচে না থাকলে শোষণ করবে কাকে ? মোড়লের খুশি হবার কারণ বোঝে ভেঙ্কায়া আর সাথে সাথেই এক তীক্ষ্ণ শ্লেষ বাণ ছুঁড়ে মারে যার আপাত লক্ষ্য কিষ্টা, কিন্তু মূল লক্ষ্য মোড়ল। সে ছেলেকে বলে, 'যা মানুষের মতো বাঁচগে যা।' আবার যখন ছেলের বউ নীলম্মার মুখে তার এই হতশ্রী সংসারটার মধ্যে এক শ্রী আনয়নের প্রতিজ্ঞা শোনে, অন্ধকারে—অর্থাৎ তার নিরাপদ ও নির্দিষ্ট জায়গায় বসে সে তখন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ছক্কা'। অর্থাৎ বেশ জমেছে খেলা। নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভেঙে যতই সে মুক্ত হতে চায়, আশ্চর্য প্যাঁচে শৃঙ্খলার অক্টোপাশ যেন জড়িয়ে ধরতে চায় তাকে। নিজেকে নিজের মুখোমুখি বসিয়ে যেন এক রহস্যময় বাঘবন্দী খেলায় মেতে ওঠে সে। বলে, 'ছক্কা।' অর্থাৎ শৃঙ্খলা তোমায় ছক্কা দিয়ে গিলে নিল। এবার তুমি বেরোও দেখি। নিজের এই পরাজয়ে হঠাৎ এক ভয়ংকর মজা পেয়ে যায়। একা একা খেলে যায় সে, বাঘবন্দী খেলা।

সাংঘাতিক প্রয়োজনে না পড়লে কাজ করে না ভেঙ্কায়া। মূলত নিষ্কর্মা সে। ফলে অঢেল সময় তার হাতে। সময় কাটে না তার। শুয়ে বসে ঘুমোয় আর ক্ষিধে জয় করবার অনুশীলন করে। কখনো বা সমাজবদ্ধ, কামের কলে ধরা পড়া মানুষগুলোকে দেখে; তার প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো অভিজ্ঞ মাথায় শাদা কালো পল্লবেরা বাতাসে এলো-পাথাড়ি ওড়ে; সমাজ ও জীবনে বৈষম্যের সহজ অঙ্কটা নিয়ে বসে যায় বাপ-বেটা; কিংবা একাই সে মুনাফা ও বঞ্চনার ওপরের কৃত্রিম ভাবাবরণটা ছিঁড়ে ফেলে মানুষের অসহায়তার রহস্যটাকে বের করে আনে, আর তক্ষুনি মেতে ওঠে অভ্যস্ত খেলায়। দৌড় প্রতিযোগিতায় জমিদারের বলদের গাড়িই যখন জেতে, বাজনা বাজিয়ে তার শোভা যাত্রা হয়। বাপ-বেটার তখন অঙ্ক মিলে গেছে। উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে এক তাণ্ডব বাঁধিয়ে দেয় যেন। এক মর্মন্তুদ প্রশ্নোত্তরের খেলা শুরু হয়ে যায়। উঁচু টিলার এক প্রান্ত থেকে বাপ প্রশ্ন ছোঁড়ে, অপর প্রান্ত থেকে উত্তর দেয় ছেলে।

বাপ : বাদ্যি-বাজনা কার ?

ছেলে : বাবুর।

পাইক-পেয়াদা কার ? বাবুর। ভূমি-জমি কার ? বাবুর। ফসল-গোয়ালা কার ? বাবুর। বলদ জেতে কার ? বাবুর।

প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে দু'জন 'বাবুর বাবুর' বলে। টিলার ওপর থেকে চিৎকার করে, যেন তাদের এই নতুন আবিষ্কারটা সমস্ত সমাজটাকে শুনিয়ে দিতে চায়। যেন মানুষগুলোকে সমাজটার ফাঁকি, বাবুর কাছে তাদের দাসত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক সাবধান বাণী ছড়িয়ে দিতে থাকে। কিংবা পড়ন্ত বেলায় বটগাছের ছায়ায় বসে-থাকা ভেঙ্কায়া কোন অসহায় চাষীকে যখন দেখে মাথায় করে ভেট নিয়ে চলেছে জমিদার বাড়ি, তার দার্শনিক মন নড়ে ওঠে, যেন জানে, এ তো অনিবার্য। নিজে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেয় সে : কী যায় ? চাল ? কোথায় যায় ? বাবুর বাড়ি ?

গর্ভবতী নীলম্মা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংসার চালায়। ভেঙ্কায়ার মতো সমাজবিদ নয় সে; অধিকার ও অবিচারের বিচার তার ক্ষমতার বাইরে। সমাজে তার নির্দিষ্ট কাজ করে যায় সে : শৃঙ্খলাবদ্ধ এই চরিত্রটি তার সংসারের লোক হয়েও তার মতবাদের শরীক নয়; বরং সমাজের দূতরূপে তার কাছে সন্ধির চুক্তি নিয়ে আসে। জমিদারের লোক ভেঙ্কায়াকে লাঠিপেটা করলে দাওয়ায় বসে-থাকা ধ্যানস্থ ভেঙ্কায়াকে নীলম্মা উপদেশ দেয় সমাজের আর পাঁচজনের মতো চলতে; তাহলেই আর লাঠিপেটা হতে হয় না। দিব্যি বেঁচে থাকা যায়। সন্ধির এই প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভেঙ্কায়া। এখানে প্রতিবাদ সশব্দ ও প্রকাশ্য হতে বাধা নেই, বিপত্তি নেই। দুর্বল এই মেয়েটার প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে ভেঙ্কায়া।

কিন্তু নীলম্মার প্রতি মমতাশূন্য নয় সে । প্রসব বেদনায় যখন মারা গেল নীলম্মা, ভেঙ্কায়ার তখন মনে পড়ে যায় একই ভাবে মারা যাওয়া তার নিজের স্ত্রীর কথা। অর্থাৎ মানুষের অভিন্ন যন্ত্রণার প্রতি কী অসীম মমত্ববোধ রয়েছে তার।

শোষণের প্রচণ্ডতা যত বাড়ে, ক্রমশঃ তার শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে ভেঙ্কায়া। সমাজের বিধিনিষেধ ততই ভাঙে সে। সমস্ত নীতিবোধ সংস্কার এক এক করে ঝেড়ে ফেলে সে চরিত্র থেকে। সমাজের আদর্শের অসারতা, ন্যায়ের শূন্যতা, ও জীবনের অনিত্যতা বুঝে ফেলে সে। বিচ্ছিন্ন জীবনে প্রজ্ঞার, উপলব্ধির ও বিবেকের মূল্য তার কাছে শূন্য হয়ে যায়। কাঙালীদের ভোজের আসরে উৎসাহভরে খেয়ে যায় সে। জমিদারের জয়ধ্বনি দিতে বাধে না তার। বরং সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহে তারস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে সে। তারস্বরে জয়ধ্বনি—যেন এখনও, সে খানিকটা ব্যঙ্গ করে নিতে ছাড়ে না। মহাজনের ক্ষেতের ফসল পাকলে 'সারা রাত ধরে চুরি' করার ফন্দি আঁটে দু'জন। এবং করেও। ফসলের ক্ষেতে রাতের নিরাপদ অন্ধকারে প্রতিশোধের ভয়ংকর আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে। ক্ষেতটাকে যেন ধ্বংস করে দিতে চায়। নীলম্মা মারা গেলে, বাপ-বেটায় এবার সমাজটার ওপর চরম প্রতিশোধ নেবার চক্রান্ত করে। অর্থাৎ ভিক্ষে করে তারা। সমাজটাকে যেন একটা চরম শিক্ষা দেবার জন্য দেখিয়ে দিতে চায় যে এই সমাজেরই এক সন্তান, দেখ, ক্রমশঃ ভিখিরিও হয়ে যায়। এখানেও দারুণ উৎসাহ ভেঙ্কায়ার, এই ভিক্ষে করায়। এক আশ্চর্য বিদ্রূপের হাসি তার মুখে, যেন আচ্ছা জব্দ করে দিচ্ছে এবার শত্রুটাকে।

আরও নিচে নামে কি তারা? সমাজের বুনিয়াদের গোড়ায় শেষ আঘাতটা হানে? সৎকারের জন্য ভিক্ষে-করা পয়সায় মদ খায় কি তারা?

গ্রামের সুপ্রাচীন বট গাছটার নিচে বসে দু'জন। ভেঙ্কায়ার মুঠো ভর্তি পয়সা। পৃথিবীতে বহু সমাজ বিবর্তনের সাক্ষী এই গাছ, তাই এটার নিচেই বসে তারা। এখানে বসেই ভেঙ্কায়া তার দার্শনিক জীবনের চরম উপলব্ধির কথা শোনাতে চায় ছেলেকে। এখন আর বিদ্রোহী—প্রতিবাদী নয় সে; বরং ক্লান্ত, পরাজিত। হাতের মুঠোয় পয়সা—মুদ্রা—'যা পণ্যের প্রতীক', যার ভেল্‌কিতে জমে উঠেছে পুঁজি, এসেছে বৈষম্য। অর্থ-নীতির ক্রীড়নক এই মুদ্রাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে পরাজিত ভেঙ্কায়া তার অভিযোগগুলি জানিয়ে দেয়। মাত্র তিনটি আর্ত দাবী রাখে সে: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এই তিনের সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সে আরও কিছু চায়, সামান্য কিছু কিন্তু মহৎ, চায় ভালোবাসা, চায় প্রিয়জনের পরমায়ু।

৩

মাও সে তুঙ্ একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিপ্লবের কথা বলতে গেলেই (নাটকের) চরিত্রগুলো কেমন খড়ের পুতুল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তারা ভালমন্দ মেশানো, পার্থিব সুখ দুঃখের শরীক ও দ্বন্দ্বময় খাঁটি মানুষ হতে পারে না। হয় তারা হয়ে ওঠে এক বিশুদ্ধ বিপ্লবী, নয় তো প্রতিক্রিয়াশীল। চরিত্রগুলো হয় নেহাৎ শাদা কিংবা কালো। তাকে মানুষ অভিজ্ঞতার নিরীখে বিচার করে বিশ্বাসযোগ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টি তখনি অসার্থক হয়ে যায়।

বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা শিল্পের প্রথম দায়িত্ব। 'ওকা উরি কথা'র সার্থকতা প্রথমত এখানেই। যে-চরিত্রগুলোকে অবলম্বন করে কাহিনী গড়ে উঠেছে, তারা সঙ্গত আচরণের বাইরে যায়নি। ভেঙ্কায়াকে কখনোই একজন খাঁটি বিপ্লবী করে দেওয়া যায় না। তাকে কখনোই প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ দেখা সম্ভব নয়। একটা নিষ্কলুষ ভালো মানুষ সে হতে পারে না। ভাববাদের ছয় রিপু তার মধ্যে থাকবেই। যতটা সে জয় করতে পারে তা কেবল অনুশীলনের মাধ্যমে। দ্বন্দ্বময় সে হবেই। যতটা সে শিক্ষা লাভ করতে পারে, তা কেবল তারই অভিজ্ঞতার ফল। যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজের শিকড়ে আগে বাঁধতে হবে তাকে। এক ভিন্ন জগৎ বা সভ্যতা থেকে হঠাৎ এসে সে বিপ্লবের বা সমাজ-দ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরতে পারে না। বিচারে যেমন সে জিততে পারে লড়াইয়ে তেমনি সে হারতে পারে। লড়াইয়ে যেমন জিতবে, বিচারে তেমন ভুল করবে। সে সব মিলিয়ে ততটাই করবে, যতটা সে তার অবস্থায় মানসিকতায় বুদ্ধিতে সুযোগে করতে পারে। প্রতিবাদ করবে, আপোষও করবে ভেঙ্কায়া। কারণ সে বাধ্য। সমাজ যুদ্ধে সৈনিক না সে, ব্যাখ্যাতা মাত্র। তাও আবার অশিক্ষিত গ্রাম্য ক্ষেতমজুর। জীবন্ত এই ভেঙ্কায়া। মাটির মানুষ, বিশ্বাসযোগ্য মানুষ।

বিশেষ সমাজের পটভূমিতে নির্দিষ্ট চরিত্রটি যখন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, তাকে সমাজ সংকটের মুখে ফেলে শিল্পী তাকে দিয়েই সংকটের বীজটাকে বের করে আনেন। এটা শিল্পীর বাড়'ত পাওনা। এখানে তার দ্বিতীয় সার্থকতা: ভেঙ্কায়ার উপলব্ধিসকল পরিচালকের পরিশ্রমের পুরস্কার। ভেঙ্কায়া কী উপলব্ধি করবে—এ-টা পরিচালকের হাতে অর্থাৎ কী ফসল তিনি চান ওই জমি চাষ করে। 'ওকা উরি কথা'র সার্থকতা এই যে, ভেঙ্কায়াকে দিয়ে সমাজের যে বিচার করানো হয়েছে তা বিপ্লবাত্মক। 'একটি গ্রামের কাহিনীর' পর্যায়ে না থেকে, এই কাহিনী শোষিত সমাজের নগ্ন চেহারা দেখিয়ে সমগ্র শোষিত সমাজের প্রতীক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে গ্রামটা সমাজ হয়ে ওঠে। ভেঙ্কায়া সেই সমাজটার বিরুদ্ধে এক জীবন্ত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদী চরিত্রটিকে অবলম্বন করে সমাজ-সমস্যার যে গভীরতায় পরিচালক পৌঁছেছেন, তা শোষিত সমাজের প্রাচীন সমস্যা।

সমস্যা প্রাচীন হলেও তা নির্ণয়ে ও ব্যাখ্যায় যে সফলতা পরিচালক অর্জন করেছেন তা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ইতোপূর্বে অভাবনীয় ছিল। তার আবেদন আন্তর্জাতিক।

ছবিটি দেখে যখন হল থেকে বেরোলাম, মনে আছে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি বাক-শক্তি-রহিত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক পরে আমার এক বন্ধুর কাছে মন্তব্য করেছিলাম, এই ছবিটি ভারতবর্ষের গর্ব। বলেছিলাম ভেক্কায়া চরিত্রে বাসুদেবরাও এক যুগন্ধর শিল্পী। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ওপর পরিচালকের দখল আমাকে বিস্মিত করেছিল, একটা ছবিতে এমনসব কাণ্ড করা যায় তা অবিশ্বাস্য ছিল। ছবিতে একটি মন্তাজকে মনে হয়েছিল, চলচ্চিত্র মাধ্যমটির জন্য একটি নতুন অলংকার। এ-টি এমন একটি ছবি যার এক একটি অংশকে নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব। বড় কষ্ট হয় ভেবে যে এই ছবিটি কলকাতার বহু দর্শক এখনো দেখতে পেলেন না।

অশনি সঙ্কেত / রোমান্টিক মন্বন্তরের কবিতা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

অভিযোগ শুধু তোমারই জন্যে, আজন্ম পেলে মাল্য —সংযোগী/বিষ্ণু দে

সূচনায় বক্তব্য এই যে শিল্পেও আছে নানা স্তর এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পীকে আমি মহা-মহিমান্বিত বলেই জানি। আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যসমূহ, অতএব, সেরকম পরি-প্রেক্ষিতেই।

সাধারণত সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রথম সপ্তাহে দেখতেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। ইতিমধ্যে একদিন সহসা দেখা হয় প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে “অশনি সঙ্কেত দেখেছ? বাংলাদেশ যে এ্যাত সুন্দর আমি জানতাম না।” অশনি সঙ্কেত একটি মন্বন্তরের সূচনা—আমার দেরী হয়ে যায়। দেখবার পরেও আমি বেরিয়ে আসি নিরুদ্বেগ। সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চারণ করতে পারি প্রশংসাসূচক বাক্য; বিশেষণ; তাও আসে সিলেবল ভাগ করা—বিউটিফুল। অথচ পথের পাঁচালি বা অপরাজিত বা চারুলতার পর তো এরকম হয় নি। সেখানে বিনয় ছিল স্তব্ধ হওয়ার মতো অবসর ছিল প্রচুর, সমুদ্রসমীপে সরল শিশু যেমন।

আলপনার মতো, পটের ছবির মতো সুহাস্য। এই বাংলার মুখ ঢেকে দেবে একদিন মুক্তকেশী অন্ধকার। সত্যজিৎ রায় সেই সমস্যাকে একটি নরম লিরিকে রূপদান করলেন।

কবিতাতে আমাদের আপত্তি নেই, সৌন্দর্যতেও না। ভয়াবহতম সামাজিক বিপর্যয়ও কবিতার জন্ম দিতে পারে। ওয়েস্টল্যাণ্ড বা সাতটি তারার তিমির না হলে লেখা হল কি করে? এমনকি বোদলেয়ারের শবদর্শনও সুন্দর। সুন্দর, কেননা সেখানে—রিলকের ঈষৎ সাহায্য নিয়ে বলব "দি বিউটিফুল ইজ নাথিং বাট দি বিগিনিং অফ দি টেরিবেল, হুইচ উই আর ষ্টিল জাষ্ট এবেল টু এনডিওর।" আমাদের ইতিহাসের এক ন্যুব্জ মুহূর্তে সত্যজিৎ সৌন্দর্যের স্থানাঙ্ক নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছেন। অশনি সঙ্কেত কোন সময়ই মর্মান্তিক নয়, মারাত্মক বা বিপজ্জনক নয় যে লোকালয়গুলি বিশ্লিষ্ট হওয়ার পর আমি একাকী।

সে কারণেই এই ছবি বহির্মুখী। শিল্প জীবনকে গভীর ভাবে পুনর্গঠিত করে কিন্তু এই কি সত্যজিৎবাবুর লোকপ্রসিদ্ধ ইনওয়ার্ড টারনিং? ঋত্বিকবাবু দেশবিভাগের সমস্যাকে আর্কিটাইপীয় রীতির মাধ্যমে এথিকসে প্রসারিত করলেন: ঈশ্বর পতিতালয়ে খুঁজে পায় সীতাকে—সেখানে গভীরতম রক্তবিন্দুর হাহাকার। আর এখানে? একটি ব্রাহ্মণ বধু ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে বা একটি গ্রাম্য প্রাণী শরীর বেচে দিল। নিতান্তই ঘটনা। যেন স্রষ্টা যুক্ত হচ্ছেন না। দূরাবলোকন। আর চ্যাপলিন বলেছিলেন সামীপ্যের জীবনই হল ট্র্যাজেডী। সরাসরি বলা যাক এই ছবি আবার কালচেতনার (মাত্র তিরিশ বছর আগের বাস্তব) অপপ্রয়োগ; দেশ-কাল নিরপেক্ষ মানুষের মৌল অস্থিগুলির পুনর্বিন্যাসে কোন মহাকাব্যিক সম্ভ্রম দাবী করতে পারে না। এমন কি সত্যজিৎবাবু, আপনিও কি বিস্মৃত হয়েছেন পথের পাঁচালি ও অপরাজিতর সেই সব মহৎ মৃত্যু? মতির মৃত্যু দেখে জীবনানন্দের বিভিন্ন কোরাসের মত আমরা "আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে" হই নি। কারণ এখন আপনি একসট্রোভার্ট: জীবনের প্রতিরূপ মাত্র। হায় প্রত্যাশা!

ধারণা ছিল সাঙ্কেতিকতাই তাঁর প্রাণ। নিঃশব্দতাই তাঁর ভাষা। জানতাম মালার্মের মত তিনিও বিশ্বাস করেন—টু সাজেষ্ট ইজ টু ক্রিয়েট, টু নেম ইজ টু ডেস্ট্রয়। অশনি সঙ্কেতের সমাপ্তিতে ১৯৪৩ সালের এই দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি জানান কেন তাহলে? (প্রসঙ্গত মনে আসছে শ্রী মৃণাল সেনের কলকাতা-৭১ ঘোষণার জন্য বুর্জোয়া শিল্পাঞ্চলে প্রচুর ত্রাসের সঞ্চার করে)। সত্যজিৎ রায় কি কনফিডেন্ট নন যে দর্শকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। জোতদারের সামনে আলোচনায় চালের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে ভাবা হয়েছে; তাঁর নায়ক পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে ভারতীয় কৃষিসমস্যার কেন্দ্রীয় প্রশ্নটিতে আলোকপাত করতে চেয়েছে নিজস্ব গ্রাম্য ধরণে। তারপরেও যদি সত্যজিৎ রায় ঘোষকের ভূমিকায় নামেন (এই ছবিতে তাঁকে স্বভাববিরুদ্ধ লিপিচিত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে প্রায়শঃই)—তবে তো ব্যর্থতা স্বতঃ প্রমাণিত।

কথাটা অন্যভাবেও ভাবা উচিত আমাদের যেহেতু পলিটিক্যাল। প্রথমত ১৯৪৩

কেন ? পরিচালক কি আশ্বাস দিচ্ছেন যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বিষয়ক নানাবিধ ক্ষোভ ও শহরের পথে হঠাৎ শতচ্ছিন্ন আগন্তুক দেখে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই ; পঞ্চাশের মন্বন্তর অনেকদিন আগে ঘটেছিলো—এটা তো ১৯৪৩। দ্বিতীয়ত দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। (যেন অন্য অন্য সালের অন্য অন্য দুর্ভিক্ষ ভগবানের দান)। সত্যজিৎ রায়কে কি আমি গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করব যিনি বলেছিলেন বিহারের ভূমিকম্প মানুষের পাপের ফলাফল ? অশনি সঙ্কেতের স্রষ্টা আমার থেকে অনেক ভালো করে জানেন মানুষ শব্দের এমন সর্বব্যাপক প্রয়োগ তাঁকে বড়োজোর পুরোন বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের দলভুক্ত করবে। বিশেষণহীন মানুষ সম্ভব নয়। বস্তুত সারা ফিল্ম জুড়ে কোন সময় কোন শ্রেণী বা বৃটিশ সরকার তো দূরের কথা, একটি মুখও দেখা গেল না যার সম্বন্ধে রিরংসাপ্রবণ হওয়া যায়। যাও বা একটি নির্বান্ধব জোতদার চোখে এল সেও মন্বন্তরের সূচনাতেই শাস্তিপ্রাপ্ত। প্রকৃতি ও জীবনের অব্যাহত প্রবাহ, প্রজাপতি উড়ছে, স্ত্রী-চিহ্ন সদৃশ মাছের টুকরো ইঙ্গিতময়, উড়োজাহাজ ও ঢেঁকিচালনা অর্থাৎ বম্বার্ডমেণ্ট, বিবিধ রঙিন দৃশ্য, সুবেশা তরুণী শত বসন্ত তাদের শরীরে অক্ষয় হয়ে আছে—আর কি সমাজ সচেতন সত্যজিৎ রায় 'সত্যযুগ' নামক বামপন্থী দৈনিকের শিরোনামে থাকেন 'যুগোপযোগী' চিত্রের নির্মাতা রূপে। নিঃসন্দেহে এই ছবি তাঁকে হলদে আন্তর্জাতিকের প্রকৃত সদস্য হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে।

আমার সিদ্ধান্ত—

(ক) গদার যেজন্য আন্তোনিওনির সম্প্রতি প্রদর্শিত ছবিটিকে রিঅ্যাকসনারী বলেন তার থেকে অনেক বেশী উদারতার মধ্যে থেকেও সত্যজিৎ উদ্দেশ্যমূলক প্রতিক্রিয়াশীলতায় লিপ্ত। কারণ তাঁর পক্ষে শ্রেণীনির্দেশ হয়ত সম্ভব ছিল, অন্ততঃ বর্তমান শাসকদল ১৯৪৩ এ রাজনৈতিক ক্ষমতা পায় নি।

(খ) যেহেতু অশনি সঙ্কেত বীভৎসতা ও পাপ বিষয়ে আমাদের সচেতনতার সারবস্তু নয়। সুতরাং অসুন্দর।

(গ) অস্তিত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান আবার নতুন করে শুরু করা উচিত—এরকম কোন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে না। সুতরাং অগভীর। উপরিতলের কাব্য কেননা প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে জাত নিয়ামক শক্তিসমূহ যা অন্তর্গত, তার রূপান্তরকে জড়িয়ে রাখেনি।

(ঘ) জায়মান সর্বনাশ কি কখনো এত নিপুণ হয়—পল সেজানের ল্যাণ্ডস্কেপের মত এমন শান্ত ? বং এ ছবিকে মায়াময় করেছে, সাদা-কালোতে হয়ত বিদীর্ণ হতে পারত পর্দা। নৈপুণ্য ও শান্তি অশনি সঙ্কেতকে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে।

আসলে সত্যজিৎ রায় ঝুঁকি নিতে আর সাহসী নন। আসলে অপরাজিত ছাড়া আর কোথাও সত্যজিৎ রায় আধুনিক নন। এবং একদা হয়ত বলবে আমাদের সন্তান-

সন্ততিরা যে মর্মে প্রোথিত কালজ্ঞানের ইসারায় ঋত্বিক কুমার ঘটক, অসঙ্গতি সত্ত্বেও, অসংলগ্নতা সত্ত্বেও, উৎকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও, শিল্পের যে মহান প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, অপরাজিত ছাড়া অন্যত্র, সত্যজিৎ রায়, সমসাময়িকতার চিত্রণে তাঁর সাক্ষাৎ পান নি।

পুতুল নাচের ইতিকথা যে নোবেল পুরস্কার পায়নি তা সুইডিস রাজতন্ত্রেরই দুর্ভাগ্য, মানিকবাবুর নয়। পৃথিবী নামের এই গ্রহ যে সত্যজিৎবাবুকে সম্মানিত করতে পেরেছে, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবু অশনি সঙ্কেত দেখে কেন যে মনে হয় ভিক্টিমাইজড হওয়ার প্রয়োজন বোধহয় আছে। গোল্ডেন বিয়ারের প্রতি আমার অভিযোগ নয়; অভিযোগ যে স্বদেশে অন্ধ স্তব ও বিদেশে পুরস্কার তাঁকে নিজস্ব অন্তপরীক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। হল থেকে বেরিয়ে এসে আমি আড্ডা মারি; খুব স্বাভাবিক হয় রাতের খাওয়া ও এখন লুই বুনুএলের একটি বিবৃতি আমায় বিছানায় টেনে আনে—অবশ্য এ মুহূর্তে আমরা শান্তিতে ঘুমোতে পারি, কেননা চলচ্চিত্রের দৃষ্টিকে বেশ করে ওষুধ খাওয়ানো আর বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুনশ্চ :—ওয়ার্ডসওয়ার্থের থেকে অনেক বড় একজন কবি আমাদের শতাব্দীকে যিনি শাসন করতে পেরেছেন—তাঁর ট্রাডিসান এণ্ড ইনডিভিডুয়াল টেলেণ্ট লেখাটি পড়বার পর ইমোসন রিকলেক্টএড্ ইন ট্রানকুইলিটিতে আমার আস্থা নেই এবং এই প্রথম সত্যজিৎবাবুর নায়িকা নির্বাচন প্রশ্নাতীত হল না—কবিতা বেশ সফিসটিকেটেড।

বার্থ অব এ নেশন

সোমেশ্বর ভৌমিক

সিনেমা-কলার ইতিহাসে প্রথম ক্লাসিক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯১৪ সালে তৈরি ছবি—ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথের 'বার্থ অব এ নেশন'।

লোকজনের ধারণায় সিনেমা তখন এক মজার খেলা। কিছু অতি-উৎসাহী যন্ত্রবিদের খামখেয়ালী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম। কয়েক মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে সিনেমা দেখত মানুষ। সেলুলয়েডের বুকে একই সঙ্গে চিন্তার উপাদান এবং শৈলীর সৌষ্ঠব তখনও অজ্ঞাত। এরই মধ্যে ফ্রান্সে জর্জে মেলিয়ে বিচিত্র কারিগরি কৌশলে গড়ে তুলেছিলেন চমকপ্রদ এক রূপের জগৎ, যেখানে মুহুর্মুহু বিস্ময়ের ছটা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন এডউইন পোর্টার। নানা বাস্তব উপাখ্যানকে নাটকীয় ভঙ্গীতে রূপায়িত করতেন তিনি। চলচ্চিত্র-ব্যাকরণের প্রথম সুসংবদ্ধ রূপটি পোর্টারই দিয়েছিলেন। একটি

দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব অনুযায়ী 'ক্লোজ শট', 'মিড শট' বা 'লং শট'-এর ব্যবহার অথবা 'প্যানিং' নামক ক্যামেরা ঘোরানোর কৌশল তাঁরই উদ্ভাবন। আবার সম্পাদনার সাহায্যে বিভিন্ন খণ্ডদৃশ্য বা শটকে একটি সুসংহত বক্তব্যে গ্রথিত করার কাজেও পথিকৃৎ পোর্টার। তবে এই দুজনের উদ্ভাবনীক্ষমতা ও দক্ষতা যতই থাক, কল্পনার বিস্তার এঁদের ছিল না। সিনেমায় দৃশ্যগত আবেদনের বাইরে এমন কোন সূক্ষ্ম সংবেদন তৈরিতে সফল হন নি তাঁরা, যাতে দর্শকের বোধ, অনুভূতি ও কল্পনার রাজ্যে ওঠে তীব্র আলোড়ন

অনাস্বাদিত সেই গভীরতা সিনেমায় প্রথম নিয়ে এলেন গ্রিফিথ, তাঁর 'বার্থ অব এ নেশন' ছবিতে। এখানে পরিচালকের উদ্ভাবনীক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে তাঁর মনন। পোর্টারকে যদি বলি সিনেমার প্রথম বৈয়াকরণ, গ্রিফিথ তাহলে সিনেমার জগতে প্রথম সাহিত্যিক। মেলিয়ে-পোর্টার উদ্ভাবক, গ্রিফিথ স্রষ্টা।

'বার্থ অব এ নেশন' গ্রিফিথের প্রথম ছবি নয়। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে প্রায় সাড়ে চারশ ছবি করেছিলেন তিনি। সেইসব ছবিতে আঙ্গিক নিয়ে কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, ইয়ত্তা নেই তার। এটা তাঁর 'শিক্ষানবিশির সময়'। এবং তখন এক কোম্পানী মালিকের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে হয়েছে তাঁকে।

দাসত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে স্বাধীন প্রযোজনায় গ্রিফিথ আত্মনিয়োগ করলেন এই 'বার্থ অব এ নেশন' ছবিতেই। নিজের আবেগ ও মননের সবটুকুই দিলেন উজাড় করে। ছবির নির্মাণ ও সংগঠনের সমস্ত দিক নিয়ন্ত্রণ করেছেন গ্রিফিথ স্বয়ং। এমনকি ছবির জন্য প্রয়োজনীয় সেট তৈরির কাজটিও তিনি ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছিলেন। শুটিং চলেছিল চার মাস। এর মধ্যে প্রথম ছ-সপ্তাহ অভিনেতাদের মহলা দিইয়েছিলেন গ্রিফিথ। ছবিতে অসংখ্য চরিত্র। একই অভিনেতাকে দিয়ে অনেকগুলি চরিত্র অভিনয় করিয়ে গ্রিফিথ লোকসমস্যার সমাধান করেছিলেন। লিঙ্কন চরিত্রের অভিনেতা জোসেফ হেনাবেরির স্মৃতিচারণে জানা যায়, এই ছবিতে তিনি আরও তেরটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

ছবির পটভূমি ১৮৬১-৬৫ সালব্যাপী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে ঐক্যপন্থী উত্তরাঞ্চল ও জেফারসন ডেভিসের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাকামী দক্ষিণাঞ্চলের এই সংঘর্ষে দক্ষিণাঞ্চল পরাজিত হয়েছিল। বিজিত পক্ষের এক শ্বেতকায় জমিদার পরিবার এবং সেই পরিবার-সংশ্লিষ্ট দুই জোড়া প্রেমিকের জীবনে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া নিয়েই গড়ে উঠেছে ছবির আখ্যানভাগ। এরই পাশাপাশি গ্রিফিথ অকপটে প্রকাশ করেছেন মার্কিন জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা। প্রাসঙ্গিক বোধেই তাই ছবিতে এসেছে লিঙ্কন-হত্যা, দক্ষিণের

তুলো-কেন্দ্রিক সামন্ত-অর্থনীতি, উত্তরের পুঁজিবাদী বিকাশ, দাস-মজুর ও 'স্বাধীন'-মজুরদের তুলনা, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রক্রিয়া, চরমপন্থী 'কু ক্লুক্স্ ক্ল্যান'-এর অভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়। বিষয়ের এই বিস্তার একমাত্র কথাসাহিত্যের সঙ্গেই তুলনীয় আর সেই তুলনায়ও উপন্যাসের কথাই মনে আসে উপমান হিসেবে।

মূল অবলম্বনও ছিল একটি উপন্যাস—টমাস ডিক্সনের 'দ্য ক্ল্যান্স্‌মেন'। ছবির নামও প্রথমে ছিল 'দ্য ক্ল্যান্স্‌মেন'। পরে গ্রিফিথ সে-নাম বদলে দিয়েছিলেন।

সাহস ছিল বলতে হবে গ্রিফিথের। সমসাময়িক রীতি যেখানে পাঁচ বা ছয় রীলের ছবি তোলা, 'বার্থ অব এ নেশন'-কে গ্রিফিথ করলেন বারো রীলের ছবি। ছবির সময় গিয়ে দাঁড়াল প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টায়। ছবি তৈরি করতে লেগেছিল এক লক্ষ ডলারের বেশি অর্থ—সে যুগে এক অভাবনীয় অঙ্ক। কিন্তু এই বিরাট ঝুঁকির সার্থকতা বিষয়ে সমস্ত সন্দেহকে অমূলক প্রমাণ করে কয়েক মাসের মধ্যেই এ ছবি থেকে আয় হয়েছিল এক কোটি আশি লক্ষ ডলার।

কোন লিখিত চিত্রনাট্য বা সুপরিকল্পিত শুটিং-স্ক্রিপ্ট ছাড়াই এ-ছবির কাজ হয়েছিল। অবশ্য এটাই ছিল হলিউডের সমসাময়িক রীতি। তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রকাশের তাগিদটাই যেখানে মুখ্য সেখানে বিস্তারিত পূর্ব-পরিকল্পনার দরকারই বা কী? কিন্তু 'বার্থ অব এ নেশন'-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ত তা নয়। এখানে আছে একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য, ব্যাপক পটভূমি এবং অসংখ্য খুঁটিনাটি। তবু কোন পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন বোধ করেন নি গ্রিফিথ।

পরিচালকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সম্পাদনার কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, ছবিতে মোট এক হাজার তিনশ পঁচাত্তরটি শট ব্যবহার করা হয়েছে।[১] মনে হয়, অন্যূন দুহাজার শট নিয়েছিলেন গ্রিফিথ তাঁর সমগ্র শুটিং পর্বে। তদানীন্তন হলিউড প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে এ এক বিপ্লব। চলচ্চিত্র-ক্যামেরার গতিশীলতাকে কীভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন, এর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, সেই প্রথম যুগের ক্যামেরা এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি শুধু যে ভারিই ছিল তা নয়, তাদের সুযোগসুবিধেও ছিল সীমাবদ্ধ। গ্রিফিথের সমসাময়িক পরিচালকদের প্রায় সকলেই তাঁদের ছবির প্রতিটি শটকে যথাসম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করতেন, যাতে একটি শটের মধ্যেই কোন ঘটনার পুরোটা ধরে রাখা যায়। ফলে পাঁচ, ছয়, এমন কি দশ মিনিটের শটও সে-যুগের ছবিতে খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু 'বার্থ অব এ নেশন'-এ প্রতিটি শটের স্থায়িত্ব গড়ে সাত সেকেণ্ড। এটা অবশ্য নিছক পাটিগণিতের হিসেব। পৌনে তিন ঘণ্টার ছবি মানে ন হাজার নশো সেকেণ্ডের ব্যাপার [১৬৫ × ৬০ = ৯৯,০০]। সেকেণ্ডের সংখ্যাকে ব্যবহৃত শটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা পাব প্রতিটি শটের গড় স্থায়িত্ব

[৯৯,০০ ÷ ১,৩৭৫ = ৭··] । কিন্তু ছবির প্রতিটি শটই সাত সেকেণ্ডের মতো স্থায়ী হয়েছিল, এরকম ভাবা ভুল হবে । এদেরই মধ্যে কোন-কোনটা নিশ্চয়ই ছিল আরো অনেক কম সময়ের শট, আবার কোনটা একটু বেশি সময়ের । তবে সাধারণভাবে যে ছোট ছোট শট নিয়েই গ্রিফিথ কাজ করেছিলেন, অঙ্কের হিসেব থেকে তা পরিষ্কার।

ঘটনার ক্রিয়াকে বিশেষ একটি ভাবের বাহক করার ওপরেই গ্রিফিথ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একটি ঘটনার সবটুকু দেখানোর কোন তাগিদই তাঁর ছিল না । অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করে ঘটনার অপরিহার্য ও ইঙ্গিতবাহী কয়েকটি টুকরো তিনি বেছে নিয়েছিলেন । প্রতিটি দৃশ্যের অলংকরণ ও বিন্যাসে ছিলেন অসাধারণ মনোযোগী । ফলে কোন ক্রিয়ার অংশবিশেষ রূপায়িত হলেও প্রতিটি দৃশ্যেই এলো কোন-না-কোন ব্যঞ্জনা। অল্প কথায় বলা হলো অনেক কিছু । শটের মধ্যে এই সংহতি (compression) চলচ্চিত্রভাষায় এনে দিলো অভূতপূর্ব স্বচ্ছতা ।

ছোট ছোট শটের সংহতিকে গ্রিফিথ লাগালেন ভাববিস্তারের কাজে। ছবিতে দৃশ্য পরম্পরায় একটা সাংগীতিক বিন্যাস, একটা সুন্দর ছন্দ তিনি তৈরি করলেন । এ-কাজে মার্গ-সংগীতের সংগঠন-রীতিকেই অনুসরণ করলেন গ্রিফিথ। এই সংগীতে যেমন তাল, ফাঁক, লয় এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার হয় ভাববৈচিত্র্যের মাধ্যম হিসেবে, 'বার্থ অব এ নেশন'-এও বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন ভাবসম্বলিত দৃশ্য পর পর সাজিয়ে গ্রিফিথ তাঁর বর্ণনায় শুধু গতির সঞ্চারই করলেন না, তাতে যোগ করলেন ছন্দ, বিষয়বস্তুর নাটকীয় উপাদানকে যা আরও অপূর্ব করে তুললো ।

এই সম্পাদনরীতি গ্রিফিথ ব্যবহার করেছিলেন বিষয়বস্তুরই বিশেষ প্রয়োজনে। দৃশ্যগুলো যাতে নিছক সাংবাদিকের বর্ণনা না হয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য ছিল তাঁর। দৃশ্য-বিন্যাসের এই ভঙ্গীটি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল । কুলেশেভ, আইজেনস্টাইন, পুদোভকিনের হাতে যে মন্তাজপদ্ধতির পূর্ণবিকাশ, 'বার্থ অব এ নেশন' সম্পাদনার সময়েই তার বীজ রোপণ করেছিলেন গ্রিফিথ ।

দৃশ্য পরম্পরায় সাংগীতিক ছন্দ তৈরি করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি । সুরকার জোসেফ কার্ল ব্রাইলের সহযোগিতায় ছবির সঙ্গে অর্কেষ্ট্রায় বাজানোর জন্য আবহসংগীতের একটি খসড়া তৈরি করে বিভিন্ন সিনেমা হলে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । সার্থক চলচ্চিত্র-সংগীতের বিকাশে এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই খসড়ায় বেঠোফেন, ভাগনার, লিৎস্ট, রোজিনি, ভের্দি, চাইকভ্স্কি প্রভৃতি দিকপাল স্রষ্টার ধ্রুপদী কীর্তির পাশাপাশিই ঠাঁই পেয়েছে সুপরিচিত মার্কিন লোকসংগীতের বিভিন্ন অংশ, তাছাড়াও গ্রিফিথ ও ব্রাইলের কিছু নিজস্ব সৃষ্টি ।

কিন্তু সংগীত (এবং সংলাপ) তখনও সিনেমার অত্যাবশ্যক উপাদান হয়ে ওঠে নি।

আরোপিত এই শব্দ সংযোজনা বাদ দিলে, 'বার্থ অব এ নেশন'-এ দৃশ্যের ভূমিকা মুখ্য। সেই ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিল বিলি বিটজারের ক্যামেরা, অবশ্যই গ্রিফিথের সতর্ক তত্ত্বাবধানে। পেন্টিং-এর আলোছায়ার ব্যঞ্জনা আর ফটোগ্রাফির রিয়ালিজ্‌ম্‌ মিলিয়ে তৈরি হলো রূঢ় বাস্তবের অনির্বচনীয় রূপ। তাকে আরও জোরালো করলো ক্যামেরার কোণ এবং অবস্থানের কিছু অসাধারণ ব্যবহার। বক্তব্যের নাটকীয়তা দৃশ্যে ফুটিয়ে তুলতে ক্যামেরার ব্যবহারও হলো নাটকীয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

আটলান্টায় চূড়ান্ত সংঘর্ষের দৃশ্য শুরু হচ্ছে শান্ত এক গ্রাম্য পরিবেশে। তরুণী মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে বনভোজন করছে গাঁয়ের ধারে পাহাড়ের কোলে। হঠাৎ চোখেমুখে তাদের উদ্বেগ! তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যামেরা প্যানিং শুরু করলো। একটু নীচে মালভূমিতে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর ওপরে এসে তা স্থির হলো। আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ কাজ। কিন্তু সমাহিত গ্রাম্য পরিবেশ এবং উত্তেজনামুখর যুদ্ধপ্রস্তুতির বিষয়গত বৈপরীত্যে যে নাট্যরসের উদ্ভব, ক্যামেরার এই নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গী তাকেই আরও ঘন করে তুললো।

এই ছবিতে ক্যামেরার কাজে বা সম্পাদনায় গ্রিফিথ কিন্তু আনকোরা নতুন কোন প্রয়োগরীতি নিয়ে পরীক্ষা চালান নি। এখানে ব্যবহৃত সমস্ত কৌশলই তাঁর হাতেখড়ির বছরগুলোয় তৈরি বিভিন্ন ছবিতে পরীক্ষিত। লং শটে পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পরই ক্লোজ শটে সেই দৃশ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি দেখানো, চলন্ত গাড়িতে ক্যামেরা বসিয়ে দ্রুত-সংঘটনের ছবি তোলা, ঘটনার সমান্তরাল বিকাশের স্বার্থে ক্রস-কাটিং, র‍্যাপিড-কাটিং—প্রযুক্তিগত স্তরে এদের প্রত্যেকটির সার্থকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল বলেই শিল্পরূপ গঠনের উপাদান হিসেবে এদের ব্যবহার করেছিলেন গ্রিফিথ। যা ছিল নিছক কারিগরি কৌশল, এ ছবিতে তা-ই হয়ে উঠলো গভীর ভাব প্রকাশের মাধ্যম, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ উপস্থাপনারীতি—চলচ্চিত্রভাষার অপরিহার্য সম্পদ। কোন দৃশ্যের রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা হয়ে উঠলো বিশিষ্ট। এবং সেইসব নির্দিষ্ট ভূমিকায় আজও এরা সমান সফল।

প্রথম থেকে শেষ অবধি এ-ছবির অনন্য শৈলী দর্শকের অনুভূতিতে তীব্র আলোড়ন তুলতে সক্ষম। কিন্তু গ্রহীতার আবেগকে জাগ্রত করাই ত শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; গ্রহীতাকে সুস্থ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করাও শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে 'বার্থ অব এ নেশন' এক নেতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করেছে। অত্যন্ত উন্নতমানের আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়েও এ-ছবি এমন এক চিন্তাধারার বাহক হয়ে রইলো, যাকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া অন্য কোন অভিধাতেই চিহ্নিত করা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে হয়তো যুদ্ধবিরোধী কথাবার্তাই বলেছেন গ্রিফিথ। এইসব রক্তক্ষয়ী

সংঘর্ষের সঙ্গে পারিবারিক স্বার্থ, শান্তি-শৃঙ্খলা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত ছবির অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে এক চূড়ান্ত জাত্যভিমান। চামড়ার রঙ দেখে মানুষে মানুষে ব্যবধান তৈরির এক উদগ্র দম্ভ। আমেরিকায় নিগ্রো জনসাধারণের উপস্থিতিকে গ্রিফিথ চিহ্নিত করলেন মার্কিন জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রধান বিপদ হিসেবে। ছবির শুরুতেই তাঁর ঘোষণা, 'bringing of the African to America sowed the first seed of disunion'।

এরপর ছবির মধ্যেও নানা জায়গায় নির্দ্বিধায় গ্রিফিথ প্রকাশ করেছেন তাঁর নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব। দাসজীবন থেকে মুক্তি পাওয়া 'স্বাধীন' নিগ্রোদের মধ্যে ভালো কিছুই দেখতে পাননি তিনি। এ ছবিতে 'স্বাধীন' নিগ্রোরা সকলেই বদমাশ—খুন-জখম, হল্লা-মারামারি, মদ-মেয়েমানুষ আদি বেলেল্লাপনাই তাদের একমাত্র কাজ। কেবল শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অনুগত নিগ্রোদাসেরাই যা একটু ভালো। সুতরাং একটি দৃশ্যে মিড-শটে যখন আত্মহারা শ্বেতকায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমনিবেদন এবং জানালার বাইরে দূরে তুলোর ক্ষেতে কর্মব্যস্ত নিগ্রোদের দেখি, তখন গ্রিফিথের চোখে এই বৈপরীত্যের কী তাৎপর্য, তা পরিষ্কার ধরা পড়ে : মার্জিতরুচি ও শিষ্টাচারের আধার, শ্বেতকায়দের এই সভ্যতাই তাঁর কাম্য, হোক তা নিগ্রোদের রক্ত-ঘাম-অশ্রুর বিনিময়ে তৈরি। এই বর্ণবিদ্বেষী মতাদর্শ ত এক অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয় শ্রেণীবৈষম্যনীতিকেই পুষ্ট করে!

এ ছবিরই একটি চরিত্র উদারনৈতিক শ্বেতকায় সেনেটর অস্টিন স্টোনম্যান। ভদ্রলোকের কাজকর্ম ও মতাদর্শকে তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছেন গ্রিফিথ। স্টোনম্যান তাঁর চোখে নৈতিক অধঃপতনের শিকার এবং সেই অধঃপতনের একমাত্র কারণ এক মুলাটো (বর্ণসংকর) মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয়। গ্রিফিথ বোঝাতে চেয়েছেন, স্টোনম্যানের উদারনীতি মূলত সেই মহিলারই উস্কানিপ্রসূত। অন্ধ মোহে এবং উস্কানির চাপে সরলবিশ্বাসী লোকটি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলেন—ছবিতে এই হলো গ্রিফিথের সিদ্ধান্ত।

এহেন পরিচালক যে শেষ দৃশ্যে নিগ্রোদের হাতে বন্দী এক শ্বেতকায় পরিবারের রক্ষার্থে বর্ণবিদ্বেষী কু-ক্লুক্স ক্ল্যান-বাহিনীর উদ্ধত অভিযানকে সমর্থনের ভঙ্গীতেই তুলে ধরবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? চলচ্চিত্র ভাষায় গ্রিফিথের মুন্সীয়ানায় অভিভূত হয়ে তাঁর নেতিবাচক বক্তব্যেও প্রভাবিত হতেন অনেক দর্শক। ১৯১৫ সালে প্রায়-অজ্ঞাত কু ক্লুক্স্ ক্ল্যান-এর কার্যকলাপ পরবর্তী দশ বছরে যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জনে সফল হয়েছিল, তার পেছনে আছে গ্রিফিথের 'বার্থ অব এ নেশন'-এর বিরাট অবদান। অবশ্য গণমাধ্যম হিসেবে সিনেমার ক্ষমতা বিষয়েও আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না এর পর।

পরিবেশের চাপে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে গ্রিফিথ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। নিজে তিনি দক্ষিণের শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের সদস্য। শৈশব থেকেই উগ্র জাতিদম্ভের (racial chauvinism) আবহাওয়ায় লালিত। এছাড়া মুক্তি পাওয়া নিগ্রো ক্রীতদাসদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পর্যাপ্ত উদাহরণ তাঁর হাতেই ছিল। এসবের ভিত্তিতেই তিনি পৌঁছেছিলেন মার্কিন জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর সরলীকৃত সিদ্ধান্তে। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, এইসব ক্রীতদাস কয়েক শতক ধরে মার্কিন (শ্বেতকায়) সভ্যতা ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধই করেছে শুধু, এসবের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধেও তারা পায় নি কখনও। আর তাদের সঙ্গে শ্বেতকায় প্রভুদের যে-আচরণ, তাতে মার্জিতরুচির চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের মনুষ্যেতর অস্তিত্ব জ্বালা, যন্ত্রণা, হতাশা, বঞ্চনার এক দীর্ঘ ইতিহাস। সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তির অবদমিত ও ধ্বংস হওয়ার ইতিহাস। কিন্তু এই মানুষগুলোও স্বাধীনতার মূল্য বোঝে। দাসজীবনের অবসানে তাই নিজেদের আবেগ-অনুভূতির অবাধ প্রকাশ তারা ঘটিয়েছে। সে সবের বিকৃত, কদর্য রূপ কিন্তু গ্রিফিথের বহু-আকাঙ্ক্ষিত 'শ্বেত-সভ্যতা'-রই 'দান'। চামড়ার রঙের ভিত্তিতে বিভেদ-বিদ্বেষের বীজ বুনেছিল শ্বেতাঙ্গরাই। কুপ্রবৃত্তিরও 'জনক' তারাই! এগুলো শুধু বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাদেরই ওপর। এতেই গ্রিফিথ ক্রোধে আত্মহারা!

অবশ্য শুভবুদ্ধির মানুষ গ্রিফিথের এই মনোভাবকে স্বাগত জানান নি। তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল ছবির বক্তব্য নিয়ে। এমন কি নিউইয়র্কের লিবার্টি থিয়েটার, যেখানে এ-ছবি প্রথম দেখানো হয়েছিল, তার সামনে বিরাট এক দাঙ্গাও হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে নিগ্রোবিরোধী একশ সত্তরটি শট পরে গ্রিফিথকে বাদ দিতে হয়।

এ-ছবিকে ঘিরে এরকম দাঙ্গা হয়তো আজও হবে। তবু এর কথা ভুললে আমাদের চলবে না। গ্রিফিথের সংকীর্ণতা আর গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করেও বারবার দেখতে হবে এই ছবি, বুঝতে হবে চিরায়ত এই শিল্পকৃতির মাহাত্ম্য, যেখানে আঙ্গিকের গুণ বিষয়ের সমস্ত দুর্বলতাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এই সেই ছবি যা সিনেমা সম্পর্কে বিজ্ঞজনের সমস্ত সন্দেহের নিরসন করেছিল; শিল্পের জগতে স্থায়ী করেছিল সিনেমার আসন। যেমন বলেছিলেন পল রোথা: "if it achieved nothing else, it certainly placed the cinema as an entertainment and as a provocator of argument on the same level as the theater and the novel The importance of the film lay in its achievement of attracting the notice of serious-minded people to the expressive power of the cinema."

তারপরেও অবশ্য মাঝে-মাঝেই বিষোদ্‌গারের সম্মুখীন হয়েছে এই শিল্পমাধ্যম। এদেশের পণ্ডিতম্মন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম, ১৯৪৭ সালে মার্কিন পত্রিকা Observer-এর সমালোচকই বলেছিলেন সিনেমা 'bits of celluloid wire' ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং, তাঁর ইচ্ছে, 'to declare categorically that films are not an art'। এই আক্রমণ প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট যুক্তি, তথ্য এবং আত্মবিশ্বাস আজকের চলচ্চিত্র-প্রেমীদের আছে। সেই আত্মবিশ্বাসেরই প্রথম সূত্র—'বার্থ অব এ নেশন'।

---

১ একশো বারো মিনিটের ছবি সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে শটের সংখ্যা আটশ আটান্ন।

২. ক্রীতদাসদের সুকুমার প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা অনিবার্যভাবেই নিজেদের সংবেদনশীলতাকেও বিকৃত করে তুলেছিল। তাই ক্রীতদাসদের দুঃখের বারোমাস্যাকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা নিগ্রো লোকসংগীত জ্যাজ (jazz) হয়ে উঠলো শ্বেতাঙ্গদের অবসর বিনোদনের নিত্যসঙ্গী, উত্তেজনার খোরাক! আধুনিক জ্যাজ চরিত্রভ্রষ্ট এক শিল্পরীতি।